প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃতি পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এর পর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

২৫তম পুনর্মুদ্রণ ঃ নভেম্বর, 2015

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী ও অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পর্যায় ঃ 1

প্রথম সংস্করণটির আকার দিতে সাহয্য করেছিলেন ড. সুধীন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ এবং ড. দিলীপ কুমার নন্দী। দ্বিতীয় সংস্করণের পরিমার্জনের দায়িত্ব নিয়েছেন ড. সুধীন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ।

পর্যায় ঃ 2

এই পাঠসংকলন প্রণীত হয়েছে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত পাঠ উপকরণ অবলম্বনে। ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আনুকূল্যের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

মূল সংকলনের লেখক, সম্পাদক, পরিকল্পনাকার প্রত্যেকের অবদান আমরা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করি।

পাঠসংকলনের বর্তমান আকার দিতে বিশেষভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ড. সুধীন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ।

অধ্যাপক (ড.) দেবেশ রায়
নিবন্ধক

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অধ্যাপক (ড.) দেবেশ রায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

FBG – 1 & 2

বাংলা বিষয়ক

ভিত্তিমূলক পাঠক্রম

পর্যায়
1

একক 1	❒ কবিতা : ভারততীর্থ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়পত্র—সুকান্ত ভট্টাচার্য	9-16
একক 2	❒ প্রবন্ধ : জীবনস্মৃতি : বিলাত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	17-34
একক 3	❒ ছোটগল্প : হাড়—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	35-47
একক 4	❒ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস	48-58
একক 5	❒ ধ্বনিবিজ্ঞান : বাংলা ধ্বনির পরিচয়	59-67
একক 6	❒ বাংলাভাষার উদ্ভব, সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা এবং বাক্য ও বাক্যাংশ সংকোচন	68-87

পর্যায়
2

একক 7	❒ ভারতবর্ষের সংস্কৃতি : বর্তমান ভারত—স্বামী বিবেকানন্দ	88-96
একক 8	❒ আধুনিক সংস্কৃতি—প্রবোধচন্দ্র ঘোষ	97-108
একক 9	❒ আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি : দণ্ডক শবরী— নারায়ণ সান্যাল	109-120
একক 10	❒ উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু—জগদীশচন্দ্র বসু	121-125
একক 11	❒ পিঁপড়ের লড়াই— গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য	126-137
একক 12	❒ রক্ত—বকুলচন্দ্র চৌধুরী	138-144

সূচনা : পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্য

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য : নানা কারণে যাঁরা উচ্চশিক্ষা নেবার সুযোগ পাননি, পশ্চিমবঙ্গের এমন সবাইকে এবং অন্য রাজ্যে বাস করেন এমন সব বাঙালিকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া; যাঁরা চাকরি করছেন, শহর থেকে বহু দূরে থাকেন, যেখানে উচ্চশিক্ষার সুযোগ নেই, তাঁদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দেওয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। যেসব মহিলা কিছুকাল পড়াশোনা করার পর ঘর-সংসারের দায়-দায়িত্বের জন্য উচ্চশিক্ষা নিতে পারেননি, অথচ পরে দায়-দায়িত্ব কমে আসার ফলে পড়াশোনা করার মতো অবকাশ পেয়েছেন, তাঁদের কাছে এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষা পৌঁছে দেবার সুযোগ করে দিয়েছে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পাঠক্রমের মতো অন্যান্য পাঠক্রমেরও সুযোগ রয়েছে। স্নাতক পর্যায়ের প্রারম্ভিক পাঠক্রমে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে রয়েছে ভারতের প্রধান প্রধান কয়েকটি ভাষা। বাংলা এর অন্যতম।

প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অনেকখানি পার্থক্য আছে। এই পাঠক্রমের পাঠক-পাঠিকারা তুলনায় বয়স্ক, সংসার-জীবনে বেশি অভিজ্ঞ। অথচ পড়াশোনার স্বাভাবিক প্রবাহ থেকে তাঁদের মন বিচ্ছিন্ন। পড়াশোনার আগ্রহ তাঁদের যথেষ্ট। কিন্তু সময়-সুযোগ অনেক কম। এমন শিক্ষার্থীদের কথা ভেবেই বাংলা বিষয়ের প্রারম্ভিক পাঠক্রম তৈরি করা হয়েছে। এই পাঠক্রমের প্রতিটি পাঠ এমনভাবে তৈরি যাতে শিক্ষার্থী নিজে নিজেই পড়ে সবকিছু বুঝে নিতে পারবেন, শিক্ষকের দরকার হবে না। অনুশীলনীর মাধ্যমে যাচাই করে নিতে পারবেন, বিষয়বস্তু কতটা আয়ত্ত হয়েছে। তা সত্ত্বেও এ পাঠক্রমের মান যে-কোনো প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক বাংলা পাঠক্রমের তুল্য। অবশ্য স্নাতক স্তরের প্রচলিত বাংলা পাঠক্রম এবং পাঠ্যগ্রন্থের সঙ্গে এর পার্থক্য থাকবেই।

প্রথম পার্থক্য গঠন-পরিকল্পনার দিক থেকে। বাংলা বিষয়ের পাঠক্রমকে ২টি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি পর্যায়ে আছে ৬টি করে একক। এক-একটি এককে আছে একটি কবিতা বা গল্প, অথবা ভাষা ইতিহাস সংস্কৃতি বিজ্ঞান বিষয়ে একটি আলোচনার মূলপাঠ এবং সেইসঙ্গে তার সারাংশ অনুশীলনী আর অনুশীলনীর অন্তর্গত প্রশ্নাবলির যাবতীয় উত্তর-সংকেত। এইরকম ১২টি একক নিয়ে প্রারম্ভিক পাঠক্রম সম্পূর্ণ। কোনো কোনো একক তুলনায় দীর্ঘ, পুরোপুরি একটানা পড়ার এবং বুঝে ওঠার সময়-সুযোগ অনেক শিক্ষার্থীর না থাকার সম্ভাবনা। তেমন কয়েকটি একককে দুটি তিনটি বা চারটি অংশে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার্থীরা এক-একটি অংশ পড়ে নিতে পারবেন। প্রায় প্রতিটি অংশের সঙ্গেই রয়েছে পৃথক সারাংশ এবং অনুশীলনী (দুটি একক বাদে)। ৬টি দীর্ঘ এককের শেষ সবগুলি অংশ মিলিয়ে একটি সামগ্রিক সারাংশ বা সারসংক্ষেপ এবং সেইসঙ্গে একটি অনুশীলনী দেওয়া হয়েছে, যার ফলে দু-একদিনের বা সপ্তাহের ব্যবধানে অংশগুলি আলাদা আলাদা করে পড়লেও একজন শিক্ষার্থী ঐ দীর্ঘ একককটির অন্তর্গত বিষয় সম্বন্ধে সামগ্রিক ধারণা তৈরি করে নিতে পারবেন। তবে প্রতিটি অংশের বিষয়বস্তুকে স্বয়ংসম্পূর্ণ রাখার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে বলে স্বাভাবিক কারণেই অংশগুলি দৈর্ঘ্যে সমান হয়নি।

দ্বিতীয় পার্থক্য ভাষা-ব্যবহারের দিক থেকে। বহু শিক্ষার্থীরা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নেবার সুযোগ না থাকায় বাংলা ভাষার সর্বজনগ্রাহ্য লিখিত রূপ ব্যবহারের সুযোগ তাঁদের তেমন ঘটেনি। দৈনন্দিন কথাবার্তা বলার ভাষা আর শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহারের আনুষ্ঠানিক ভাষা—এদের মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্য রয়েছে শব্দগঠনে, শব্দের সঠিক প্রয়োগে, বাক্যগঠনে এবং বক্তব্য পরিবেশনে। কোনো বিষয় নিয়ে বাংলায় শুদ্ধ করে লেখার জন্য এক বিশেষ ধরনের দক্ষতা আবশ্যক এবং সেই দক্ষতা অর্জনের জন্য অনুশীলন বা চর্চা আবশ্যক। লিখতে গেলেই বর্ণের পাশে বর্ণ বানান করে লিখতে হয়। অতএব বানানের চর্চাটাও

অত্যন্ত জরুরি। অথচ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা যাঁরা পাননি, এ-ব্যাপারে তাঁদের অসুবিধে অনেক বেশি। এইসব মনে রেখে এই পাঠক্রমে ভাষার ব্যবহারিক দিকটিতে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অবশ্য সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেও অবহেলা করা হয়নি। সেই কারণেই অনেকগুলি এককের ক্ষেত্রে দু-ধরনের অনুশীলনী দেওয়া হয়েছে—বিষয়বস্তুমূলক এবং ভাষাদক্ষতাবিষয়ক। তার উপর কেবলমাত্র ভাষা-শিক্ষার জন্যই গোটা ২য় পর্যায়ের ৬টি একক বরাদ্দ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা অনেকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পাননি বলেই ভাষার ইতিহাস এবং ব্যাকরণের উপর ভিত্তি করে এই এককগুলি তৈরি করে দেওয়া হল।

তৃতীয় পার্থক্য বিষয়বস্তুর দিক থেকে। ২টি পর্যায়ে বিভক্ত এই বাংলা পাঠক্রমে বিষয় হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে ১ম পর্যায়ে সাহিত্য ও ভাষাবিজ্ঞান, ২য় পর্যায়ে ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং কিছু পর্যায়ে বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা। প্রচলিত স্নাতক স্তরের সাধারণ বাংলা পাঠক্রমের তুলনায় এ পাঠক্রম যে অভিনব তা বলাই বাহুল্য।

বাংলা বিষয়ের এই প্রারম্ভিক পাঠক্রম শেষ করার পর শিক্ষার্থীরা যে যে দক্ষতা অর্জন করবেন বলে আশা, তা হল :

১। বাংলা সাহিত্যের ধারা এবং বিভিন্ন রূপ (কবিতা ছোটগল্প ইত্যাদির) সম্পর্কে সাধারণ একটি ধারণা।

২। বাংলা ভাষার গঠন এবং ব্যবহার সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান।

৩। সর্বজনগ্রাহ্য বা মান্য চলিত বাংলায় লেখার ক্ষমতা এবং সাধুভাষায় লেখা বিষয়বস্তু বুঝতে পারা।

৪। সাহিত্য ইতিহাস সংস্কৃতি বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিষয়ে ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো বিষয়ের পক্ষে কী ধরনের শব্দ এবং বাক্য উপযোগী, সে সম্পর্কে ধারণা।

৫। সাধারণভাবে ভারতের এবং বিশেষভাবে বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা।

৬। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিজ্ঞানের কিছু কিছু বিষয়ের ধ্যান-ধারণা।

প্রারম্ভিক পাঠক্রম পর্যায় ১ : ভূমিকা

এই পর্যায়ে কয়েকটি কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটগল্প এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সংকলিত হয়েছে। এককগুলির অন্তর্গত বিষয়বস্তু নিম্নরূপ ঃ

১ম এককে আছে দুটি কবিতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভারততীর্থ' এবং সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ছাড়পত্র'।

(১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভারততীর্থ'-কবিতার ভাষা যে মান্য গদ্যভাষা থেকে আলাদা, বিশেষ করে এই কবিতার ভাষা যে সাধু-চলিতে মেশানো পদ্যভাষা, কবিতাটি পড়ে শিক্ষার্থীরা তা বুঝতে পারবেন। তাছাড়া কবিতার বিষয়বস্তু যে ভারতের নানাজাতির মানুষের ঐক্য ও মিলন, একথাও তাঁরা বুঝে নিতে পারবেন।

(২) সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ছাড়পত্র'-মাত্র একুশ বছর বেঁচে-থাকা কবির ভাষা রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষার তুলনায় অনেকটা গদ্যের কাছাকাছি। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী প্রজন্মের এই কবি বিশেষ দেশকালের প্রেক্ষিতে তাঁর ভাষায় এবং বিষয়ে এনেছেন বিদ্রোহ এবং প্রতিবাদের সুর।

২য় এককে আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মকথা 'জীবনস্মৃতি' (১৯২২) গ্রন্থের অংশ-'বিলাত'। রবীন্দ্রনাথ এখানে মান্য সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন।

৩য় এককে 'হাড়' গল্পের লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। বাংলা ছোটগল্প সাহিত্য হিসেবে বিশ্বসাহিত্যের মানে অবস্থিত। গল্পের ভাষা কবিতার মতোই অনেকটা ভাবধর্মী, যুক্তিধর্মী নয়। কিন্তু ভাবপ্রকাশের ভাষা হলেও কবিতার ভাষা থেকে ছোটগল্পের ভাষা অনেকখানি আলাদা।

৪র্থ এককে বাংলা সাহিত্যের সূচনা থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত ইতিহাস তৈরি করা হয়েছে। সাহিত্যের ইতিহাসে সাহিত্যের পরম্পরা বা ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন যুগ থেকে কীভাবে ক্রমশ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আবির্ভাব হল, তা এই এককে আলোচিত হয়েছে। একালের বাংলা সাহিত্য আর বাংলা ভাষা বুঝতে হলে বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশের ধারাটি বুঝতে হবে।

৫ম এককে বাংলা ধ্বনি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির উচ্চারণ কীভাবে হয় তা দেখানো হয়েছে। বাংলাভাষার বর্ণগুলির সঙ্গে ধ্বনিগুলির পার্থক্য দেখানো হয়েছে।

৬ষ্ঠ এককে তিনটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাভাষা কীভাবে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষার মধ্য দিয়ে নব্য-ভারতীয় আর্যভাষা হিসেবে জন্ম নিল, সে কথা আলোচনা করা হয়েছে। সাধুভাষা ও চলিত ভাষা সাহিত্যিক ভাষা হিসেবে কীভাবে বাংলাভাষায় ব্যবহৃত হয়, তা দেখানো হয়েছে। বাক্য সংকোচন ও বাক্যাংশ সংকোচন করে বাংলা বাক্যের বিশেষ ব্যবহার দেখানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই অংশ পড়লে বাংলা বাক্যের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করতে পারবেন।

এই এককগুলি পাঠ করলে বাংলা ব্যাকরণের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে জানা যাবে। ব্যাকরণের ধ্বনি বিজ্ঞানের দিক, শব্দ ব্যবহারের দিক এবং বাক্য ব্যবহারের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর একটি ধারণা হবে।

এই পর্যায়ের এককগুলি তৈরি করতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে অধ্যাপক পবিত্র সরকারের লেখা 'ভাষাজিজ্ঞাসা' গ্রন্থ থেকে।

একক-১ ❑ কবিতা : ভারততীর্থ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ছাড়পত্র—সুকান্ত ভট্টাচার্য

গঠন :

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ মূলপাঠ-১ : ভারততীর্থ-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১.৪ সারাংশ-১

১.৫ অনুশীলনী-১

১.৬ মূলপাঠ-২ : ছাড়পত্র-সুকান্ত ভট্টাচার্য

১.৭ সারাংশ-২

১.৮ অনুশীলনী-২

১.৯ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

১.১০ উত্তর-সংকেত

১.১ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে আপনি—

● বাংলা কবিতার পদ্য ভাষা ও সাধারণ গদ্যভাষার পার্থক্য বুঝতে ও বোঝাতে পারবেন।

● দুই কবির কবিতার মধ্যে ভাব ও ভাষার যে পার্থক্য রয়েছে, তা থেকে দুটি যুগের ভাবনা ও তা প্রকাশের পার্থক্য আন্দাজ করতে পারবেন।

১.২ প্রস্তাবনা

এই পাঠে দুই যুগের দুই কবির দুটি কবিতা দেওয়া হল। প্রথমটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'ভারততীর্থ' এবং দ্বিতীয়টি সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা 'ছাড়পত্র'। ভিন্ন ধর্মী হওয়া সত্ত্বেও দুটি কবিতাই আজকের বাঙালি পাঠকের পরিচিত এবং প্রিয়। কবিতা দুটির ভাব, ভাষা এবং শৈলীর পার্থক্য লক্ষ করুন।

প্রথম কবিতাটিতে কবি ভারতের ভাষা ধর্ম জাতি প্রান্ত নির্বিশেষে প্রত্যেক নরনারীকে আহ্বান জানিয়েছেন সব বিভেদ ভুলে 'এক' হয়ে দাঁড়াতে। এই 'একতার' বাণী আজকের পরিপ্রেক্ষিতেও বিশেষভাবে প্রযোজ্য এবং অর্থপূর্ণ। কবিতাটির ভাষা উপমা শব্দচয়ন ছন্দ ইত্যাদি 'কাব্যিক'। এ ভাষা সাধারণত গদ্যে অথবা দৈনন্দিন কথাবার্তায় ব্যবহার করা হয় না।

দ্বিতীয় কবিতাটিতে কবি আধুনিক কথ্য ভাষা ব্যবহার করেছেন। 'শিশু' কথাটি আপনি জানেন। কিন্তু নবযুগ অর্থে কবি

শব্দটি এখানে ব্যবহার করেছেন। আবার একই সঙ্গে শিশুর জন্মের ছবি, তার খর্বদেহ, নিঃসহায়তার মধ্যে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার কথাও কবি বলতে চেয়েছেন। পাঠক্রমের চতুর্থ পর্যায়ে 'উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু' নামে জগদীশ চন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটির সঙ্গে 'ছাড়পত্র' কবিতাটি মিলিয়ে পড়লে দেখা যাবে, এ-দুটি রচনার মধ্যে শিশুর জন্ম থেকে ক্রমপরিণতির একটা ভাবগত ঐক্য আছে। শিক্ষার্থীরা এ-বিষয়টি নিয়ে ভাবতে পারেন।

১.৩ মূলপাঠ-১ ❑ ভারততীর্থ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আসুন, এখন আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভারততীর্থ' কবিতাটি পাঠ করি।

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহু বাড়ায়ে নমি নর দেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যানগম্ভীর এই-যে ভূধর নদীজপমালাধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন-
শকহুনদল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।
পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে-
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

রণধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত যারা এসেছিল সবে,
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে কেহ নহে নহে দূর,
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তারি বিচিত্র সুর।
হে রুদ্রবীণা, বাজো, বাজো, বাজো, ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজও
বন্ধ নাশিবে, তারাও আসিবে, দাঁড়াবে ঘিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

হেথা একদিন বিরামহীন মহা ওঙ্কারধ্বনি

হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রনরনি।
তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

সেই হোমানলে হেরো আজি জ্বলে দুখের রক্তশিখা।
হবে তা সহিতে, মর্মে দহিতে-আছে সে ভাগ্যে লিখা।
এ দুখবহন করো মোর মন, শোনো রে একের ডাক।
যত লাজ ভয় করো করো জয়, অপমান দূরে যাক।
দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ।
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, করো অপনীত সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

১.৪ সারাংশ-১

'ভারততীর্থ' কবিতাটি আপনি পাঠ করলেন। আসুন, এখন আমরা দেখি কবিতাটির মধ্যে কবি কী বর্ণনা করেছেন।

এই কবিতাটিতে কবি প্রথমে ভারতবর্ষের সব রকম ভাষা ধর্ম জাতির মানুষের সহ-অবস্থানের বর্ণনা করেছেন। আর্য অনার্য দ্রাবিড় চিন শক হূণ পাঠান মোগল - পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে নানা রকম লোক এসে এক মহান দেশের সৃষ্টি করেছে। এরা সকলে সকলের সমান, এদের ঐক্য চেষ্টায় এক বিরাট ভারতীয় সভ্যতা গঠিত হয়েছে। এই বিরাট সভ্যতার গঠনে এদের সকলের অবদান সমান। আর্য অনার্য হিন্দু মুসলমান ইংরাজ খ্রিস্টান ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ—সকলকেই কবি আহ্বান করেছেন, সব তুচ্ছ বিভেদ ভুলে গিয়ে পরস্পরের সহযোগিতায় এই মহান সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং এর মহিমাকে নিঃস্বার্থ ত্যাগে আরও গৌরবান্বিত করে তুলতে।

এই কবিতাটির ছন্দ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রতি পঙ্‌ক্তি যদি তিন ভাগে ভাগ করা যায়, তাহলে প্রথম এবং দ্বিতীয় ভাগের শেষ শব্দগুলির মধ্যে ধ্বনিগত মিল পাওয়া যায়। তৃতীয় ভাগের শেষ শব্দটি পরের পঙ্‌ক্তির শেষ শব্দটির সঙ্গে মেলে। যেমন,

১	২	৩
তপস্যা বলে	একের অনলে	বহুরে আহুতি দিয়া
১	২	৩
বিভেদ ভুলিল	জাগায়ে তুলিল	একটি বিরাট হিয়া
১ বলে	২ অনলে	৩ দিয়া
১ ভুলিল	২ তুলিল	৩ হিয়া

আপনি কবিতাটি মনোযোগসহকারে আরও কয়েকবার পাঠ করে এইসব ধরনের ছন্দ বিশেষভাবে লক্ষ করুন এবং খাতায় লিখুন।

১.৫ অনুশীলনী-১

এখন নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে ৮ পৃষ্ঠার উত্তর-সংকেত-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১) 'ভারততীর্থ' কবিতাটিতে এমন কয়েকটি শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে যা গদ্যে অথবা কথ্যভাষায় আমরা সাধারণত ব্যবহার করি না। যেমন, 'হেথায়'। সাধারণত কথা বলার সময় যদি আমরা 'এখানে' না বলে 'হেথায়' বলি তাহলে সেটা খুবই অস্বাভাবিক শোনায়।

নীচে কয়েকটি শব্দ দেওয়া হল। কবিতাটি থেকে তাদের 'কাব্যিক' রূপ/প্রতিশব্দ খুঁজে বের করুন।

(ক) আমার : ....

(খ) দেখো : ....

(গ) নয় : ....

(ঘ) সেখান : ....

(ঙ) থেকে : ....

(চ) হৃদয় : ....

(ছ) ছোঁয়ায় : ....

(জ) মিলতে : ....

(ঝ) গেয়ে : ....

(ঞ) বয়ে : ....

২) নীচে কয়েকটি কঠিন শব্দ দেওয়া হল। তাদের সহজ প্রতিশব্দ দিন।

(ক) অনল : ....

(খ) নিত্য : ....

(গ) শোণিত : ....

(ঘ) তন্ত্রে : ....

(ঙ) নীড় : ....

(চ) বিপুল : ....

(ছ) ত্বরা : ....

(জ) রজনী : ....

(ঝ) দ্বার : ....

(ঞ) ভূধর : ....

৩) অনেক সময় দুটি শব্দ মিলিত হয়ে একটি শব্দে পরিণত হয়। যেমন,

গঙ্গার + জল = গঙ্গাজল

‘গঙ্গার জল’-এ দুটি শব্দের যা অর্থ, ‘গঙ্গাজল’ শব্দেরও সেই একই অর্থ। ব্যাকরণে দুটি বা তার চেয়ে বেশি শব্দের একরকম মিলনকে ‘সমাস’ বলে। নীচে এই কবিতা থেকে নেওয়া কয়েকটি সমাসবদ্ধ শব্দ দেওয়া হল। এই শব্দগুলির সমাস ভেঙে তাদের অর্থ লিখুন।

(ক) জয়গান

(খ) সাগরতীরে

(গ) ভারততীর্থ

(ঘ) রক্তশিখা

(ঙ) মঙ্গলঘট

(চ) মরুপথ

(ছ) তপস্যাবল

৪) নীচে দেওয়া শব্দগুলিকে সমাসবদ্ধ করুন।

(ক) মহৎ যে মানব

(খ) নররূপ দেবতা

(গ) জপের মালা

(ঘ) যার শির আনত

(ঙ) অপমানের ভার

(চ) যাকে পবিত্র করা হয়েছে

১.৬ মূলপাঠ-২ ❑ ছাড়পত্র—সুকান্ত ভট্টাচার্য

যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল আজ রাত্রে
তার মুখে খবর পেলুম :
সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক,
নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার
জন্মমাত্র সুতীব্র চীৎকারে।
খর্বদেহ নিঃসহায়, তবু তার মুষ্টিবদ্ধ হাত
উত্তোলিত, উদ্ভাসিত
কী এক দুর্বোধ্য প্রতিজ্ঞায়।
সে ভাষা বোঝে না কেউ,
কেউ হাসে, কেউ করে মৃদু তিরস্কার।
আমি কিন্তু মনে মনে বুঝেছি সে ভাষা
পেয়েছি নতুন চিঠি আসন্ন যুগের-
পরিচয়-পত্র পড়ি ভূমিষ্ঠ শিশুর
অস্পষ্ট কুয়াশাভরা চোখে।
এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান ;
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব-তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাব আমি-
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
অবশেষে সব কাজ সেরে
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাব আশীর্বাদ,

তারপর হব ইতিহাস।।

১.৭ সারাংশ-২

'ছাড়পত্র' কবিতাটির মাধ্যমে কবি কী বলতে চেয়েছেন বলে আপনার মনে হয়? আসুন, নীচের সারাংশটি পাঠ করে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করা যাক।

একটি শিশু আজ রাতে জন্ম লাভ করেই যেন খবর এনেছে। সেই খবর হল সে 'ছাড়পত্র' বা ইংরেজিতে পাশপোর্ট পেয়েছে। 'ছাড়পত্রের' অধিকারী দেশের সীমানা অতিক্রম করে যাবার, পেরিয়ে যাবারও অধিকারী। সে নতুন ছাড়পত্র পেয়ে বিশ্বে তার অধিকার সম্পর্কে তীব্র চিৎকারের মাধ্যমে ঘোষণা করছে। যদিও সে ছোট্ট শিশু তবু হাত তার মুঠো করা। মুঠো করা হাত প্রতিবাদের প্রতীক। সাধারণের কাছে সেই প্রতিবাদের ভাষা বোঝা মুশকিল। কিন্তু, কবি সেই ভাষা বুঝতে পেরেছেন। নবজাতকের এই পরিচয়ের মধ্য দিয়ে কবির কাছে এই খবর পৌঁছেছে। একটি নতুন যুগ যে আসছে—সেই চিঠিতে সে খবর আছে। কবি তাই সেই চিঠি কুয়াশায় ঢাকা অস্পষ্ট চোখে পড়ছেন। মনে মনে বুঝেছেন সে ভাষা—নতুন শিশু বা যুগকে জায়গা করে দিতে হবে। পুরাতনের মৃত্যু হবেই, কিন্তু এই প্রাচীন পৃথিবীর শোষণ, দারিদ্র্য দুঃখভরা সমস্ত ব্যর্থতাকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাবার আগে নবজাতকের কাছে কবির এই দৃঢ় অঙ্গীকার—পৃথিবীতে নতুন যুগকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সমস্ত বাধা কবি সরাবেনই। এই সমস্ত বাধাকেই কবি জঞ্জালের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কবির অঙ্গীকার বা প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হলে, নিজের দেহের রক্ত বা জীবন দিয়ে নবযুগের মঙ্গল চাইবেন, আশীর্বাদ করবেন। যা কিছু পুরোনো তা-ই ইতিহাসের অংশ, ইতিহাসের অন্তর্গত। নতুন যুগ প্রতিষ্ঠিত হলে, সেই যুগকে আশীর্বাদ করে কবিও সেই ইতিহাসের অংশে পরিণত হবেন।

১.৮ অনুশীলনী-২

নীচে ৩টি প্রশ্ন দেওয়া হল। প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে ৮ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১) 'ছাড়পত্র' কবিতায় এমন কয়েকটি শব্দ কবি ব্যবহার করেছেন, যেগুলি কথ্য ভাষায় ব্যবহার করা হয়। এরকম ১০টি শব্দ খুঁজে বের করুন।

২) এই কবিতাটি থেকে এমন কয়েকটি শব্দ খুঁজে বের করুন যার দ্বারা শিশুর কথা মনে পড়ে।

(ক)

(খ)

(গ)

(ঘ)

৩) এই কবিতাটি থেকে এমন কয়েকটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ খুঁজে বার করুন, যাতে প্রাচীনযুগ ও প্রাচীনের কথা মনে পড়ে।

(ক)

(খ)

(গ)

(ঘ)

১.৯ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

গীতাঞ্জলি, সঞ্চয়িতা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ছাড়পত্র, সুকান্ত সমগ্র : সুকান্ত ভট্টাচার্য

১.১০ উত্তর-সংকেত

অনুশীলনী-১

১। (ক) মোর (খ) হেরো (গ) নহে (ঘ) সেথা (ঙ) হতে (চ) হিয়া (ছ) পরশে (জ) মিলিবারে (ঝ) গাহি (ঞ) বাহি।

২। (ক) আগুন (খ) রোজ (গ) রক্ত (ঘ) তারে (ঙ) বাসা (চ) বিরাট (ছ) তাড়াতাড়ি (জ) রাত্রি (ঝ) দরজা (ঞ) পর্বত।

৩। (ক) জয়ের গান—যে গান জয়ের পরে গাওয়া হয়
(খ) সাগরের তীরে—সমুদ্রের ধারে
(গ) ভারতই তীর্থ—ভারতবর্ষ, যা তীর্থস্থান স্বরূপ
(ঘ) রক্তের মত লাল শিখা
(ঙ) সেই ঘট যা মঙ্গলের চিহ্ন
(চ) মরুর মধ্য দিয়ে পথ—মরুভূমির রাস্তা
(ছ) তপস্যালব্ধ বল—যে শক্তি তপস্যার দ্বারা পাওয়া যায়

৪। (ক) মহামানব (খ) নবদেবতা (গ) জপমালা (ঘ) আনতশির (ঙ) অপমানভার (চ) পবিত্র-করা (ছ) হাতঘড়ি

অনুশীলনী-২

১। (ক) পেয়েছে (খ) নতুন (গ) তার (ঘ) কেউ (ঙ) বুঝেছি (চ) এসেছে (ছ) ছেড়ে (জ) যেতে (ঝ) চলে (ঞ) যাব।

২। (ক) সুতীব্র চিৎকার (খ) খর্বদেহ (গ) মুষ্টিবদ্ধ হাত (ঘ) ভূমিষ্ঠ।

৩। (ক) জীর্ণ পৃথিবী (খ) ধ্বংসস্তূপ (গ) মৃত (ঘ) কুয়াশাভরা চোখ।

একক-২ ❑ প্রবন্ধ : জীবনস্মৃতি : বিলাত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গঠন :

২.১ উদ্দেশ্য
২.২ প্রস্তাবনা
২.৩ মূলপাঠ-১
২.৪ সারাংশ-১
২.৫ অনুশীলনী-১
২.৬ মূলপাঠ-২
২.৭ সারাংশ-২
২.৮ অনুশীলনী-২
২.৯ সারসংক্ষেপ
২.১০ অনুশীলনী-৩ (ভাষাদক্ষতা বিষয়ক)
২.১১ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ
২.১২ উত্তর-সংকেত

২.১ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে আপনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

- গদ্য লেখার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করতে পারবেন।
- আত্মজীবনী রচনার বৈশিষ্ট্যগুলি জানতে পারবেন।

২.২ প্রস্তাবনা

জন্ম থেকে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হওয়ার পথে ছোটো-বড়ো অসংখ্য ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় মানুষের জীবনধারা। এই চলার পথে মানুষ কতটুকু চলে এসেছে তার হিসেব রাখে না। শুধু চলার পথে দেখা দৃশ্যগুলির ছবি স্মৃতির পটে ধরে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু সে ছবি এঁকে যায় তা কেউ জানে না। যেই আঁকুন না কেন তিনি তা অবিকল আঁকার জন্য বসে থাকেন না। তিনি তাঁর রুচি অনুযায়ী সেই ছবি আঁকেন, তার মধ্যে কত কী বাদ পড়ে, কত কী থাকে। এইভাবে জীবনের বাইরের দিকে চলেছে ঘটনাপ্রবাহ আর ভিতরে চলেছে ছবি আঁকা। উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র থাকলেও এই দুইই কিন্তু এক নয়। কী পেয়েছি আর কী পাইনি—এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ক্ষণে ক্ষণে মানুষ যখন ফিরে তাকায় তখন শুধু এক-একটা অংশের উপরই নজর পড়ে। অনেকটাই অগোচরে থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি থেকে উদ্ধৃত এই অংশটুকু তার বিলাত থাকাকালীন স্মৃতিরই আংশিক চিত্ররূপমাত্র।

২.৩ মূলপাঠ-১

আসুন, এখন আমরা জীবনস্মৃতি থেকে উদ্ধৃত ১ম অংশটি পাঠ করি।

এইরূপে আমেদাবাদে ও বোম্বাইয়ে মাস ছয়েক কাটাইয়া আমরা বিলাতে যাত্রা করিলাম। অশুভ ক্ষণে বিলাতযাত্রার পত্র প্রথমে আত্মীয়দিগকে ও পরে ভারতীতে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। এখন আর এগুলিকে বিলুপ্ত করা আমার সাধ্যের মধ্যে নাই। এই চিঠিগুলির অধিকাংশই বাল্যবয়সের বাহাদুরি। অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া, আঘাত করিয়া, তর্ক করিয়া রচনার আতসবাজি করিবার এই প্রয়াস। শ্রদ্ধা করিবার, গ্রহণ করিবার, শক্তিই যে সকলের চেয়ে মহৎ শক্তি এবং বিনয়ের দ্বারাই যে সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া অধিকার বিস্তার করা যায়—কাঁচাবয়সে একথা মন বুঝিতে চায় না। ভালোলাগা, প্রশংসা করা, যেন একটা পরাভব, সে যেন দুর্বলতা; এই জন্য কেবলই খোঁচা দিয়া আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার এই চেষ্টা আমার কাছে আজ হাস্যকর হইতে পারিত, যদি ইহার ঔদ্ধত্য ও অসরলতা আমার কাছে কষ্টকর না হইত।

ছেলেবেলা হইতে বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল না বলিলেই হয়। এমন সময় হঠাৎ সতেরো বছর বয়সে বিলাতের জনসমুদ্রের মধ্যে ভাসিয়া পড়িলে খুব একচোট হাবুডুবু খাইবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু আমার মেজ বউঠাকরুন তখন ছেলেদের লইয়া ব্রাইটনে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার আশ্রয়ে গিয়া বিদেশের প্রথম ধাক্কাটা আর গায়ে লাগিল না।

তখন শীত আসিয়া পড়িয়াছে। একদিন রাত্রে ঘরে বসিয়া আগুনের ধারে গল্প করিতেছি, ছেলেরা উত্তেজিত হইয়া আসিয়া কহিল, বরফ পড়িতেছে। বাহিরে গিয়া দেখিলাম কন্‌কনে শীত, আকাশে শুভ্র জ্যোৎস্না এবং পৃথিবী সাদা বরফে ঢাকিয়া গিয়াছে। চিরদিন পৃথিবীর যে মূর্তি দেখিয়াছি এ সে মূর্তিই নয়—এ যেন একটা স্বপ্ন, যেন আর কিছু—সমস্ত কাছের জিনিস যেন দূরে গিয়া পড়িয়াছে, শুভ্রকায় নিশ্চল তপস্বী যেন গভীর ধ্যানের আবরণে আবৃত। অকস্মাৎ ঘরের বাহির হইয়াই এমন আশ্চর্য বিরাট সৌন্দর্য আর-কখনো দেখি নাই।

বউঠাকুরানীর যত্নে এবং ছেলেদের বিচিত্র উৎপাত-উপদ্রবের আনন্দে দিন বেশ কাটিতে লাগিল। ছেলেরা আমার অদ্ভুত ইংরেজি উচ্চারণে ভারি আমোদ বোধ করিল। তাহাদের আর সকলরকম খেলায় আমার কোনো বাধা ছিল না, কেবল তাহাদের এই আমোদটাতে আমি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারতাম না। Warm শব্দে a এর উচ্চারণ o-র মতো এবং Worm শব্দে o-র উচ্চারণ a-এর মতো এটা যে কোনো মতেই সহজজ্ঞানে জানিবার বিষয় নহে, সেটা আমি শিশুদিগকে বুঝাইব কী করিয়া। মন্দভাগ্য আমি, তাহাদের হাসিটা আমার উপর দিয়াই গেল, কিন্তু হাসিটা সম্পূর্ণ পাওনা ছিল ইংরাজি উচ্চারণবিধির। এই দুটি ছোটো ছেলের মন ভোলাইবার, তাহাদিগকে হাসাইবার, আমোদ দিবার নানাপ্রকার উপায় আমি প্রতিদিন উদ্ভাবন করিতাম। ছেলে ভোলাইবার এই উদ্‌ভাবনী শক্তি খাটাইবার প্রয়োজন তাহার পরে আরো অনেকবার ঘটিয়াছে—এখনো সে-প্রয়োজন যায় নাই। কিন্তু সে শক্তির আর সে অজস্র প্রাচুর্য অনুভব করি না। শিশুদের কাছে হৃদয়কে দান করিবার অবকাশ সেই আমার জীবনে প্রথম ঘটিয়াছিল—দানের আয়োজন তাই এমন বিচিত্রভাবে পূর্ণ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল।

কিন্তু সমুদ্রের এপারের ঘর হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রের ওপারের ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য তো আমি যাত্রা করি নাই। কথা ছিল, পড়াশুনা করিব, ব্যারিস্টার হইয়া দেশে ফিরিব। তাই একদিন ব্রাইটনে একটি পাবলিক স্কুলে আমি ভরতি হইলাম। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ প্রথমেই আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'বাহবা, তোমার মাথাটা তো চমৎকার! (What a splendid head you have !)' এই ছোটো কথাটা যে আমার মনে আছে তাহার কারণ এই যে, বাড়িতে

আমার দর্পহরণ করিবার জন্য যাঁহার প্রবল অধ্যবসায় ছিল তিনি বিশেষ করিয়া আমাকে এই কথাটি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, আমার ললাট এবং মুখশ্রী পৃথিবীর অন্য অনেকের সহিত তুলনায় কোনোমতে মধ্যমশ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইতে পারে। আশাকরি, এটাকে পাঠকেরা আমার গুণ বলিয়াই ধরিবেন যে, আমি তাঁহার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছিলাম এবং আমার সম্বন্ধে সৃষ্টিকর্তার নানা প্রকার কার্পণ্যে দুঃখ অনুভব করিয়া নীরব হইয়া থাকিতাম। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহার মতের সঙ্গে বিলাতবাসীর মতের দুটো-একটা বিষয়ে পার্থক্য দেখিতে পাইয়া অনেকবার আমি গম্ভীর হইয়া ভাবিয়াছি, হয়তো উভয় দেশের বিচারের প্রণালী ও আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

ব্রাইটনের এই স্কুলের একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম—ছাত্রেরা আমার সঙ্গে কিছুমাত্র রূঢ় ব্যবহার করে নাই। অনেক সময় তাহারা আমার পকেটের মধ্যে কমলালেবু আপেল প্রভৃতি ফল গুঁজিয়া দিয়া পলাইয়া গিয়াছে। আমি বিদেশী বলিয়াই আমার প্রতি তাহাদের এইরূপ আচরণ, ইহাই আমার বিশ্বাস।

এ ইস্কুলেও আমার বেশিদিন পড়া চলিল না—সেটা ইস্কুলের দোষ নয়। তখন তারক পালিত মহাশয় ইংলন্ডে ছিলেন। তিনি বুঝিলেন, এমন করিয়া আমার কিছু হইবে না। তিনি মেজদাদাকে বলিয়া আমাকে লন্ডনে আনিয়া প্রথমে একটা বাসায় একলা ছাড়িয়া দিলেন। সে-বাসাটা ছিল রিজেন্ট উদ্যানের সম্মুখেই। তখন ঘোরতর শীত। সম্মুখের বাগানের গাছগুলায় একটিও পাতা নাই—বরফে ঢাকা আঁকাবাঁকা রোগা ডালগুলা লইয়া তাহারা সারি সারি আকাশের দিকে তাকাইয়া খাড়া দাঁড়াইয়া আছে—দেখিয়া আমার হাড়গুলার মধ্যে পর্যন্ত যেন শীত করিতে থাকিত। নবাগত প্রবাসীর পক্ষে শীতের লন্ডনের মতো এমন নির্মম স্থান আর-কোথাও নাই। কাছাকাছির মধ্যে পরিচিত কেহ নাই, রাস্তাঘাট ভালো করিয়া চিনি না। একলা ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকিবার দিন আবার আমার জীবনে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু বাহির তখন মনোরম নহে, তাহার ললাটে ভ্রূকুটি; আকাশের রঙ ঘোলা, আলোক মৃতব্যক্তির চক্ষুতারার মতো দীপ্তিহীন; দশ দিক আপনাকে সংকুচিত করিয়া আনিয়াছে, জগতের মধ্যে উদার আহ্বান নাই। ঘরের মধ্যে আসবার প্রায় কিছুই ছিল না। দৈবক্রমে কী কারণে একটা হারমোনিয়াম ছিল। দিন যখন সকাল-সকাল অন্ধকার হইয়া আসিত তখন সেই যন্ত্রটা আপন-মনে বাজাইতাম। কখনো কখনো ভারতবর্ষীয় কেহ কেহ আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন। তাঁহাদের সঙ্গে আমার পরিচয় অতি অল্পই ছিল। কিন্তু যখন বিদায় লইয়া তাঁহারা উঠিয়া চলিয়া যাইতেন আমার ইচ্ছা করিত, কোট ধরিয়া তাঁহাদিগকে টানিয়া আবার ঘরে আনিয়া বসাই।

এই বাসায় থাকিবার সময় একজন আমাকে লাটিন শিখাইতে আসিতেন। লোকটি অত্যন্ত রোগা, গায়ের কাপড় জীর্ণপ্রায়, শীতকালের নগ্ন গাছগুলার মতোই তিনি যেন আপনাকে শীতের হাত হইতে বাঁচাইতে পারিতেন না। তাঁহার বয়স কত ঠিক জানি না কিন্তু তিনি যে আপন বয়সের চেয়ে বুড়া হইয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে দেখিলেই বোঝা যায়। এক-একদিন আমাকে পড়াইবার সময় তিনি যেন কথা খুঁজিয়া পাইতেন না, লজ্জিত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার পরিবারের সকল লোকে তাঁহাকে বাতিকগ্রস্ত বলিয়া জানিত। একটা মত তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তিনি বলিতেন, পৃথিবীতে এক-একটা যুগে একই সময়ে ভিন্ন দেশের মানবসমাজে একই ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে; অবশ্য সভ্যতার তারতম্য-অনুসারে সেই ভাবের রূপান্তর ঘটিয়া থাকে কিন্তু হাওয়াটা একই। পরস্পরের দেখাদেখি যে একই ভাব ছড়াইয়া পড়ে তাহা নহে, যেখানে দেখাদেখি নাইই সেখানেও অন্যথা হয় না। এই মতটিকে প্রমাণ কবিবার জন্য তিনি কেবলই তথ্যসংগ্রহ করিতেছেন ও লিখিতেছেন। এদিকে ঘরে অন্ন নাই, গায়ে বস্ত্র নাই, তাঁহার মেয়েরা তাঁহার মতের প্রতি শ্রদ্ধামাত্র করে না এবং সম্ভবত এই পাগলামির জন্য তাঁহাকে সর্বদা ভর্ৎসনা করিয়া থাকে। এক-একদিন তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝা যাইত—ভালো কোনো-একটা প্রমাণ পাইয়াছেন, লেখা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। আমি সেদিন সেই বিষয়ে কথা উত্থাপন করিয়া তাঁহার উৎসাহে আরো উৎসাহ সঞ্চার করিতাম;

আবার এক-একদিন তিনি বড়ো বিমর্ষ হইয়া আসিতেন, যেন যে-ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আর বহন করিতে পারিতেছেন না। সেদিন পড়ানোর পদে পদে বাধা ঘটিত, চোখ দুটো কোন্ শূন্যের দিকে তাকাইয়া থাকিত, মনটাকে কোনোমতেই প্রথমপাঠ্য লাটিন ব্যাকরণের মধ্যে টানিয়া আনিতে পারিতেন না। এই ভাবের ভারে ও লেখার দায়ে অবনত, অনশনক্লিষ্ট লোকটিকে দেখিলে আমার বড়োই বেদনা বোধ হইত। যদিও বেশ বুঝিতেছিলাম ইঁহার দ্বারা আমার পড়ার সাহায্য প্রায় কিছুই হইবে না, তবুও কোনোমতেই ইঁহাকে বিদায় করিতে আমার মন সরিল না। যে-কয়দিন সে-বাসায় ছিলাম এমন করিয়া লাটিন পড়িবার ছল করিয়াই কাটিল। বিদায় লইবার সময় যখন তাঁহার বেতন চুকাইতে গেলাম তিনি করুণ স্বরে আমাকে কহিলেন, 'আমি কেবল তোমার সময় নষ্ট করিয়াছি, আমি তো কোনো কাজ করি নাই, আমি তোমার কাছ হইতে বেতন লইতে পারিব না।' আমি তাঁহাকে অনেক কষ্টে বেতন লইতে রাজি করিয়াছিলাম। আমার সেই লাটিনশিক্ষক যদিচ তাঁহার মতকে আমার সমক্ষে প্রমাণসহ উপস্থিত করেন নাই, তবু তাঁহার সে কথা আমি এ পর্যন্ত অবিশ্বাস করি না। এখনো আমার এই বিশ্বাস যে সমস্ত মানুষের মনের সঙ্গে মনের একটি অখণ্ড গভীর যোগ আছে, তাহার এক জায়গায় যে-শক্তির ক্রিয়া ঘটে অন্যত্র গূঢ়ভাবে তাহা সংক্রামিত হইয়া থাকে।

এখান হইতে পালিতমহাশয় আমাকে বার্কার নামক একজন শিক্ষকের বাসায় লইয়া গেলেন। ইনি বাড়িতে ছাত্রদিগকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিয়া দিতেন। ইহার ঘরে ইহার ভালোমানুষ স্ত্রীটি ছাড়া অত্যল্পমাত্রও রম্য জিনিস কিছুই ছিল না। এমন শিক্ষকের ছাত্র যে কেন জোটে তাহা বুঝিতে পারি, কারণ ছাত্রবেচারাদের নিজের পছন্দ প্রয়োগ করিবার সুযোগ ঘটে না—কিন্তু এমন মানুষেরও স্ত্রী মেলে কেমন করিয়া সে কথা ভাবিলে মন ব্যথিত হইয়া উঠে। বার্কার-জায়ার সান্ত্বনার সামগ্রী ছিল একটি কুকুর—কিন্তু স্ত্রীকে যখন বার্কার দণ্ড দিতে ইচ্ছা করিতেন তখন পীড়া দিতেন সেই কুকুরকে। সুতরাং এই কুকুরকে অবলম্বন করিয়া মিসেস বার্কার আপনার বেদনার ক্ষেত্রকে আরো খানিকটা বিস্তৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

এমন সময়ে বউঠাকুরানী যখন ডেভনশিয়রে টর্কিনগর হইতে ডাক দিলেন তখন আনন্দে সেখানে দৌড় দিলাম। সেখানে পাহাড়ে, সমুদ্রে, ফুল-বিছানো প্রান্তরে, পাইনবনের ছায়ায় আমার দুইটি লীলাচঞ্চল শিশুসঙ্গীকে লইয়া কী সুখে কাটিয়াছিল বলিতে পারি না। দুই চক্ষু যখন মুগ্ধ, মন আনন্দে অভিষিক্ত এবং অবকাশে পূর্ণ দিনগুলি নিষ্কণ্টক সুখের বোঝা লইয়া প্রত্যহ অনন্তের নিস্তব্ধ নীলাকাশসমুদ্রে পাড়ি দিতেছে, তখনো কেন যে মনের মধ্যে কবিতা লেখার তাগিদ আসিতেছে না, এই কথা চিন্তা করিয়া এক-একদিন মনে আঘাত পাইয়াছি। তাই-একদিন খাতা-হাতে, ছাতা-মাথায় নীল সাগরের শৈলবেলায় কবির কর্তব্য পালন করিতে গেলাম। জায়গাটি সুন্দর বাছিয়াছিলাম—কারণ, সেটা তো ছন্দও নহে, ভাবও নহে। একটি সমুচ্চ শিলাতট চিরব্যগ্রতার মতো সমুদ্রের অভিমুখে শূন্যে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে; সম্মুখের ফেনরেখাঙ্কিত তরল নীলিমার দোলার উপর দিনের আকাশ দোল খাইয়া তরঙ্গের কলগানে হাসিমুখে ঘুমাইতেছে—পশ্চাতে সারিবাঁধা পাইনের সুগন্ধি ছায়াখানি বনলক্ষ্মীর আলস্যস্খলিত আঁচলটির মতো ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই শিলাসনে বসিয়া মগ্নতরী নামে একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম। সেইখানেই সমুদ্রের জলে সেটাকে মগ্ন করিয়া দিয়া আসিলে আজ হয়ত বসিয়া বসিয়া ভাবিতে পারিতাম যে, সে জিনিসটা বেশ ভালোই হইয়াছিল। কিন্তু সে রাস্তা বন্ধ হইয়া গেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এখনো সে সশরীরে সাক্ষ্য দিবার জন্য বর্তমান। গ্রন্থাবলী হইতে যদিও সে নির্বাসিত তবুও সপিনাজারি করিলে তাহার ঠিকানা পাওয়া দুঃসাধ্য হইবে না।

কিন্তু কর্তব্যের পেয়াদা নিশ্চিন্ত হইয়া পাই। আবার তাগিদ আসিল, আবার লন্ডনে ফিরিয়া গেলাম। এবারে ডাক্তার স্কট নামে একজন ভদ্র গৃহস্থের ঘরে আমার আশ্রয় জুটিল। একদিন সন্ধ্যার সময় বাক্স তোরঙ্গ লইয়া তাঁহাদের ঘরে প্রবেশ করিলাম। বাড়িতে কেবল পক্বকেশ ডাক্তার, তাঁহার গৃহিণী ও তাহাদের বড়ো মেয়েটি আছেন। ছোটো দুইজন মেয়ে ভারতবর্ষীয় অতিথির আগমন-আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া কোনো আত্মীয়ের বাড়ি পলায়ন করিয়াছেন। বোধ করি যখন

তাঁহারা সংবাদ পাইলেন, আমার দ্বারা কোনো সাংঘাতিক বিপদের আশু সম্ভাবনা নাই তখন তাহারা ফিরিয়া আসিলেন।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমি ইঁহাদের ঘরের লোকের মতো হইয়া গেলাম। মিসেস স্কট্‌ আমাকে আপন ছেলের মতোই স্নেহ করিতেন। তাঁহার মেয়েরা আমাকে যেরূপ মনের সঙ্গে যত্ন করিতেন তাহা আত্মীয়দের কাছ হইতেও পাওয়া দুর্লভ।

এই পরিবারে বাস করিয়া আমি একটি জিনিস লক্ষ্য করিয়াছি—মানুষের প্রকৃতি সব জায়গাতেই সমান। আমরা বলিয়া থাকি এবং আমিও তাহা বিশ্বাস করিতাম যে, আমাদের দেশে পতিভক্তির একটা বিশিষ্টতা আছে, য়ুরোপে তাহা নাই। কিন্তু আমাদের দেশের সাধ্বীগৃহিণীর সঙ্গে মিসেস স্কটের আমি তো বিশেষ পার্থক্য দেখি নাই। স্বামী সেবায় তাঁহার সমস্ত মন ব্যাপৃত ছিল। মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরে চাকরবাকরদের উপসর্গ নাই, প্রায় সব কাজই নিজের হাতে করিতে হয়—এইজন্য স্বামীর প্রত্যেক ছোটোখাটো কাজটিও মিসেস স্কট নিজের হাতে করিতেন। সন্ধ্যার সময় স্বামী কাজ করিয়া ঘরে ফিরিবেন, তাহার পূর্বেই আগুনের ধারে তিনি স্বামীর আরামকেদারা ও তাঁহার পশমের জুতাজোড়াটি স্বহস্তে গুছাইয়া রাখিতেন। ডাক্তার স্কটের কী ভালো লাগে আর না লাগে, কোন্‌ ব্যবহার তাঁহার কাছে প্রিয় বা অপ্রিয় সে কথা মুহূর্তের জন্যও তাঁহার স্ত্রী ভুলিতেন না। প্রাতঃকালে একজনমাত্র দাসীকে লইয়া নিজে উপরের তলা হইতে নিচের রান্নাঘর, সিঁড়ি এবং দরজার গায়ের পিতলের কাজগুলিকে পর্যন্ত ধুইয়া মাজিয়া তকতকে ঝকঝকে করিয়া রাখিয়া দিতেন। ইহার পরে লোকলৌকিকতার নানা কর্তব্য তো আছেই। গৃহস্থালির সমস্ত কাজ সারিয়া সন্ধ্যার সময় আমাদের পড়াশুনা গানবাজনায় তিনি সম্পূর্ণ যোগ দিতেন; অবকাশের কালে আমোদ-প্রমোদকে জমাইয়া তোলা, সেটাও গৃহিণীর কর্তব্যেরই অঙ্গ।

মেয়েদের লইয়া এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় টেবিল-চালা হইত। আমরা কয়েকজনে মিলিয়া একটা টিপাইয়ে হাত লাগাইয়া থাকিতাম, আর টিপাইটা ঘরময় উন্মত্তের মতো দাপাদাপি করিয়া বেড়াইত। ক্রমে এমন হইল, আমরা যাহাতে হাত দিই তাহাই নড়িতে থাকে। মিসেস স্কটের এটা যে খুব ভালো লাগিত তাহা নহে। তিনি মুখ গম্ভীর করিয়া এক-একবার মাথা নাড়িয়া বলিতেন, 'আমার মনে হয়, এটা ঠিক অবৈধ হইতেছে না।' কিন্তু তবু তিনি আমাদের এই ছেলেমানুষি কাণ্ডে জোর করিয়া বাধা দিতেন না, এই অনাচার সহ্য করিয়া যাইতেন। একদিন ডাক্তার স্কটের লম্বা টুপি লইয়া সেটার উপর হাত রাখিয়া যখন চালিতে গেলাম, তিনি ব্যাকুল হইয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন, 'না না, ও-টুপি চালাইতে পারিবে না।' তাঁহার স্বামীর মাথার টুপিতে মুহূর্তের জন্য শয়তানের সংস্রব ঘটে, ইহা তিনি সহিতে পারিলেন না।

এই-সমস্তের মধ্যে একটি জিনিস দেখিতে পাইতাম, সেটি স্বামীর প্রতি তাঁহার ভক্তি। তাঁহার সেই আত্মবিসর্জনপর মধুর নম্রতা স্মরণ করিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারি, স্ত্রীলোকের প্রেমের স্বাভাবিক চরম পরিণাম ভক্তি। যেখানে তাঁহাদের প্রেম আপন বিকাশে কোনো বাধা পায় নাই সেখানে তাহা আপনিই পূজায় আসিয়া ঠেকে। যেখানে ভোগবিলাসের আয়োজন প্রচুর, যেখানে আমোদ-প্রমোদেই দিনরাত্রিকে আবিল রাখিয়া রাখে, সেখানে এই প্রেমের বিকৃতি ঘটে; সেখানে স্ত্রীপ্রকৃতি আপনার পূর্ণ আনন্দ পায় না।

২.৪ সারাংশ-১

আমেদাবাদে ও বোম্বাইয়ে মাস ছয়েক কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিলেত রওনা হয়ে গেলেন। ছোটোবেলা থেকেই তাঁর বাইরের জগতের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক না থাকায় তাঁর মনে বিলেতে গিয়ে হাবুডুবু খাবার ভয় ছিল। কিন্তু ব্রাইটনে তাঁর বউঠাকুরানির আশ্রয়ে থাকার কারণে প্রবাসবাসের ভয়ের প্রথম ধাক্কাটা তাঁর গায়ে লাগল না। ওখানে থাকাকালীন এক জোৎস্নারাতে বরফ পড়ার অভুতপূর্ব দৃশ্য তাঁর মনকে আনন্দে ভরে দিল। কিন্তু আনন্দে দিন কাটালেই তো চলবে না। বিলেতে আসার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরা। তাই একদিন ব্রাইটনের একটি পাবলিক স্কুলে রবীন্দ্রনাথ ভর্তি হলেন। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ওঁর মুখের দিকে তাকিয়েই তাঁর মাথার তারিফ করলেন। ব্রাইটনের স্কুলের ছাত্ররা কোনোদিনই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি। বরং বিদেশি বলেই তাঁর পকেটে আপেল কমলালেবু ঢুকিয়ে দিয়ে পালিয়ে যেত। কিন্তু এখানে তাঁর বেশিদিন থাকা হল না। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে চলে আসতে হল লন্ডনে। এখানে থাকাকালীন তিনি একজন শিক্ষকের কাছে লাটিন শিখতেন। তাঁর সেই শিক্ষককে সবাই বাতিকগ্রস্ত বলত। কারণ তাঁর একটা মতবাদ ছিল। তিনি বলতেন যে, পৃথিবীর এক একটা যুগে একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে একই ভাবের আবির্ভাব হয়ে থাকে। অবশ্য সভ্যতার তারতম্য অনুসারে সেই ভাবের রূপান্তর ঘটে থাকে। তিনি সব সময় এই যুক্তির পিছনে প্রমাণ খুঁজে বেড়াতেন। তাঁর কাছে লাটিন শেখার বিশেষ সুযোগ সুবিধা হল না। তারপর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল বার্কার নামে একজন শিক্ষকের কাছে। ইনি বাড়িতে ছাত্রদের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করে দিতেন। এখানেও তাঁর বেশিদিন থাকা হল না। তিনি চলে গেলেন ডেভনশিয়রের টর্কিনগরে। সেইখানেই তিনি রচনা করলেন তাঁর কবিতা 'মগ্নতরী'। আবার ফিরে এলেন লন্ডনে। এবার তাঁর থাকার ব্যবস্থা হল ডাক্তার স্কট নামে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে। অল্পদিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ স্কট পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন।

২.৫ অনুশীলনী-১

নীচের প্রশ্নগুলি একে একে উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে ২৫ পাতার উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

১) নীচের বিবৃতিগুলি ঠিক কিংবা ভুল, ডানদিকে দেওয়া ঘরগুলিতে টিক চিহ্ন (✓) দিয়ে তা চিহ্নিত করুন।

	ঠিক	ভুল
ক) লেখক বিলাত যাত্রার বিবরণ পত্র রূপে সাধনা পত্রিকায় পাঠাতেন।	☐	☐
খ) ছেলেবেলা থেকে বাইরের জগতের সঙ্গে লেখকের কোনও সম্বন্ধ ছিল না।	☐	☐
গ) লেখকের প্রথম বিলেত যাওয়ার সময় মেজবউঠান লন্ডনে বাস করতেন।	☐	☐
(ঘ) অধ্যক্ষ লেখকের চোখের প্রশংসা করলেন।	☐	☐
(ঙ) তারক পালিত মশায় লেখককে ব্রাইটন থেকে লন্ডনে নিয়ে এলেন।	☐	☐
(চ) লন্ডনে থাকার সময় লেখক লাটিন শিখতেন।	☐	☐
(ছ) লেখকের ভাষা-শিক্ষক বেশি বেতন দাবি করেছিলেন।	☐	☐
(জ) মিসেস স্কট লেখককে ছেলের মতো স্নেহ করতেন।	☐	☐
(ঝ) এক-একদিন সন্ধে বেলায় লেখক ডক্টর স্কটের মেয়েদের সঙ্গে টেবিল চালতেন।	☐	☐
(ঞ) লেখকের মতে ভোগবিলাসের মধ্যেই প্রেমের চরম বিকাশ ঘটে।	☐	☐

২)

(ক) **লেখক বিলাত যাত্রা করেন**

২১ বছর বয়সে ☐ ☐

১৭ বছর বয়সে ☐ ☐

১৫ বছর বয়সে ☐ ☐

১২ বছর বয়সে ☐ ☐

(খ) **লেখকের ইংরেজি উচ্চারণ শুনে ছেলেরা**

আমোদবোধ করত ☐ ☐

ঠাট্টা করত ☐ ☐

রাগ করত ☐ ☐

শুদ্ধ করে দিত ☐ ☐

(গ) **বিলেতে গিয়ে লেখকের**

ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার কথা ছিল ☐ ☐

ব্যারিস্টারি পড়ার কথা ছিল ☐ ☐

কৃষিবিজ্ঞান পড়ার কথা ছিল ☐ ☐

(ঘ) **ব্রাইটনের স্কুলে ছাত্রেরা লেখকের সঙ্গে**

রূঢ় ব্যবহার করেনি ☐ ☐

লেখককে গালাগাল করত ☐ ☐

লেখককে ঘৃণা করত ☐ ☐

ঠাট্টা করত ☐ ☐

(ঙ) **লেখকের ভাষায় শীতের লন্ডন**

অত্যন্ত নির্মম ☐ ☐

অতীব মনোরম ☐ ☐

খুবই চিত্তাকর্ষক ☐ ☐

উপভোগ্য ☐ ☐

(চ) **লেখকের ভাষায় শিক্ষককে লোকে জানত**

রোগগ্রস্ত ব'লে ☐ ☐

বাতিকগ্রস্ত ব'লে ☐ ☐

মিথ্যেবাদী ব'লে ☐ ☐

মাথায় গন্ডগোল আছে ব'লে ☐ ☐

(ছ) **টর্কিনগরের শৈলবেলায় লিখিত কবিতাটির নাম**

সোনার তরী	☐	☐
নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ	☐	☐
মগ্নতরী	☐	☐
হঠাৎ দেখা	☐	☐

(জ) **ডক্টর স্কটের টুপিটা মিসেস স্কট**

খেলার জন্য দিয়েছিলেন	☐	☐
ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন	☐	☐
লুকিয়ে রেখেছিলেন	☐	☐
নিতে বারণ করেছিলেন	☐	☐

৩) নীচের শব্দগুলোর বিপরীতার্থক শব্দ লিখুন—

(ক) অনুকূল ——————

(খ) কোমল ——————

(গ) সোজা ——————

(ঘ) প্রাচীনা ——————

(ঙ) শুরু ——————

(চ) দিলাম ——————

(ছ) কাছাকাছি ——————

(জ) মিথ্যা ——————

(ঝ) মোটা ——————

(ঞ) শুভ্রকায় ——————

৪) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(ক) ছেলেবেলা হইতে বাহিরের ———— সঙ্গে আমার ———— ছিল না।

(খ) বউঠাকুরানীর ———— এবং ছেলেদের ———— আনন্দে দিন বেশ কাটতে লাগিল।

(গ) ছেলেরা আমার ———— ইংরেজি ———— ভারী আমোদ বোধ করিল।

(ঘ) কথা ছিল, পড়াশুনা করিব ———— হইয়া দেশে ফিরিব।

(ঙ) তাই একদিন ———— একটি ———— স্কুলে।

(চ) ছাত্রেরা আমার সঙ্গে কিছুমাত্র ———— ব্যবহার করে না।

(ছ) এখান হইতে পালিত মহাশয় আমাকে ———— নামক একজন ———— বাসায় লইয়া গেলেন।

(জ) সেই শিলাসনে বসিয়া ———— নামে একটি ———— লিখিয়াছিলাম।

(ঝ) গৃহস্থালির সমস্ত কাজ সারিয়া ———— সময় আমাদের পড়াশুনা ———— তিনি সম্পূর্ণ যোগ দিতেন।

(ঞ) তাঁহার স্বামীর মাথার ———— মুহূর্তের জন্য শয়তানের ———— ঘটে, ইহা তিনি ———— পারিলেন না।

২.৬ মূলপাঠ-২

এখানে 'জীবনস্মৃতি'র ২য় অংশটি তুলে ধরা হল। ১ম অংশের মত ২য় অংশটিও মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন।

কয়েক মাস এখানে কাটিয়া গেল। মেজদাদাদের দেশে ফিরিবার সময় উপস্থিত হইল। পিতা লিখিয়া পাঠাইলেন, আমাকেও তাঁহাদের সঙ্গে ফিরিতে হইবে। সে-প্রস্তাবে আমি খুশি হইয়া উঠিলাম। দেশের আলোক দেশের আকাশ আমাকে ভিতরে ভিতরে ডাক দিতেছিল। বিদায়গ্রহণ কালে মিসেস স্কট আমার দুই হাত ধরিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, 'এমন করিয়াই যদি চলিয়া যাইবে তবে এত অল্পদিনের জন্য তুমি কেন এখানে আসিলে।' লন্ডনে এই গৃহটি এখন আর নাই; এই ডাক্তার পরিবারের কেহ-বা পরলোকে কেহ-বা ইহলোকে কে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তাহার কোনো সংবাদই জানি না, কিন্তু সেই গৃহটি আমার মনের মধ্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে।

একবার শীতের সময় আমি টন্‌ব্রিজ ওয়েলস্ শহরের রাস্তা দিয়া যাইবার সময় দেখিলাম, একজন লোক রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া আছে; তাহার ছেঁড়া জুতার ভিতর দিয়া পা দেখা যাইতেছে, পায়ে মোজা নাই, বুকের খানিকটা খোলা। ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ বলিয়া সে আমাকে কোনো কথা বলিল না, কেবল মুহূর্তকালের জন্য আমার মুখের দিকে তাকাইল। আমি তাহাকে যে-মুদ্রা দিলাম তাহা তাহার পক্ষে প্রত্যাশার অতীত ছিল। আমি কিছুদূর চলিয়া আসিলে সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া কহিল, ''মহাশয়, আপনি আমাকে ভ্রমক্রমে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছেন।'—বলিয়া সেই মুদ্রাটি আমাকে ফিরাইয়া দিতে উদ্যত হইল। এই ঘটনাটি হয়তো আমার মনে থাকিত না কিন্তু ইহার অনুরূপ আর একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল। বোধ করি টর্কি স্টেশনে প্রথম যখন পৌঁছিলাম একজন মুটে আমার মোট লইয়া ঠিকা গাড়িতে তুলিয়া দিল। টাকার থলি খুলিয়া পেনি-জাতীয় কিছু পাইলাম না, একটি অর্ধক্রাউন ছিল—সেইটিই তাহার হাতে দিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি সেই মুটে গাড়ির পিছনে ছুটিতে ছুটিতে গাড়োয়ানকে গাড়ি থামাইতে বলিতেছে। আমি মনে ভাবিলাম, সে আমাকে নির্বোধ বিদেশী ঠাহরাইয়া আরও-কিছু দাবি করিতে আসিতেছে। গাড়ি থামিলে সে আমাকে বলিল, 'আপনি বোধ করি পেনি মনে করিয়া আমাকে অর্ধক্রাউন দিয়াছেন।'

যতদিন ইংলন্ডে ছিলাম কেহ আমাকে বঞ্চনা করে নাই, তাহা বলিতে পারি না—কিন্তু তাহা মনে করিয়া রাখিবার বিষয় নহে এবং তাহাকে বড়ো করিয়া দেখিলে অবিচার করা হইবে। আমার মনে এই কথাটা খুব লাগিয়াছে যে, যাহারা নিজে বিশ্বাস নষ্ট করে না তাহারাই অন্যকে বিশ্বাস করে। আমরা সম্পূর্ণ বিদেশি অপরিচিত, যখন খুশি ফাঁকি দিয়া দৌড় মারিতে পারি—তবু সেখানে দোকানে বাজারে কেহ আমাদিগকে কিছু সন্দেহ করে নাই।

যতদিন বিলাতে ছিলাম, শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত একটি প্রহসন আমার প্রবাসবাসের সঙ্গে জড়িত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের একজন উচ্চ ইংরেজ কর্মচারীর বিধবা স্ত্রীর সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। তিনি স্নেহ করিয়া আমাকে রুবি বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার স্বামীর মৃত্যু-উপলক্ষ্যে তাঁহার ভারতবর্ষীয় এক বন্ধু ইংরেজিতে একটি বিলাপগান রচনা করিয়াছিলেন। তাহার ভাষানৈপুণ্য ও কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে অধিক বাক্যব্যয় করিতে ইচ্ছা করি না। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে, সেই কবিতাটি, বেহাগরাগিণীতে গাহিতে হইবে এমন একটা উল্লেখ ছিল। আমাকে একদিন তিনি ধরিলেন, 'এই গানটা তুমি বেহাগরাগিণীতে গাহিয়া আমাকে শুনাও।' আমি নিতান্ত ভালোমানুষি করিয়া তাঁহার কথাটা রক্ষা করিয়াছিলাম। সেই অদ্ভুত কবিতার সঙ্গে বেহাগ সুরের সম্মিলনটা যে কিরূপ হাস্যকর হইয়াছিল, তাহা আমি ছাড়া বুঝিবার দ্বিতীয় কোনো লোক সেখানে উপস্থিত ছিল না। মহিলাটি ভারতবর্ষীয় সুরে তাঁহার স্বামীর শোকগাথা শুনিয়া খুব খুশি হইলেন। আমি মনে করিলাম, এইখানেই পালা শেষ হইল—কিন্তু হইল না।

সেই বিধবারমণীর সঙ্গে নিমন্ত্রণসভায় প্রায়ই আমার দেখা হইত। আহারান্তে বৈঠকখানা ঘরে যখন নিমন্ত্রিত স্ত্রীপুরুষ সকলে একত্রে সমবেত হইতেন তখন তিনি আমাকে সেই বেহাগ গান করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। অন্য সকলে ভাবিতেন, ভারতবর্ষীয় সংগীতের একটা বুঝি আশ্চর্য নমুনা শুনিতে পাইবেন—তাঁহারা সকলে মিলিয়া সানুনয় অনুরোধে যোগ দিতেন, মহিলাটির পকেট হইতে সেই ছাপানো কাগজখানি বাহির হইত, আমার কর্ণমূল রক্তিম আভা ধারণ করিত। নতশিরে লজ্জিত কণ্ঠে গান ধরিতাম; স্পষ্টই বুঝিত পারিতাম, এই শোকগাথার ফল আমার পক্ষে ছাড়া আর কাহারও পক্ষে যথেষ্ট শোচনীয় হইত না। গানের শেষে চাপা হাসির মধ্য হইতে শুনিতে পাইতাম, "Thank you very much. How interesting'! তখন শীতের মধ্যেও আমার শরীর ঘর্মাক্ত হইবার উপক্রম করিত। এই ভদ্রলোকের মৃত্যু আমার পক্ষে যে এত বড়ো একটা দুর্ঘটনা হইয়া উঠিবে, তাহা আমার জন্মকালে বা তাঁহার মৃত্যুকালে কে মনে করিতে পারিত।

তাহার পরে আমি যখন ডাক্তার স্কটের বাড়িতে থাকিয়া লন্ডন য়ুনিভার্‌সিটিতে পড়া আরম্ভ করিলাম তখন কিছুদিন সেই মহিলাটির সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ ছিল। লন্ডনের বাহিরে কিছু দূরে তাঁহার বাড়ি ছিল। সেই বাড়িতে যাইবার জন্য তিনি প্রায় আমাকে অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিতেন। আমি শোকগাথার ভয়ে কোনোমতেই রাজি হইতাম না। অবশেষে একদিন তাঁহার সানুনয় একটি টেলিগ্রাম পাইলাম। টেলিগ্রাম যখন পাইলাম তখন কলেজে যাইতেছি। এদিকে তখন কলিকাতায় ফিরিবার সময়ও আসন্ন হইয়াছে। মনে করিলাম, এখান হইতে চলিয়া যাইবার পূর্বে বিধবার অনুরোধটা পালন করিয়া যাইব।

কলেজ হইতে বাড়ি না গিয়া একেবারে স্টেশনে গেলাম। সেদিন বড় দুর্যোগ। খুব শীত, বরফ পড়িতেছে, কুয়াশায় আকাশ আচ্ছন্ন। যেখানে যাইতে হইবে সেই স্টেশনেই এ-লাইনের শেষ গম্যস্থান, তাই নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলাম। কখন গাড়ি হইতে নামিতে হইবে তাহা সন্ধান লইবার প্রয়োজন বোধ করিলাম না।

দেখিলাম স্টেশনগুলি সব ডানদিকে আসিতেছে। তাই ডানদিকে জানালা ঘেঁসিয়া বসিয়া গাড়ির দীপালোকে একটা বই পড়িতে লাগিলাম। সকাল-সকাল সন্ধ্যা হইয়া অন্ধকার হইয়া আসিতেছে, বাহিরে কিছুই দেখা যায় না। লন্ডন হইতে যে কয়েকজন যাত্রী আসিয়াছিল তাহারা নিজ নিজ গম্যস্থানে একে একে নামিয়া গেল।

গন্তব্য স্টেশনের পূর্ব স্টেশন ছাড়িয়া গাড়ি চলিল। এক জায়গায় একবার গাড়ি থামিল। জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, সমস্ত অন্ধকার। লোকজন নাই, আলো নাই, প্ল্যাটফর্ম নাই, কিছুই নাই। ভিতরে যাহারা থাকে তাহারই প্রকৃত তত্ত্ব জানা হইতে বঞ্চিত—রেলগাড়ি কেন যে অস্থানে অসময়ে থামিয়া বসিয়া থাকে রেলের আরোহীদের তাহা বুঝিবার উপায় নাই, অতএব পুনরায় পড়ায় মন দিলাম। কিছুক্ষণ বাদে গাড়ি পিছু হটিতে লাগিল—মনে ঠিক করিলাম, রেলগাড়ির চরিত্র বুঝিবার চেষ্টা করা মিথ্যা। কিন্তু যখন দেখিলাম যে-স্টেশনটি ছাড়িয়া গিয়াছিলাম সেই স্টেশনে আসিয়া গাড়ি থামিল, তখন উদাসীন থাকা আমার পক্ষে কঠিন হইল। স্টেশনের লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, অমুক স্টেশন কখন পাওয়া যাইবে। সে কহিল, সেইখান হইতে তো এ গাড়ি এইমাত্র আসিয়াছে। ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায় যাইতেছে। সে কহিল, লন্ডনে। বুঝিলাম এ গাড়ি খেয়াগাড়ি, পারাপার করে। ব্যতিব্যস্ত হইয়া হঠাৎ সেইখানে নামিয়া পড়িলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, উত্তরের গাড়ি কখন পাওয়া যাইবে। সে কহিল, আজ রাত্রে নয়। জিজ্ঞাসা করিলাম, কাছাকাছির মধ্যে সরাই কোথাও আছে? সে বলিল, পাঁচ মাইলের মধ্যে না।

প্রাতে দশটার সময় আহার করিয়া বাহির হইয়াছি, ইতিমধ্যে জলস্পর্শ করি নাই। কিন্তু বৈরাগ্য ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা না থাকে তখন নিবৃত্তিই সব চেয়ে সোজা; মোটা ওভারকোটের বোতাম গলা পর্যন্ত আঁটিয়া স্টেশনের দীপস্তম্ভের নীচে বেঞ্চের উপর বসিয়া বই পড়িতে লাগিলাম। বইটা ছিল স্পেন্সরের Data of Ethics, সেটি তখন সবেমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গত্যন্তর যখন নাই তখন এই জাতীয় বই মনোযোগ দিয়া পড়িবার এমন পরিপূর্ণ অবকাশ আর জুটিবে না, এই বলিয়া

মনকে প্রবোধ দিলাম।

কিছুকাল পরে পোর্টার আসিয়া কহিল, আজ একটি স্পেশাল আছে—আধ ঘণ্টার মধ্যে আসিয়া পৌঁছিবে। শুনিয়া মনে এক স্ফূর্তির সঞ্চার হইল যে, তাহার পর হইতে Data of Ethich-এ মনোযোগ করা আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল।

সাতটার সময় যেখানে পৌঁছিবার কথা সেখানে পৌঁছিতে সাড়ে-নয়টা হইল। গৃহকর্ত্রী কহিলেন, 'এ কী রুবি, ব্যাপারখানা কী'। আমি আমার আশ্চর্য ভ্রমণবৃত্তান্তটি খুব-যে সগর্বে বলিলাম তাহা নয়।

তখন সেখানকার নিমন্ত্রিতগণ ডিনার শেষ করিয়াছেন। আমার মনে ধারণা ছিল যে, আমার অপরাধ যখন স্বেচ্ছাকৃত নয় তখন গুরুতর দণ্ডভোগ করিতে হইবে না—বিশেষত রমণী যখন বিধানকর্ত্রী। কিন্তু উচ্চপদস্থ ভারতকর্মচারীর বিধবা স্ত্রী আমাকে বলিলেন, 'এসো রুবি, এক পেয়ালা চা খাইবে।'

আমি কোনোদিন চা খাই না কিন্তু জঠরানল নির্বাপণের পক্ষে পেয়ালা যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারে মনে করিয়া গোটাদুয়েক চক্রাকার বিস্কুটের সঙ্গে সেই কড়া চা গিলিয়া ফেলিলাম। বৈঠকখানাঘরে আসিয়া দেখিলাম, অনেকগুলি প্রাচীনা নারীর সমাগম হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে একজন সুন্দরী যুবতী ছিলেন, তিনি আমেরিকান এবং তিনি গৃহস্বামিনীর যুবক ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত বিবাহের পূর্বে পূর্বরাগের পালা উদ্‌যাপন করিতেছেন। ঘরের গৃহিণী বলিলেন, 'এবার তবে নৃত্য শুরু করা যাক'। আমার নৃত্যের কোনো প্রয়োজন ছিল না এবং শরীর মনের অবস্থাও নৃত্যের অনুকূল ছিল না। কিন্তু অত্যন্ত ভালোমানুষ যাহারা জগতে তাহারা অসাধ্যসাধন করে। সেই কারণে যদিচ এই নৃত্যসভাটি সেই যুবক যুবতীর জন্যই আহূত, তথাপি দশঘণ্টা উপবাসের পর দুইখণ্ড বিস্কুট খাইয়া তিনকাল-উত্তীর্ণ প্রাচীন রমণীদের সঙ্গে নৃত্য করিলাম।

এইখানেই দুঃখের অবধি রইল না। নিমন্ত্রণকর্ত্রী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রুবি, আজ তুমি রাত্রি যাপন করিবে কোথায়'। এ প্রশ্নের জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। আমি হতবুদ্ধি হইয়া যখন তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম তিনি কহিলেন, 'রাত্রি দ্বিপ্রহরে এখানকার সরাই বন্ধ হইয়া যায়, অতএব আর বিলম্ব না করিয়া এখনই তোমার সেখানে যাওয়া কর্তব্য'। সৌজন্যের একেবারে অভাব ছিল না—সরাই আমাকে নিজে খুঁজিয়া লইতে হয় নাই। লণ্ঠন ধরিয়া একজন ভৃত্য আমাকে সরাইয়ে পৌঁছাইয়া দিল।

মনে করিলাম, হয়তো শাপে বর হইল—হয়তো এখানে আহারের ব্যবস্থা আছে। জিজ্ঞাসা করিলম, আমিষ হউক, নিরামিষ হউক, তাজা হউক, বাসি হউক, কিছু খাইতে পাইব কি। তাহারা কহিল, মদ্য যত চাও পাইবে, খাদ্য নয়। তখন ভাবিলাম, নিদ্রাদেবীর হৃদয় কোমল, তিনি আহার না দিন বিস্মৃতি দিবেন। কিন্তু তাহার জগৎজোড়া অঙ্কেও তিনি সে-রাত্রে আমাকে স্থান দিলেন না। বেলেপাথরের মেজেওয়ালা ঘর ঠাণ্ডা কন্‌কন্‌ করিতেছে; একটি পুরাতন খাট ও একটি জীর্ণ মুখ ধুইবার টেবিল ঘরের আসবাব।

সকালবেলায় ইঙ্গভারতী বিধবাটি প্রাতরাশ খাইবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইংরেজি দস্তুরে যাহাকে ঠান্ডা খানা বলে তাহারই আয়োজন। অর্থাৎ, গতরাত্রির ভোজের অবশেষ আজ ঠান্ডা অবস্থায় খাওয়া গেল। ইহারই অতি যৎসামান্য কিছু অংশ যদি উষ্ণ বা কবোষ্ণ আকারে কাল পাওয়া যাইত তাহা হইলে পৃথিবীতে কাহারও কোনো গুরুতর ক্ষতি হইত না—অথচ আমার নৃত্যটা ডাঙায়-তোলা কইমাছের নৃত্যের মতো এমন শোকাবহ হইতে পারিত না।

আহারান্তে নিমন্ত্রণকর্ত্রী কহিলেন, 'যাঁহাকে গান শুনাইবার জন্য তোমাকে ডাকিয়াছি তিনি অসুস্থ, শয্যাগত; তাহার শয়নগৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া তোমাকে গাহিতে হইবে।' সিঁড়ির উপর আমাকে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইল। রুদ্ধদ্বারের দিকে

অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া গৃহিণী কহিলেন, 'ঐ ঘরে তিনি আছেন'। আমি সেই অদৃশ্য রহস্যের অভিমুখে দাঁড়াইয়া শোকের গান বেহাগরাগিণীতে গাহিলাম, তাহার পর রোগিণীর অবস্থা কী হইল সে সংবাদ লোকমুখে বা সংবাদপত্রে জানিতে পাই নাই।

লন্ডনে ফিরিয়া আসিয়া দুই-তিন দিন বিছানায় পড়িয়া নিরঙ্কুশ ভালোমানুষের প্রায়শ্চিত্ত করিলাম। ডাক্তারের মেয়েরা কহিলেন, 'দোহাই তোমার, এই নিমন্ত্রণব্যাপারকে আমাদের দেশের আতিথ্যের নমুনা বলিয়া গ্রহণ করিয়ো না। এ তোমাদের ভারতবর্ষের নিমকের গুণ।'

২.৭ সারাংশ-২

কয়েক মাস রবীন্দ্রনাথের স্কট পরিবারের লোকজনদের সঙ্গেই কাটল, ইতিমধ্যেই মেজদাদাদের সঙ্গে দেশে ফিরে যাবার জন্য তাঁর বাবা চিঠি লিখলেন। বিদায়কালে মিসেস স্কট রবীন্দ্রনাথের হাত দুখানি ধ'রে কেঁদে বললেন—'এমনি করেই যদি চলে যাবে, তবে এই অল্পদিনের জন্য তুমি এসেছিলে কেন?' এই পরিবারটির কথা রবীন্দ্রনাথের মনে চিরপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

একবার টনব্রিজ ওয়েলসের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেলেন একজন লোক এক রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে, তার ছেঁড়া জুতো, পায়ে মোজা নেই। সে শুধু মুহূর্তের জন্য রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকাল। ওখানে ভিক্ষা করার প্রথা নেই তাই সে কিছুই বলল না। রবীন্দ্রনাথ তাকে যে মুদ্রা দিলেন সেটা তার আশাতীত ছিল। উনি কিছুদূর চলে আসার পর লোকটি ছুটে এসে বলল—'মহাশয় আপনি ভুলে আমায় একটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছেন।' এই বলেই সে রবীন্দ্রনাথের মুদ্রাটি ফেরত দিতে এগিয়ে এল। ওঁর জীবনে এই ধরনের আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল টর্কি স্টেশনে। একজন মুটে ওঁর মোট গাড়িতে তুলে দিয়েছিল। ওঁর পকেটে পেনি জাতীয় কিছু না থাকায় উনি তাকে আধা ক্রাউন দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলেন। একটু পরেই কুলি চিৎকার করে গাড়োয়ানকে গাড়ি থামাতে বলছে। গাড়োয়ান গাড়ি থামালে সে কাছে এসে বলল—আপনি পেনি ভেবে ভুল করে আমাকে আধা ক্রাউন দিয়ে দিয়েছেন।

আর একটি ঘটনা রবীন্দ্রনাথের প্রবাসবাসের সঙ্গে জড়িত ছিল। ভারতবর্ষের একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে। সেই মহিলা রবীন্দ্রনাথকে আদর করে রুবি বলে ডাকতেন। সেই মহিলার স্বামীর মৃত্যু উপলক্ষে তাঁর এক ভারতীয় বন্ধু ইংরেজিতে একটি বিলাপ রচনা করে পাঠিয়েছেন এবং সেই গানটি বেহাগরাগিণীতে গাইবার নির্দেশ ছিল। এই গান গেয়ে শোনাবার দায়িত্ব অর্পিত হল রবীন্দ্রনাথের উপর। সেই কবিতার সঙ্গে বেহাগরাগিণীর মিলনে এক হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হলেও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া তা বুঝবার মতো দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। যাই হোক, ভারতীয় সুরে তাঁর স্বামীর শোকগাথা শুনে তিনি খুব আহ্লাদিত হলেন। ফলস্বরূপ পরে কোথাও দেখা হলে তিনি সেই গানটি শোনাবার অনুরোধ করতেন। বলাবাহুল্য গান শুনে সবাই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন না।

একদিন সেই মহিলার টেলিগ্রাম পেয়ে তিনি মহিলার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। রাস্তায় কিছু বিঘ্ন ঘটায় সন্ধে সাতটার পরিবর্তে মহিলার বাড়ি পৌঁছাতে রাত সাড়ে-নটা বেজে গেল। তখন অন্যান্য নিমন্ত্রিতেরা সবে ডিনার শেষ করেছে। রবীন্দ্রনাথের সারাদিন কিছুই পেটে পড়েনি। কিছুক্ষণ পরে গৃহকর্ত্রী বললেন—'এসো রুবি এক পেয়ালা চা খাবে।' উপায়ান্তর না দেখে গোটা দুয়েক বিস্কুটের সঙ্গে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ এক কাপ চা খেয়ে ফেললেন। তারপর ডাক পড়ল নৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দেবার। পৃথিবীর ভালোমানুষেরা যেমন জগতে অসাধ্য সাধন করে উনিও তাই করলেন। কিন্তু ওঁর বিস্ময়টা চরমে উঠল যখন সেই মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন-'রুবি আজ রাতে তুমি কোথায় থাকবে?' এই ধরনের একটা প্রশ্নের জন্য রবীন্দ্রনাথ মোটেই তৈরি ছিলেন না। উনি ফ্যাল ফ্যাল করে মহিলার দিকে তাকিয়ে রইলেন। পরে মহিলার সাহায্যে একটি সরাইখানায়

থাকার ব্যবস্থা হল।

সকালবেলায় গৃহকর্ত্রী প্রাতঃরাশের জন্য ডেকে পাঠালেন। আগের দিনের অবশিষ্টাংশ দিয়ে জলযোগ শেষ করার পর গৃহকর্ত্রী বললেন—'যাঁকে গান শোনাবার জন্য তোমাকে ডেকেছি, উনি অসুস্থ, শয্যাগত তাই তাঁর ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে তোমাকে গান গাইতে হবে।' অগত্যা একটা সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে অদৃশ্য রহস্যের দিকে মুখ করে গান শুনিয়ে তিনি এবারের মতন রেহাই পেলেন। তারপর লন্ডনে ফিরে এসে তিন দিন বিছানায় শুয়ে ভালোমানুষির প্রায়শ্চিত্ত করলেন। ডাক্তার স্কটের মেয়েরা এই গল্প শুনে রবীন্দ্রনাথকেবললেন -'দোহাই তোমার এই নিমন্ত্রণের ব্যাপারটাকে আমাদের দেশের আতিথ্যের নমুনা বলে ধরে নিয়ো না। এ তোমাদের ভারতবর্ষেরই নিমকের গুণ।

২.৮ অনুশীলনী-২

আগের মতো এখানেও কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হল। প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে ২৫ পৃষ্ঠার উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১) নীচের বিবৃতিগুলি ঠিক কিংবা ভুল, ডানদিকে দেওয়া ঘরগুলিতে টিক চিহ্ন (✓) দিয়ে তা চিহ্নিত করুন।

		ঠিক	ভুল
(ক)	লন্ডনের স্কটদের বাড়িটা এখনও আছে	☐	☐
(খ)	বিলেতে ভিক্ষা করার অনুমতি ছিল	☐	☐
(গ)	লন্ডনে থাকার সময় লেখককে কখনও না কখনও অপরের দ্বারা প্রতারিত হতে হয়েছে	☐	☐
(ঘ)	উচ্চ ইংরেজ কর্মচারীর বিধবা স্ত্রী লেখককে টেগোর বলে ডাকতেন	☐	☐
(ঙ)	ইংরেজ কর্মচারীর স্ত্রী বিলাপগানটি ভৈরবী রাগিণীতে গাইতে বলেছিলেন।	☐	☐
(চ)	স্টেশনে বসে লেখক স্পেন্সরের লেখা বই পড়ছিলেন	☐	☐
(ছ)	ইংরেজ কর্মচারীর পত্নীর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে লেখক ঠিক সময়ে পৌঁছেছিলেন	☐	☐
(জ)	সরাইখানায় গিয়ে লেখক পেটভরে খেয়েছিলেন	☐	☐

২) (ক) **লেখকের দেশে ফেরার সময় মিসেস স্কট—**

লেখকের হাত ধরে কেঁদেছিলেন	☐	☐
আনন্দের সঙ্গে বিদায় দিয়েছিলেন	☐	☐
অনেক উপহার দিয়েছিলেন	☐	☐
যেতে বারণ করেছিলেন	☐	☐

(খ) **টর্কি স্টেশনের মুটেটি—**

লেখককে ঠকিয়েছিল	☐	☐
পয়সা লাগবে না বলেছিল	☐	☐
বেশি পয়সা দাবি করেছিল	☐	☐

পাওনার অতিরিক্ত পয়সা ফেরত দিতে চেয়েছিল ☐ ☐

(গ) **লন্ডন য়ুনিভার্সিটিতে পড়ার সময় ভারতীয় ইংরেজ কর্মচারীর পত্নীর সঙ্গে লেখকের—**

অনেকদিন দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ ছিল ☐ ☐

প্রায় দেখা হ'ত ☐ ☐

মাঝে মাঝে লেখক দেখা করতেন ☐ ☐

প্রতিদিনই দেখা হত ☐ ☐

(ঘ) **কর্মচারীপত্নীর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষার পর লেখককে রাত্রিযাপনের জন্য—**

ঐ বাড়িতেই থাকতে বলা হয়েছিল ☐ ☐

বন্ধুর বাড়ি যেতে বলেছিল ☐ ☐

স্টেশনে যেতে বলা হয়েছিল ☐ ☐

সরাইখানায় যেতে বলা হয়েছিল ☐ ☐

(ঙ) **এক অসুস্থব্যক্তিকে গান শোনাবার জন্য লেখককে—**

ঐ ব্যক্তির শিয়রের কাছে নিয়ে যাওয়া হল ☐ ☐

ঐ ব্যক্তির শয়নগৃহের বাইরে দাঁড় করানো হল ☐ ☐

ঐ ব্যক্তির কানের কাছে গাইতে বলা হল ☐ ☐

(চ) **লেখকের নিমন্ত্রণ রক্ষার অভিজ্ঞতায় ডঃ স্কটের মেয়েরা—**

মর্মাহত হয়েছিলেন ☐ ☐

খুব খুশি হয়েছিলেন ☐ ☐

ঐ ব্যবহার ঐ দেশীয় আতিথ্যের নমুনা নয় বলেছিলেন ☐ ☐

এই ঘটনা ভুলে যেতে অনুরোধ করেছিলেন ☐ ☐

২.৯ সারসংক্ষেপ

নীচে সমগ্র এককটির সারসংক্ষেপ দেওয়া হল। এখন এটি পাঠ করুন।

আমেদাবাদ ও বোম্বাইয়ে মাস ছয়েক কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিলাতযাত্রা করলেন। বিলাত সম্পর্কে মনে একটু ভয় ভয় ভাব থাকলেও প্রথমেই ব্রাইটনে গিয়ে বউঠাকুরানীর আশ্রয়ে থাকায় ভয়ের প্রথম ধাক্কাটা গায়ে লাগল না। তারপরে উনি ব্রাইটনের একটা পাবলিক স্কুলে ভর্তি হলেন। ঐ স্কুলের ছাত্ররা তাঁর সঙ্গে কোনোদিনই রূঢ় ব্যবহার করেনি বরং বিদেশি বলেই হয়তো বেশি স্নেহই করত। সেখানে তাঁর বেশিদিন থাকা হল না, চলে এলেন লন্ডনে। এখানে একজন শিক্ষকের কাছে তিনি লাটিন শিখতেন। সেখান থেকে চলে গেলেন ডেভনশিয়রের টর্কিনগরে। সেখানে থাকাকালীন বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ পরিবেশে একদিন কবিতা লেখার ইচ্ছে হল এবং সেখানেই 'মগ্নতরী' নামে একখানা কবিতা লিখে ফেলেন।

এরপর আবার তাঁকে আসতে হল লন্ডনে। এবার তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হল ডাক্তার স্কট নামে একজন গৃহস্থের

বাড়িতে। অল্পদিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ তাঁদের পরিবারের লোকের মতো হয়ে গেলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রবীন্দ্রনাথের সে বাড়িতেও বেশি থাকা হল না। কারণ ওঁর বাবা চিঠিতে লিখেছেন উনি যেন মেজদাদাদের সঙ্গে দেশে ফিরে আসেন। বিদায়কালে মিসেস স্কট রবীন্দ্রনাথের হাতদুটি ধরে কেঁদে বললেন, 'এমন করেই যদি চলে যাবে, তবে এত অল্পদিনের জন্য এলেই বা কেন?' এই পরিবারটির কথা রবীন্দ্রনাথের মনে চিরদিনের জন্য গাঁথা ছিল।

একদিন টনব্রিজ ওয়েলস শহরের রাস্তা দিয়া যাবার সময় রবীন্দ্রনাথ দেখলেন একজন লোক দাঁড়িয়ে আছেন, পায়ে ছেঁড়া জুতো, মোজা নেই। লোকটি মুহূর্তের জন্য রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকাল। ভিক্ষা করার প্রথা সেদেশে প্রচলিত নেই তাই সে কিছু বলল না। রবীন্দ্রনাথ তাকে যে মুদ্রাটি দিলেন তা তার কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। কিছুক্ষণ পর সেই লোকটি ছুটে এসে, রবীন্দ্রনাথকে বলল আপনি ভুলে আমাকে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছেন। অনুরূপ আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল বোধ হয় টর্কি স্টেশনে, একজন মুটে রবীন্দ্রনাথের মোট গাড়িতে তুলে দিয়েছিল, পকেটে পেনি-জাতীয় কিছু না থাকায় রবীন্দ্রনাথ মুটেকে আধা ক্রাউন দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিলেন। খানিক পরেই মুটে চিৎকার করে গাড়ি থামাতে বললেন এবং গাড়ি থামালে রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে বলল আপনি পেনি ভেবে আমাকে আধা ক্রাউন দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ যতদিন বিলাতে ছিলেন একটি প্রহসন তাঁর প্রবাসবাসের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। একজন ভারতবর্ষের উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীর বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে এবং তা ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। মহিলার স্বামীর মৃত্যু উপলক্ষ্যে তাঁর একজন ভারতীয় বন্ধু একখানা শোকগাথা রচনা করেন এবং সেটা বেহাগরাগিণীতে গাইবার উল্লেখ ছিল। সেই মহিলার অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার সেই শোকগাথাখানি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গেয়েছিলেন। একবার ওই মহিলার কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেয়ে ওঁর বাড়ি পৌঁছতে সামান্য দেরি হওয়ায় সারা রাত্রি না খেয়ে শুধু এককাপ চা ও দুখানি বিস্কুট খেয়ে সরাইখানাতে রাত কাটাতে হয়েছে। পরদিন সকালবেলা জলযোগের পর গৃহকর্ত্রী রবীন্দ্রনাথকে বললেন, যাকে গান শোনাবার জন্য তোমাকে নিমন্ত্রণ করে এনেছি উনি অসুস্থ এবং শয্যাগত। ওঁর ইচ্ছে অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ সেই অসুস্থ ব্যক্তির দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সেই অদৃশ্য রহস্যের দিকে তাকিয়ে গানখানি সমাপ্ত করে লন্ডনে ফিরে দু-তিন দিন বিছানায় শুয়ে ভালোমানুষির প্রায়শ্চিত্ত করলেন। এই ঘটনা শুনে স্কট-দম্পত্তির মেয়েরা রবীন্দ্রনাথকে বললেন—'দোহাই তোমার, এই নিমন্ত্রণের ব্যাপারটি তুমি আমাদের দেশের আতিথ্যের নমুনা বলে ধরে নিও না।'

২.১০ অনুশীলনী-৩ (ভাষাদক্ষতা বিষয়ক)

এই অনুশীলনীর প্রশ্নগুলির একে একে উত্তর লিখুন। উত্তর-সংকেত ২৬ পাতায় দেওয়া আছে। উত্তর লেখা হয়ে গেলে মিলিয়ে দেখুন।

১) **নিম্নলিখিত 'সাধু' শব্দগুলো চলিত শব্দে রূপান্তরিত করুন।**

(ক) পুরাতন..

(খ) পাঠাইলেন..

(গ) কহিল..

(ঘ) বাড়াইয়া..

(ঙ) গাহিতে..

(চ) শুনাইবার..

(ছ) আসিতেছেন ....

(জ) পৌঁছাইয়া..

২) **নীচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লিখুন।**

(ক) জীর্ণ...

(খ) আসন্ন...

(গ) অনুরূপ...

(ঘ) স্ফূর্তি...

(ঙ) উষ্ণ..

(চ) গৃহটি..

(ছ) প্রবাসে..

(জ) অঙ্কে..

(ঝ) ভ্রম...

(ঞ) সমবেত...

৩) **নীচের প্রদত্ত শব্দগুলি দেশি ও বিদেশি বাছাই করে ডানদিকের ঠিক ঘরে টিক চিহ্ন (✓) দিন।**

		দেশি	বিদেশি
(ক)	পত্র	☐	☐
(খ)	ওকালতি	☐	☐
(গ)	জবাব	☐	☐
(ঘ)	ক্লাব	☐	☐
(ঙ)	মাস্টার	☐	☐
(চ)	নৃত্য	☐	☐
(ছ)	অভ্যর্থনা	☐	☐

২.১১ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

জীবনস্মৃতি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২.১২ উত্তর-সংকেত

অনুশীলনী-১

১।	(ক)	ভুল	(চ)	ঠিক
	(খ)	ঠিক	(ছ)	ভুল
	(গ)	ভুল	(জ)	ঠিক
	(ঘ)	ভুল	(ঝ)	ঠিক
	(ঙ)	ঠিক	(ঞ)	ভুল
২।	(ক)	সতেরো বছর বয়সে	(চ)	বাতিকগ্রস্ত বলে
	(খ)	আমোদবোধ করত	(ছ)	মগ্নতরী
	(গ)	ব্যারিস্টারি পড়ার কথা ছিল	(জ)	নিতে বারণ করেছিলেন
	(ঘ)	রূঢ় ব্যবহার করেনি		
	(ঙ)	অত্যন্ত নির্মম		
৩।	(ক)	প্রতিকূল	(চ)	নিলাম
	(খ)	কঠিন	(ছ)	দূর
	(গ)	বাঁকা	(জ)	সত্য
	(ঘ)	নবীনা	(ঝ)	সরু
	(ঙ)	শেষ	(ঞ)	কৃষ্ণকায়
৪।	(ক)	পৃথিবীর, সম্বন্ধ		
	(খ)	যত্নে, উৎপাত-উপদ্রবের		
	(গ)	অদ্ভুত, উচ্চারণে		
	(ঘ)	ব্যারিস্টার		
	(ঙ)	ব্রাইটনে, পাবলিক		
	(চ)	রূঢ়		
	(ছ)	বার্কার, শিক্ষকের		
	(জ)	মগ্নতরী, কবিতা		
	(ঝ)	সন্ধ্যার, গানবাজনায়		
	(ঞ)	টুপিতে, সংস্রব, সহিতে		

অনুশীলনী-২

১।	(ক)	ভুল	(চ)	ঠিক
	(খ)	ভুল	(ছ)	ভুল

(গ) ঠিক (জ) ঠিক

(ঘ) ভুল

(ঙ) ভুল

২। (ক) লেখকের হাত ধরে কেঁদেছিলেন

(খ) লেখককে পাওনার অতিরিক্ত পয়সা ফেরৎ দিতে চেয়েছিল

(গ) অনেকদিন দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ ছিল

(ঘ) সরাইখানায় যেতে বলা হয়েছিল

(ঙ) ঐ ব্যক্তির শয়নগৃহের বাইরে দাঁড় করানো হ'লো

(চ) ঐ ব্যবহার ঐদেশীয় আতিথ্যের নমুনা নয় বলেছিলেন

অনুশীলনী-৩

১। (ক) পুরোনো (খ) পাঠালেন

(গ) বলল (ঘ) বাড়িয়ে

(ঙ) গাইতে (চ) শোনাবার

(ছ) আসছেন (জ) পৌঁছিয়ে

২। (ক) দুর্বল (খ) আগতপ্রায়

(গ) এইরকম/অবিকল (ঘ) আনন্দ

(ঙ) গরম (চ) ঘরটি

(ছ) বিদেশে (জ) গণিতে

(ঝ) ভুল (ঞ) একত্রিত

৩। (ক) (দেশি) সংস্কৃত (খ) বিদেশি

(গ) বিদেশি (ঘ) বিদেশি

(ঙ) বিদেশি (চ) (দেশি) সংস্কৃত

(ছ) (দেশি) সংস্কৃত

একক ৩ ❑ ছোটগল্প : হাড়—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য
৩.২ প্রস্তাবনা
৩.৩ মূলপাঠ
৩.৪ সারাংশ
৩.৫ অনুশীলনী-১
৩.৬ অনুশীলনী-২ (ভাষাদক্ষতা বিষয়ক)
৩.৭ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ
৩.৮ উত্তর-সংকেত

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি

- ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝে নিতে পারবেন।
- ইংরেজ-ভক্ত ধনী ও দুর্ভিক্ষগ্রস্ত জনতার জীবনযাত্রার চিত্র বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.২ প্রস্তাবনা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা 'হাড়' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি সুপ্রসিদ্ধ গল্প। ইংরেজ-ভক্ত ধনী এবং দুর্ভিক্ষগ্রস্ত জনতার জীবনযাত্রার বিশাল ব্যবধান এই গল্পে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। একদিকে লোহার ফটকের মধ্যে কুকুরের পাহারায় নিরাপদ নিশ্চিন্ত রায়বাহাদুরের অলস বিলাসী জীবন, অন্যদিকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত নরনারী যারা জানোয়ারের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে ডাস্টবিনের খাবার এবং হাইড্রেন্টের নোংরা জল খেয়ে কোনও রকমে জীবনধারণ করে। লেখক এই দুইয়ের মাঝখানে মধ্যবিত্ত বর্গের মানুষ। চাকরির উমেদারি করতে এসেছে বলে সে রায়বাহাদুরকে চটাতে চায় না অথচ সঙ্গে সঙ্গে এই শোষিত জনতার জন্য তার সহানুভূতিশীল মন ব্যথা বোধ করে।

৩.৩ মূলপাঠ

লোহার ফটকের ওপারে দুটো করালদর্শন কুকুর। যে দৃষ্টিতে তারা আমার দিকে তাকাচ্ছিল সেটা বন্ধুত্ববাচক নয়। এক পা এগিয়ে আবার তিন পা পিছিয়ে গেলাম।

ফটকের বাইরে অনিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। ফিরে যাব? শ্যামবাজার থেকে এতদূরে পয়সা

খরচ করে এসো দুটো কুকুরের সঙ্গে দেখা করেই ফিরে যাব?

রায়বাহাদুর এইচ. এল. চ্যাটার্জি ইন-ই তো বটে। কিন্তু ডাকি কাকে? দারোয়ানের ঘরটা বন্ধ। ওদিকে বাগানের একপাশে যেখানে চমৎকার গ্র্যান্ডিফ্লোরা ফুটেছে, একটা মালি ঝাঁজরি হাতে সেখানে কী যেন কাজ করছিল। আমাকে একবারও তার চোখে পড়েছিল কিনা জানি না। না পড়াটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু কি করি। চাকরির উমেদার। বহু কষ্টে পরিচয়পত্র মিলেছে একখানা—পিতৃবন্ধু বলে একটা কথাও শুনেছিলাম। রায়বাহাদুর একটা কলমের খোঁচা দিয়ে দিলেই হয়ে যেতে পারে চাকরিটা। কাজেই এক সময়ে আমাকে দেখে হয়তো কারো কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়ে উঠব, আপাতত সেই শুভ মুহূর্তেরই প্রতীক্ষা করা যাক। গেটের সামনে পায়চারি শুরু করে দিলাম।

প্রসারিত রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। মোটর-ট্রাম-মানুষের অবিচ্ছিন্ন স্রোতোধারা। মাথার ওপর এরোপ্লেনের শব্দ—জাপানি-দস্যুর আক্রমণ আশঙ্কায় পাহারা দিচ্ছে। দি লায়ন হ্যাজ উইংস্!

—গর্-র্-র্-

পেছনে ক্রুদ্ধ গর্জন। চমকে তাকিয়ে দেখি একটা মহাকায় কুকুর চলে এসেছে একেবারে গেট পর্যন্ত। আর লোহার রেলিঙের ভেতর দিয়ে বাইরে বের করে দিচ্ছে ভোঁতা সিক্ত নাকটা। চোখ দুটোতে সোনালি আগুন জ্বলজ্বল করছে—ঝলকে উঠছে দুটো নতুন গিনির মতো। কয়েকটা হিংস্র দন্ত বিকাশ ক'রে আবার বললে, গর্-র্-র্-

লক্ষণ সুবিধের নয়। 'শকটং পঞ্চহস্তেন'—শাস্ত্রকারেরা বোধ হয় কুকুরের মহিমা টের পাননি তখনো। গেটের সামনে থেকে আরো দু পা সরে এলাম। আশা ছাড়তে পারছি না। উমেদারের আশা অনন্ত।

একটু দূরে মনোহরপুকুর পার্ক। আপাতত মনোহর নয়—বুভুক্ষুর কলোনী বসেছে সেখানে। নগরীর নির্মল স্ফটিক জলে জোয়ারের টানে ভেসে আসা একরাশ দুর্গন্ধ আবর্জনা। চিৎকার করছে, কলহ করছে, পরস্পরের মাথা থেকে উকুন বাছছে, জানোয়ারের মতো ঝুঁকে পড়ে কালো জিভ দিয়ে খাচ্ছে হাইড্রেনের ময়লা জল। সহানুভূতি আসে না, বেদনা আসে না, শুধু একটা অহেতুক আশঙ্কায় মনটা শিউরে ওঠে শিরশির করে। দেশজোড়া ক্ষুধা যেন মা-কালীর মতো রসনা মেলে দিয়েছে—এ ক্ষুধার আগুন কবে নিভবে কে জানে। একমুঠো ভাত আর একখাবলা বাজরাই কি যথেষ্ট এর পক্ষে? আরো বেশি—আরো বেশি—এমন কি রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের এই ছবির মতো বাড়িগুলো পর্যন্ত?

বাতাসে একটা গন্ধের তরঙ্গ এল। না, বুভুক্ষুদের নোংরা গন্ধ নয়, গ্র্যান্ডিফ্লোরার উগ্রমধুর এক ঝলক সুরভি। অ্যাসফল্টের চওড়া রাস্তা, কালো মার্বেল বাঁধানো সিঁড়ি, রঙিন কাঁচ দেওয়া জানালায় সিল্কের পর্দা, চীনামাটির টপে কম্পমান অর্কিড।

—কাকে চাই আপনার?

মিষ্টি মধুর কণ্ঠ—ম্যাগ্নোলিয়ার গন্ধের সঙ্গে যেন তার মিল আছে। তাকিয়ে দেখি গেটের ওপারে কোথা থেকে একটি ষোড়শী এসে দাঁড়িয়েছে। স্বাস্থ্য-সমুজ্জ্বল দীর্ঘাকায়া একটি গৌরাঙ্গী মেয়ে। ট্রাউজার পরা, সঙ্গে ছোট একটি সাইকেল। আবার প্রশ্ন হল : কী দরকার?—এই চুপ!

গর্জন বন্ধ করে শান্ত হয়ে দাঁড়াল কুকুরটা। মেয়েটির মুখের দিকে মুখ তুলে প্রাসাদাকাঙ্ক্ষীর মতো লুব্ধভাবে লেজ নাড়াতে লাগল।

ভীত শুকনো গলায় বললুম, রায়বাহাদুর আছেন?

—বাবা? হাঁ আছেন বই কি।

—একটু দেখা করা সম্ভব হবে?

—আসুন।

লোহার ফটক খুলে গেল। অ্যাসফল্টের রাস্তায় এবার বিস্তৃত আমন্ত্রণ। উজ্জ্বল মসৃণ পথ—আমার তালি দেওয়া জুতোটার চাইতে অনেক বেশি পরিষ্কার।

সবুজ পর্দা সরিয়ে ভেতরের কার্পেটে পা দিলাম। নীল রঙের একটা স্নিগ্ধ আলোয় ঘরটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সেটির ওপরে পা তুলে আধশোয়া অবস্থায় এক ভদ্রলোক কি পড়ছিলেন। আমাদের ঘুরে ঢুকতে দেখেই উঠে বসলেন।

নমস্কার প্রতিনমস্কারের পালা শেষ হল। ভদ্রলোক বললেন, বসুন। কী দরকার?

স্পন্দিত বুকে পরিচয়পত্রখানা বাড়িয়ে দিয়ে আসন নিলাম।

রায়বাহাদুর খামখানা খুলে মনোনিবেশ করলেন চিঠিতে আর আমি মাঝে মাঝে ভীরু দৃষ্টিতে তাঁকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। ভারী গোল একখানা মুখ—টকটকে ফরসা ত্বকের ভেতর দিয়ে যেন রক্ত-কণিকা বাইরে ফুটে বেরিয়ে পড়ছে। ব্লাড্‌প্রেশার কথাটার ডাক্তারি সংজ্ঞা জানি না, কিন্তু কথাটার বাংলা অর্থ যদি রক্তাধিক্য হয় তা হলে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ব্লাড-প্রেশারে ভুগছেন।

নিঃশব্দ কয়েকটি মুহূর্ত। কোথায় একটা ঘড়ি টিক টিক করছে। হাওয়ায় উড়ছে রায়বাহাদুরের কিমানোর হাতাটা। বাঁ হাতের অনামিকায় জ্বলজ্বল করছে কী ওটা? হীরাই নিশ্চয়।

চিঠি পড়া শেষ করে রায়বাহাদুর আমার মুখের দিকে তাকালেন। চোখের দৃষ্টি শান্ত আর উদার। অচেতন মন থেকে কেমন একটা আশ্বাস যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, হয়তো হয়েও যেতে পারে চাকরিটা।

—প্রমথর ছেলে তুমি? আরে তা হলে তুমি তো আমার নিজের লোক। তোমার বাবা আর আমি—ফরিদপুরের ঈশান ইস্কুলে একসঙ্গেই পড়েছিলাম। প্রমথ? ও, হি ওয়াজ্‌ এ নাইস্‌ বয়!

আমি বিনয়ে মাথা নত করে রইলাম।

—তোমার বাবা যখন রেজিগ্‌নেশন দেয়, সে খবর আমি পেয়েছিলাম। ছোটবেলা থেকেই ও খুব স্পিরিটেড্‌, অন্যায় কখনও সইতে পারে না। নইলে এত সহজে অমন চাকরি ছেড়ে দিলে। অ্যান্‌ এক্‌সেপশনাল বয় হি ওয়াজ্‌।

নিরুত্তর হয়ে থাকা ছাড়া আর কি করা যায়। পিতৃ-প্রশংসায় বিনীত হয়ে থাকাই উচিত ভক্ত সন্তানের।

—তারপর, চাকরি পাচ্ছ না যুদ্ধের বাজারে? এম. এ. পাশ করে কেরানিগিরির উমেদারি করছ? বী এ ম্যান ইয়াং ফ্রেন্ড, বেরিয়ে পড়ো অ্যাডভেঞ্চারে। চাকরি নাও অ্যাক্‌টিভ সার্ভিসে, ভিড়ে পড়ো নেভিতে।

বললাম, নানারকম অসুবিধে আছে, অনেককে দেখাশুনা করতে হয়। তা ছাড়া একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে—

—অনিশ্চিত!-তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল রায়বাহাদুরের দৃষ্টি : জীবনটাই তো অনিশ্চিত হে ছোকরা। আমিও একদিন নিজেকে

ভাসিয়ে দিয়েছিলাম অনিশ্চয়তার মধ্যে। সিঙ্গাপুরে কাটিয়েছি দশ বৎসর, ভেসে গেছি হাওয়াই, ম্যানিলা, তাহিতি, ফিলিপাইন, মিকাদোর দেশ জাপানে। পৃথিবীটাকে চোখ মেলে না দেখলে বাঁচবার অর্থ নেই কোনো।

—তা বটে!-আমি ক্লিষ্টভাবে হাসলাম, রায়বাহাদুরের কথাগুলো ভালো, অত্যন্ত মূল্যবান। অ্যাড্‌ভেঞ্চার নেই বলেই তো বাঙালির সমস্ত প্রতিভা ব্যর্থ হয়ে গেল। কিন্তু ভালো কথা জানলেই কি ভালো হওয়া যায়? যুদ্ধকে ভয় করি আমি, সাইরেনের শব্দে আমার বুকের ভেতরটা থরথর করে কেঁপে ওঠে। ইউ-বোট বিঘ্নিত ফেনিল সমুদ্রে নিরুদ্দেশ-যাত্রা আমাকে কবি-কল্পনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে না। তাছাড়া পৈতৃক অর্থে প্রশান্ত মহাসাগরের স্বপ্নরাজ্যে ভেসে বেড়ানো, আর বোমারু ঈগলের মৃত্যু-চঞ্চুর তলায় দূরবীনের শানিত চোখ মেলে অ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্‌ট নিয়ে প্রতীক্ষা করা—আমার সন্দেহ হয় এ দুটোর মধ্যে অনেকখানি অসঙ্গত ব্যবধান আছে।

পাইপে আগুন ধরিয়ে রায়বাহাদুর বললেন, কত জায়গায় ঘুরেছি আমি। হাওয়াইয়ের সেই হুলাহুলা ড্যান্স, স্টিভেনশন ব্যালেন্টাইনের প্রবাল-দ্বীপের দেশ, ফিলিপাইনের যাদুবিদ্যা। বিচিত্র সব কালেক্‌শান আমার, দেখবে?

কালেক্‌শান দেখবার মতো মনের অবস্থা নয়। পঁচিশ টাকার প্রাইভেট ট্যুশন আছে একটা, এখনি বেরিয়ে পড়তে হবে সেই উদ্দেশ্যে। কিন্তু পিতৃবন্ধু রায়বাহাদুরকে চটানো চলে না, তাঁর কলমের একটা আঁচড়েই হয়ে যেতে পারে চাকরিটা।

উঠে জোরালো একটি ইলেক্‌ট্রিকের আলো জ্বাললেন রায়বাহাদুর। তারপর ঘরের এক কোণে একটা লোহার আলমারী খুললেন তিনি। তাঁর ড্রয়ার থেকে বেরিয়ে এল কালো ভেল্‌ভেটের একটা বাক্স, সেটা এনে রাখলেন আমার সামনে। ঢাকনাটা খুলে বললেন, দেখেছ?

দেখলাম, কিন্তু এ কী কালেক্‌শান! কতকগুলো ছোট বড় হাড়ের টুকরো। প্রত্যেকটার সঙ্গে একখানি করে নম্বরের ছোট লেবেল ঝুলছে। আশ্চর্য হয়ে বললাম, হাড় নাকি এগুলো?

—হ্যাঁ, হাড় বই-কি।—আমার মুখোমুখি হয়ে বসলেন রায়বাহাদুর : কিন্তু সাধারণ হাড় নয়। এদের প্রত্যেকের বিস্তৃত পরিচয় আছে, অমানুষিক সব গুণ আছে। সমস্ত প্যাসিফিক ঘুরে আমি এদের সংগ্রহ করেছি। কিন্তু ওয়ান মিনিট প্লীজ—সুষি মাদার?

সুষি ঘরে ঢুকল। সেই মেয়েটি।

—ডাকছ বাপী?

—আমাদের চা

—বলছি এখুনি—নাচের ভঙ্গিতে সমস্ত তনু দেহটিতে একটা দোলা দিয়ে সুষি বেরিয়ে গেল।

রায়বাহাদুর আবার আমার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলেন। তারপর দামী দুর্লভ একখণ্ড হীরার মতো পরম যত্নে একটুকরো হাড় তুলে আনলেন বাক্স থেকে।

—বলতে পারো, কিসের হাড় এটা?

নিশ্চয়ই ভয়ানক একটা কিছুর। ভয়ে ভয়ে বললাম, গরিলা?

—নন্‌সেন্স! রায় বাহাদুর প্রচণ্ড একটা ধমক লাগালেন আমাকে : প্রশান্ত মহাসাগরে গরিলা থাকে শুনেছ

কখনো? এটা রোডেশিয়ানের স্বজাতীয় কোনো আদি-মানবের চোয়ালের হাড়।

—রোডেশিয়ান?

—হ্যাঁ, রোডেশিয়ান।—রায়বাহাদুর স্পষ্ট অপ্রসন্ন হয়ে উঠলেন : রোডেশিয়ানের নাম জানো না? অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক গরিলা, মাত্র কয়েকশো বছর আগেও পৃথিবীতে অস্তিত্ব ছিল তাদের।

বোকার মতো বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, জানি বই কি।-অবচেতন মনের কাছে সুরটা যেন বাজলো মোসাহেবির মতো। কিন্তু উমেদারি করতে হলে মোসাহেবি তো অপরিহার্য।

—এটা সেই রোডেশিয়ান ক্লাশের কোনো জীবের হাড়—মানুষেরও বলতে পারো। কোথায় পেয়েছি জানো? মিন্ডানাও দ্বীপে কাটাবাটু বলে জায়গা আছে একটা। তারই কাছাকাছি একটা গাঁয়ের সর্দারের কাছ থেকে এই হাড় আমি কিনেছিলাম। কত দাম দিয়ে কিনেছিলাম বলতে পারবে?

ধমক খাওয়ার ভয়ে স্পষ্ট উত্তর দিতে সাহস হল না। বললাম, অনেক দাম হবে নিশ্চয়।

—নিশ্চয়। পাঁচ হাজার টাকা।

—পাঁ-চ হাজার টাকা!—রায়বাহাদুরের হাতের তেলোয় ওই বস্তুটির দিকে স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম আমি। ইঞ্চি তিনেক লম্বা, চ্যাপটা আকৃতির, অনেকটা ছুরির ফলার মতো দেখতে। বিবর্ণ হয়ে যাওয়ায় হরিদ্রাভ রং ধরেছে, রায়বাহাদুরের বিকটকায় কুকুরগুলোয় নোংরা দাঁতের মতো।

খুব বেশি মনে হচ্ছে? মোটেই নয়। এর ইতিহাস শুনলে তুমি—

দূর থেকে একটা তীব্র কোলাহলে বাকি কথাগুলো উড়ে গেল মুহূর্তে। বাইরের পথে ট্রামের শব্দ, ঘরের ঘড়িটার টিকটিক ক'রে ছন্দোবদ্ধ সুর ঝঙ্কার—সব কিছুকে ছাড়িয়ে সেই কোলাহল কানে এসে আঘাত করল। কিন্তু কলরবটা অপরিচিত নয়, কোনো অজ্ঞাত কারণে ক্ষুধার্ত জনতার সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছে।

রায়বাহাদুরের মুখ অপ্রসন্ন হয়ে উঠল ঃ পার্কের ও ডেস্‌টিচ্যুটগুলোর জ্বালায় রাতে আর ঘুমোনো যায় না। বোধহয় খাবারদাবার কিছু মিলেছে তাই এই চিৎকার। খেতে না পেলে চিৎকার করবে, খেতে পেলেও তাই!

সবুজ পর্দা সরিয়ে একটা ট্রে নিয়ে বেয়ারা ঘরে ঢুকলো। চা, খাবার। পিতৃদেবের বন্ধুত্বটা রায়বাহাদুর সত্যি সত্যিই মনে করে রেখেছেন দেখা যাচ্ছে। এ যাত্রা বোধ হয় হয়েই যাবে চাকরিটা।

—রায়বাহাদুর বললেন, নাও।

বিনা বাক্যব্যয়ে একটা প্লেট কাছে টেনে নিলাম। ক্ষিদেও পেয়েছে বিলক্ষণ। বেলা এগারোটায় মেস থেকে খেয়ে বেরিয়েছি, সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে এখন। এর মধ্যে এক কাপ চা খাইনি একটা সিগারেট পর্যন্ত নয়।

দুরে আবার সেই বুভুক্ষুদের চিৎকার। ডাস্টবিন উল্টে ফেলে দিয়ে যেমন করে সিচৎকার ঝগড়া করে কুকুরের দল। মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি ওরা গোগ্রাসে গিলছে, খিচুড়ির ড্যালা গলায় আটকে চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে ভেতর থেকে, অথচ আরো পাওয়ার জন্যে অবরুদ্ধ সুরে আর্তনাদ করছে। আর আমরা এখানে চা খাচ্ছি কত মার্জিত, কত সংযত আর ভদ্র ভাবে। মুখটা সিকি ইঞ্চি ফাঁক করে দাঁতের কোণে কেক কাটছি—উদ্দেশ্যটা যেন খাওয়া নয়, ঘাসের শীষ

চিবোনোর মতো দাঁতের একটুখানি বিলাসিতা মাত্র। চায়ের কাপে এমনভাবে চুমুক দিচ্ছি যে এতটুকু শব্দ হচ্ছে না-ঠোঁটের আগায় আল্‌গাভাবে চুম্বনের মতো একটু ছোঁয়াচ লাগছে। গপ্‌ গপ্‌ করে গেলা হুস্‌ হাস্‌ করে শব্দ করা-জীবনের সমস্ত এস্‌থেটিক আনন্দ তাতে বিস্বাদ হয়ে যায়। খাওয়াটা যেমন স্থূল, তেমনি গ্রাম্য হয়ে ওঠে।

মুখ থেকে চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রায়বাহাদুর বলেন, হ্যাঁ কী বলছিলাম? এই হাড়খানা? বড় বিচিত্রভাবে সংগ্রহ করেছিলাম এটাকে। ওখানকার সর্দার এখানাকে পরত মুকুটে। কারণ, যার মাথায় এর হাড় থাকবে সে হবে যুদ্ধে অজেয়—শত্রুর হাজার অস্ত্রাঘাতও তার কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। ওদের কোন্‌ এক যাদুকর পুরোহিত একে মন্ত্রসিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। অনেক কষ্টে আমি এটাকে যোগাড় করি, কিউরিয়োর অপূর্ব নমুনা হিসেবে। ওয়েল ইয়াংম্যান, যাদুবিদ্যায় বিশ্বাস করো তুমি?

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে ঘরের মধ্যে। মনোহরপুকুর পার্ক থেকে অবিচ্ছিন্ন চিৎকার। যাদুবিদ্যায় বিশ্বাস করি বই কি। শস্যশ্যামল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বাংলা—হরিবর্মদেব, শশাঙ্ক নরেন্দ্রের তলোয়ার ঝলসিত বাংলা। কার মন্ত্রবলে সেই বাংলা থেকে উঠে এল এই প্রেতের দল? মাঠভরা ফসল কার মন্ত্রে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেল, একটি কণাও পড়ে রইলো না কোনোখানে? যাদুবিদ্যায় বিশ্বাস না করে উপায় কী?

বললাম, হ্যাঁ, ইয়ে—কতরকম ব্যাপারই তো আছে, বিজ্ঞান দিয়ে তার—

—দেয়ার ইউ আর। দু'নম্বরের হাড়খানা হাত তুলে রায়বাহাদুর বললেন, আমিও সেই কথাই বলছি। স্টিভেনশনের সেই সব গল্পগুলো পড়োনি? দেখতে দেখতে একটা সাধারণ মানুষ সাড়ে তিনশো হাত লম্বা হয়ে ওঠে, বড় বড় পা ফেলে পার হয়ে যায় সমুদ্র, আর জলের তলায় নিমজ্জিত সব নাবিকদের কঙ্কালগুলো সেই অতিকায় পায়ের চাপে গুঁড়িয়ে যায় মড় মড় করে? তাহিতির আকাশে ঝড়ের কলো মেঘ রক্তের মতো রাঙা হয়ে ওঠে, ক্ষ্যাপা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে আগুনের হল্‌কা বয়ে যায়, আকাশ থেকে যে বৃষ্টির ধারা নেমে আসে, তা জল নয়, টকটকে তাজা রক্তের ফোঁটা। আর কেমন করে হয় জানো। এইরকম, ঠিক এমনি একখানা হাড়ের গুণে।

ভীত শঙ্কিত দৃষ্টিতে আমি সেই হাড়ের দিকে তাকালাম। অন্য সময়ে হলে এসব কথা গঞ্জিকার মহিমা প্রসূত মনে হত, কিন্তু সমস্ত আবহাওয়াটাই যেন এই বিচিত্র কাহিনীর জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে। ঘরের মধ্যে জ্বলছে জোরালো বিদ্যুতের আলো। গ্রান্ডিফ্লোরা আর রায়বাহাদুরের পাইপ থেকে কড়া তামাকের গন্ধ। হাওয়ায় জানালার নীল পর্দাগুলো প্রশান্ত মহাসাগরের নীল তরঙ্গমালার মতো দোল খাচ্ছে। রায়বাহাদুরকে মনে হল যেন অপরিচিত দেশের সেই অদ্ভুত-কর্মা যাদুকর—তাঁর হাতের হাড়ে মুহূর্তে ভেল্‌কি লাগতে পারে।

পূর্ণগ্রাস সূর্য গ্রহণের সময় পূজা করে কুমারী মেয়েকে বলি দেয় ওরা। তারপর তাকে পুড়িয়ে হাড়গুলো যা থাকে তা মাটির তলায় পুঁতে দেয়। সাত বছর পরে মহা সমারোহে সে হাড় তুলে আনা হয়, ফেলে দেওয়া হয় সমুদ্রে। সে হাড় যে জলের তলা থেকে তুলে আনতে পারে সেই হয় যাদুবিদ্যার মালিক। যত প্রেতাত্মা সব তার অনুচর হয় তখন, সে যা খুশি তাই করতে পারে। তাল তাল পাথর তার ক্ষমতায় সোনা হয়ে যায়, তার আদেশে লতা-পাতাগুলো অজগর সাপ হয়ে ফণা তুলতে পারে।

আমি বসে রইলাম মন্ত্রমুগ্ধের মতো। রায়বাহাদুরের চোখ দুটো জ্বলছে, হাতের হীরাটা জ্বলছে, জ্বলছে বলি দেওয়া সেই কুমারী মেয়ের হাড়খানা, নীল পর্দাগুলো জ্বলছে, আগুনের মতো জ্বলছে অতি তীব্র শক্তির বৈদ্যুতিক আলোটা। সমস্ত ঘরটা যেন জ্বলন্ত, আর সেই জ্বলন্ত ঘরের মাঝখান মিলিয়ে যাচ্ছে ম্যাগ্নোলিয়ার গন্ধ, পাইপের তামাকের গন্ধ, ভেলভেটের বাক্স থেকে

উঠে আসা কি একটা ঔষধ-গন্ধ। মনে হল যেন আমার সামনে একটা আগুনের কুণ্ড জ্বলছে, তার লক্‌লকে আগুনে পুড়ে যাচ্ছে এতকাল কাঁচা মাংস—তামাটে ধোঁয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে দগ্ধ মেদ আর চুলের অত্যুগ্র দুর্গন্ধ—যেন আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল।

—চাট্টি ভাত দাও মা—একটুখানি ফ্যান।

মোহ ভেঙে গেল মুহূর্তে। তাহিতি দ্বীপে মানুষ পুড়ছে না, পুড়ছে কলকাতায়! বুভুক্ষার লেলিহান শিখায়। রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ে বিরাম নেই ট্রাফিকের। ট্রাম চলছে, মোটর চলছে, চলেছে 'স্বপ্নসম লোকযাত্রা'। কিন্তু সব কিছুকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে ওই চিৎকার এসে ঘা দিচ্ছে কানে। কী অস্বাভাবিক গলার জোর, কী দানবীয় আর্তনাদ! মরবার আগে মানুষের গলার স্বর কি ওই রকম গগনভেদী হয়ে ওঠে!

রায়বাহাদুর আবার ভ্রুকুঞ্চিত করলেন বিরক্তিতে। শব্দটা তাঁরও কানে এসেছে। বড় বেশি প্রত্যক্ষ, বড় বেশি বাস্তব। মানুষের ক্ষুধাটা বড় বেশি নগ্ন। এক মুহূর্তে ভুলে যাওয়ার জো নেই, তলিয়ে যাওয়ার উপায় নেইই কোথাও। কোথায় তাহিতি ম্যানিলা হনোলুলুর যাদু-রাজ্য, আর কোথায়—

কিন্তু আমার মনে পড়ে গেল তাঁর দরজায় দুটো করালদর্শন এবং করাল দর্শন কুকুর। নতুন গিনির মতো ঝকঝকে পিঙ্গল চোখ মেলে তারা পাহারা দিচ্ছে, কোনো অনাহূত রবাহূতের সাধ্য নেই তাদের সতর্ক পাহারা এড়িয়ে এ রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করে। এ যাদুমন্ত্রের দেশ। বাইরের পৃথিবীতে যত ক্ষুধাই উত্তাল হয়ে উঠুক না কেন, এখানকার ফুলের গন্ধ, রায়বাহাদুরের হাতের জ্বলজ্বলে হীরাখানা অথবা নীল পর্দার গায়ে বিদ্যুতের আলো-কোনোখানে তার এতটুকুও বৈলক্ষণ্য দেখা যাবে না।

—এই হাড়গুলো আমার বহুযত্নের কালেক্‌শান। অনেক আছে, প্রত্যেকটারই এইরকম সমস্ত গুণ। প্যাসিফিক ঘুরবার সময় এগুলো সংগ্রহ করাই 'হবি' ছিল আমার। ভাবছি এই নিয়ে বই লিখব একখানা।

কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। কেবল মনে হচ্ছে একটা অমানুষিক গন্ধ আসছে নাকে, আগুনের গন্ধ, পোড়া মাংসের গন্ধ। পালাতে পারলে যেন বেঁচে যাই। কিন্তু চাকরিটা! রায়বাহাদুরের কলমের এক আঁচড়, মাত্র একটি আঁচড়েই সেটা হয়ে যেতে পারে।

—হাড় জোগাড় করেছি, কিন্তু মন্ত্রগুলো পাইনি। সেগুলো অনধিকারীকে শেখায় না ওরা। যদি পাওয়া যেত—রায়বাহাদুর হাসলেন—যদি পাওয়া যেত তা হলে এত দিনে কত কী অঘটন ঘটিয়ে বসতাম কে জানে। হয়তো সমস্ত পৃথিবীর চেহারাই বদলে যেত মন্ত্রবলে। আর এই যে ছোট্ট দাঁতটা দেখছ, এটা—

অস্থিরাজ্য থেকে যখন মুক্তি পেলাম, রাত তখন নটার কাছাকাছি।

উপসংহারে রায়বাহাদুর বললেন, ইয়াং ম্যান, কেন পঞ্চাশ-ষাট টাকার চাকরির জন্য ঘোরাঘুরি করছ? বী কারেজিয়াস! ভাগ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ো, নাম লেখাও অ্যাক্টিভ সার্ভিসে! সামনে পড়ে রয়েছে পৃথিবী। কেরানীগিরি করে কী হবে?

ক্লান্ত নিরাশ গলায় বললাম, তা বটে, কিন্তু চাককিটা পেলে—

—ওই চাকরি চাকরি করেই উচ্ছন্ন গেল দেশটা।—রায়বাহাদুর উদ্দীপিত হয়ে উঠলেন : তুমি প্রমথর ছেলে! তোমার বাবা, হোয়াট এ স্প্লেন্‌ডিড্ বয় হি ওয়াজ! বাপের নাম রাখতে হবে তোমাকে। একটা নগণ্য কলম-পেশার চাকরির মধ্যে নিজের সমস্ত ফিউচারকে নষ্ট করে দিয়ো না। আই উইশ ইউ অল সাক্‌সেস্ ইন্ লাইফ। আচ্ছা, গুড্ নাইট—

—নমস্কার।

ব্ল্যাক-আউটের আলোহীন পথ। উপদেশের বোঝা ঘাড়ে করে ভারী পায়ে চললাম এগিয়ে। ট্যুশনিতে আজ আর যাওয়া হল না। ছাত্রের বাবা মহাজন লোক, পাই পয়সা বাজে খরচ করেন না। একদিনের মাইনে কেটে নেওয়া বিচিত্র নয়।

সামনে ডাস্টবিন। পানোর অবগুণ্ঠিত ল্যাম্পপোস্ট থেকে একটা ছোট আলোকচক্র পড়েছে তার ওপর। তিন-চার জন অমানুষিক মানুষ তার ভেতর হাত ডুবিয়ে খুঁজছে খাদ্য। একটু দূরেই একটা কঙ্কালসার কুকুরের ছায়ামূর্তি—নতুন প্রতিযোগীদের কাছে ভিড়বার ভরসা পাচ্ছে না। কাঠির মতো হাত-পা আর বেলুনের মতো পেটওয়ালা একটা ছোট ছেলে দু'হাতে কি চুষছে প্রাণপণে। হাড়? হ্যাঁ হাড়ই তো।

আমি ছমকে থেমে দাঁড়ালাম। কোথায় একটা সাদৃশ্য-বোধ—সেই বলি দেওয়া কুমারী মেয়ের হাড়খানার মতোই দেখতে। যার গুণে তাহিতির আকাশে রুধিরাক্ত মেঘ ভেসে ওঠে, ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে আগুনের ঝাপ্টা বয়ে যায়, ঝর ঝর করে ঝরে তাজা রক্তের বৃষ্টি। কলকাতার আকাশেও কি মেঘ করেছে, ভালো করে তারাগুলোকে দেখতেপাচ্ছি না? ওই কালো আকাশের রঙ আগুনের মতো লাল হয়ে উঠবে কবে, এই ম্যাগ্নোলিয়ার গন্ধ জড়িত মিঠে হাওয়ায় ঝড়ো আগুনের ঝলক লক্‌লক্ করে বয়ে যাবে কবে?

হাড় ওরা পেয়েছে, কেবল মন্ত্র পাওয়াটাই বাকি।

৩.৪ সারাংশ

আপনি গল্পটি পড়লেন, গল্পটির সারমর্ম আলোচনা করা যাক।

চাকরির উমেদারির জন্য এক মধ্যবিত্ত যুবক পিতৃবন্ধু রায়বাহাদুর এইচ. এল. চ্যাটার্জির বাড়ি এসেছে। বাড়ির ঐশ্বর্য এবং বিলিতি কায়দাকানুন দেখে যুবক স্বভাবতই অস্বস্তি বোধ করছে। রায়বাহাদুর তার সঙ্গে ভদ্র ও আন্তরিক ব্যবহার করলেও চাকরির ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করতে প্রস্তুত নন। তাঁর মত হল যে কেরানিগিরি করে বাঙালির প্রতিভা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তার উচিত 'অ্যাক্টিভ সার্ভিসে' ঢুকে 'অ্যাড্‌ভেঞ্চারের' অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা। রায়বাহাদুর নিজের যৌবনে অনেক 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার' করেছেন এবং সেই সময় নানারকম 'কিউরিয়ো' সংগ্রহ করেছেন। তাঁর কাছে একটি হাড়ের সংগ্রহ আছে, যার একটি হাড়ের দাম পাঁচ হাজার টাকা। তিনি এক-একটি করে সেই সব হাড় যুবককে দেখিয়ে তাদের ইতিহাস বলে যাচ্ছেন। এই সব হাড় মন্ত্রসিদ্ধ, যার জোরে নানান অলৌকিক ঘটনা ঘটানো যায়।

এদিকে বাইরে থেকে দুর্ভিক্ষপীড়িত নর-নারীর আর্ত কোলাহল ভেসে আসছে। তারা এক মুঠো ভাতের জন্য জান্তব চিৎকার করছে অথবা ডাস্টবিনে কিছু খাবার খুঁজে পেয়ে তাই নিয়ে কলহ চিৎকার করছে। এই চিৎকারে রায়বাহাদুরের গল্প বলায় ব্যাঘাত ঘটছে এবং তিনি এদের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হচ্ছেন। কয়েক ঘণ্টা নিজের হাড়ের 'কালেকশানের' কথা বলার পর তিনি যুবকটিকে এই বলে বিদায় দেন যে সামান্য কেরানিগিরির জন্য ঘোরাঘুরি না করে সে যেন 'অ্যাক্টিভ সার্ভিসে' ঢুকে পড়ে।

যুবক ক্ষুণ্নমনে বাইরে এসে দেখতে পায়, ডাস্টবিনের কাছে অনাহারে অপুষ্ট একটি ছোটো ছেলে প্রাণপণে একটি হাড় চুষছে। যুবক এই হাড়ের সঙ্গে রায়বাহাদুরের কালেকশানের হাড়ের একটা সাদৃশ্য দেখতে পায়।

গল্পের শেষে লেখক ইঙ্গিতে আশা প্রকাশ করেছেন যে ভবিষ্যতে একদিন দরিদ্রের হাতের এই হাড় মন্ত্রসিদ্ধ অস্ত্র হয়ে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে পালটে দেবে।

৩.৫ অনুশীলনী-১

নীচের সমস্ত প্রশ্নের একে একে উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে ৩৯ পাতার উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

১) নীচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। সঠিক উত্তরটি ডানদিকে দেওয়া তিনটি সম্ভাব্য উত্তর বেছে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

(ক)	**রায়বাহাদুরের আর্থিক অবস্থা**	(১)	বেশ সচ্ছল
		(২)	মোটামুটি সচ্ছল
		(৩)	বেশ খারাপ
(খ)	**চাকরির উমেদার যুবকটি রায়বাহাদুরের**	(১)	দূর সম্পর্কের আত্মীয়
		(২)	পুরোনো কর্মচারী
		(৩)	পুরোনো বন্ধুর ছেলে
(গ)	**রায়বাহাদুর দেশ-বিদেশ ঘোরার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন**	(১)	নিজের উপার্জিত টাকায়
		(২)	পৈতৃক টাকায়
		(৩)	'অ্যাকটিভ সার্ভিসের' দৌলতে
(ঘ)	**রায়বাহাদুর হাড়গুলি**	(১)	উপহার পেয়েছেন
		(২)	অনেক দাম দিয়ে কিনেছেন
		(৩)	অনেক পরিশ্রম করে খুঁজে বার করেছেন।
(ঙ)	**রায়বাহাদুর যুবকটিকে**	(১)	কেরানির চাকরি দেবেন বলে আশ্বাস দেন
		(২)	বকাবকি করে তাড়িয়ে দেন
		(৩)	কেরানির চাকরি না করতে উপদেশ দেন
(চ)	**যুবকটি রায়বাহাদুরের উপদেশ পেয়ে**	(১)	খুব খুশি
		(২)	ক্ষুণ্ণ হয়
		(৩)	অবিচলিত থাকে
(ছ)	**বাইরে যারা চিৎকার করছিল তারা**	(১)	পাড়ার মাস্তান
		(২)	রাজনৈতিক মিছিলের জনতা
		(৩)	দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ

(জ) রায়বাহাদুরের মন বাইরে জনতার প্রতি
(১) সহানুভূতিশীল
(২) বিরক্ত
(৩) নির্বিকার

(ঝ) ওই জনতার প্রতি যুবকের মনোভাব
(১) সহানুভূতিপূর্ণ
(২) বিরক্ত
(৩) নির্লিপ্ত

(ঞ) গল্পের শেষে আমরা এই আশার ইঙ্গিত পাই যে
(১) রায়বাহাদুর এই জনতাকে সাহায্য করবেন
(২) জনতা একদিন এই অসম সমাজ ব্যবস্থাকে পালটে দেবে
(৩) সমাজ কেমন ছিল সেই রকমই থাকবে

২) নীচের বক্তব্যগুলি ঠিক না ভুল তা নির্দ্দিষ্ট ঘরে (×) চিহ্ন দিয়ে দেখান।

	ঠিক	ভুল
(ক) রায়বাহাদুরের দু'টি শান্তশিষ্ট কুকুর আছে	☐	☐
(খ) চাকরির উমেদার যুবকটি রায়বাহাদুরের বাড়ির খুব কাছেই থাকেন।	☐	☐
(গ) রায়বাহাদুরের বাড়ির প্রায় সব গাছই বিলিতি।	☐	☐
(ঘ) হাড় সংগ্রহ করা রায়বাহাদুরের পেশা।	☐	☐
(ঙ) হাড়ের সংগ্রহ দেখতে যুবকের কোনো উৎসাহ নেই।	☐	☐
(চ) আদি মানবের চোয়ালের হাড়টির দাম পাঁচ হাজার টাকা।	☐	☐
(ছ) বাইরে কোলাহল রায়বাহাদুরের বাড়ির দেয়াল ভেদ করে ভেতরে ঢুকতে পায় না।	☐	☐
(জ) বাইরে জনতা ফটক ভেঙে রায়বাহাদুরের বাড়ি আক্রমণ করে।	☐	☐
(ঝ) ছোট ছেলেটি যে হাড়টি চুষছিল তার সঙ্গে যুবক রায়বাহাদুরের সংগৃহীত হাড়ের কিছু সাদৃশ্য দেখতে পায়।	☐	☐
(ঞ) রায়বাহাদুর বাংলাভাষায় খুব বেশি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেন।	☐	☐

৩) অনেক শব্দের আগে একটা 'অ' জুড়ে দিলে তার বিপরীতার্থক শব্দ পাওয়া যায়। যেমন,

অ + খ্যাত = অখ্যাত

অ + সময় = অসময়

অ + নিয়ম = অনিয়ম

'হাড়' গল্পটি থেকে দশটি এরকম অ-যুক্ত শব্দ খুঁজে নীচে লিখুন।

৪) অনেক সময় আমরা কোনো প্রচলিত শব্দের বদলে একটু অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার করে থাকি। যেমন 'জোগাড়'-এর বদলে 'সংগ্রহ'। নীচে এই রকম দশটি প্রচলিত শব্দ দেওয়া আছে। উপরের গল্পটি থেকে তার অপ্রচলিত প্রতিশব্দ খুঁজে বার করুন।

(ক) অনেক ....

(খ) ভয়ে ....

(গ) লম্বা ....

(ঘ) মানে ....

(ঙ) চামড়া ....

(চ) দামী ....

(ছ) অপেক্ষা ....

(জ) হল্‌দেটে ....

(ঝ) খোঁজে ....

(ঞ) খিদে ....

৩.৬ অনুশীলনী-২ (ভাষাদক্ষতা বিষয়ক)

১) কোনো শব্দ যদি স্বরধ্বনি দিয়ে আরম্ভ হয় তাহলে তার আগে বিপরীতার্থক 'অ' জুড়লে, সঙ্গে একটা 'ন' ধ্বনিও যোগ হয়। যেমন,

অ + উচিত = অনুচিত

অ + আহার = অনাহার

অ + ইচ্ছা = অনিচ্ছা

গল্পটি থেকে এরকম যতগুলি শব্দ পান সেগুলি নীচে লিখুন।

১।

২।

৩।

৪।

৫।

২) বিদেশি ভাষার সংস্পর্শে আসায় বাংলায় এমন অনেক শব্দ এসে গেছে যা এখন আমরা খুব স্বাভাবিকভাবেই বাংলা শব্দ হিসেবে ব্যবহার করি। যেমন, ইংরেজি থেকে আমরা নিয়েছি ‘গেলাস’ (glass), ‘চেয়ার’ (chair) ইত্যাদি। অথবা আরবি-ফারসি থেকে নিয়েছি ‘হাওয়া’, ‘খুশি’, ‘হালুয়া’ ইত্যাদি।

উপরের গল্পটি থেকে ২৫টি ইংরেজি থেকে নেওয়া এবং ১৫টি আরবি-ফারসি থেকে নেওয়া শব্দ খুঁজে বার করে নীচে লিখুন।

(ক) ইংরেজি

১	১০	১৯
২	১১	২০
৩	১২	২১
৪	১৩	২২
৫	১৪	২৩
৬	১৫	২৪
৭	১৬	২৫
৮	১৭	
৯	১৮	

(খ) আরবি-ফারসি

১	৯
২	১০
৩	১১
৪	১২
৫	১৩
৬	১৪
৭	১৫
৮	

৩.৭ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের অনেক সংকলন রয়েছে। যে-কোনো লাইব্রেরিতে গেলেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বই পাবেন বলে মনে হয়। কয়েকটি ছোটগল্প পড়ুন।

৩.৮ উত্তর সংকেত

অনুশীলনী-১

১। ক (১); খ (৩); গ (২); ঙ (৩); চ (২); ছ (৩); জ (২); ঝ (১); ঞ (২)

২। ক ভুল; খ ভুল; গ ঠিক; ঘ ভুল; ঙ ঠিক; চ ঠিক; জ ভুল; ঝ ঠিক; ঞ ঠিক

৩। অনিশ্চিত, অচেতন, অসঙ্গত, অমানুষিক, অপ্রসন্ন, অপরিহার্য, অপরিচিত, অবিচ্ছিন্ন, অস্বাভাবিক, অজ্ঞাত।

৪। (ক) বহু (খ) আশঙ্কায় (গ) দীর্ঘ (ঘ) অর্থ (ঙ) ত্বক (চ) মূল্যবান (ছ) প্রতীক্ষা (জ) হরিদ্রাভ (ঝ) সন্ধানে (ঞ) ক্ষুধা।

অনুশীলনী-২

১) অনধিকার অনেক অনিষ্ট অনন্ত অনাহূত

২) ইংরেজি থেকে নেওয়া শব্দ—

গেট	পার্ক	মার্বেল	সাইকেল	সাইরেন
মোটর	কলোনী	সিল্‌ক	কার্পেট	কালেক্‌শান
ট্রাম	হাইড্রেন	টব	ব্লাড-প্রেসার	পাইপ
এরোপ্লেন	অ্যাভিনিউ	অর্কিড	ইস্কুল	প্রাইভেট
রেলিঙ	অ্যাসফল্ট	ট্রাউজার	রেজিগ্‌নেশন	ট্যুশন

আরবি-ফারসি থেকে নেওয়া শব্দ—

উমেদার	মোসাহেবী
পর্দা	সর্দার
খাম	হাজার
চাকরি	তাজা
কলম	হাওয়া

একক ৪ ❑ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য
৪.২ প্রস্তাবনা
৪.৩ মূলপাঠ
৪.৩.১ প্রাচীন যুগ
৪.৩.২ মধ্যযুগ
৪.৩.৩ আধুনিক যুগ
৪.৪ অনুশীলনী
৪.৫ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ
৪.৬ উত্তর সংকেত

৪.১ উদ্দেশ্য

এককটি পাঠ করার পর আপনি

- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের রচনাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

৪.২ প্রস্তাবনা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনটি যুগ—প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ এবং আধুনিক যুগ। বর্তমান এককে তিনটি যুগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল। অল্পপরিসরে হাজার বছরের ইতিহাস আলোচনা করা অসম্ভব। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের মূল গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হল।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

প্রাচীন যুগ	মধ্য যুগ	আধুনিক যুগ
(৯০০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ)	(১৩৫০-১৮০০ খ্রিস্টাব্দ)	(১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে সাম্প্রতিক কাল)

এই এককে প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক যুগের কবিকুল এবং তাঁদের রচনাবলীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। খ্রি: দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ। এই পর্বে সমাজ-কাঠামো জনজীবন কীভাবে সাহিত্যে

প্রতিফলিত হয়েছে, সে সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য দেওয়া হয়েছে।

দ্বাদশ শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত তুর্কি আক্রমণের ফলে বাংলার সমাজে বিপর্যয় নেমে আসে। এই সময় কোনও সাহিত্য রচনার নিদর্শন মেলে না। সাহিত্যের ইতিহাসে এই অধ্যায়কে শূন্যতার যুগ বলা হয়।

খ্রি: ১৩৫০ থেকে ১৮০০ শতাব্দী পর্যন্ত মধ্যযুগ। এক হাজার বছর ব্যাপ্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য আকার এবং বৈচিত্র্যে বিশাল। মধ্যযুগের এই সাহিত্যকর্ম বিভিন্ন ভাগে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চৈতন্য পূর্ববর্তী, চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্য পরবর্তী—চার শতাব্দী ধরে লেখা মঙ্গলকাব্যগুলিকে একটি অংশে সাজানো হয়েছে। বৈষ্ণব সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য এবং অন্য শাখাগুলি, একত্রে গ্রথিত করে আলোচনা করা হয়েছে।

মঙ্গলকাব্য এবং মুসলমানি রোমান্টিক প্রণয়কাব্য আলোচনায় শুধু কাহিনীর উল্লেখ আছে। সবিস্তার আলোচনা করা হয়নি। বিখ্যাত কবিদের নামই বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ যুগসন্ধিক্ষণের কবি। মধ্যযুগের সমাপ্তি আর আধুনিক যুগের সূচনাকাল হল ইতিহাসে যুগসন্ধির পর্ব। সংক্ষেপে সেই সময়টির কথা বলা হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীকে বাংলার 'নবজাগরণের যুগ' বলা হয়। নবজাগরণ পর্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে এই এককে। আধুনিক যুগের রচয়িতা, মনীষীদের নাম এবং তাঁদের প্রতিভার কথা উল্লেখ করে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উন্মেষপর্ব ধরার চেষ্টা হয়েছে।

৪.৩ মূলপাঠ

সাহিত্য সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি। রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সাহিত্যের রূপান্তর ঘটেছে। বাঙালির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের সঙ্গে সমতা রেখে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গড়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্য তিনটি যুগে বিভাজিত—প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ।

৪.৩.১ প্রাচীন যুগ

প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন 'চর্যাপদ'। খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে চর্যাপদ রচিত হয়। নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে চর্যাপদের পুঁথি আবিষ্কার করেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। গীতিকবিতার নাতিদীর্ঘ কাঠামোয় চর্যাপদ লেখা হয়। ৪৬টি পদ বা কবিতা সংগ্রহ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। গ্রন্থের নামকরণ করেন 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। ২৪ জন পদকর্তার নাম পরিচয় মিলেছে। উল্লেখযোগ্য পদকর্তারা হলেন—লুইপাদ, কাহ্নপাদ, ভুসুকপাদ, সরহপাদ প্রভৃতি।

সহজিয়া মতবাদ ও সাধনপদ্ধতি হল চর্যাপদের মর্মবস্তু। চর্যাপদে বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র, নির্বাণ বা মুক্তিলাভ এবং বৌদ্ধদর্শন প্রকাশ পেয়েছে। তত্ত্ব আড়াল করে লৌকিক জীবনের কথাও বলা হয়েছে। ফলে ভাষায় এসেছে সাংকেতিকতা। চর্যার ভাষাকে তাই 'সন্ধ্যা ভাষা' আলো-আঁধারি ভাষা বলা হয়। চর্যাপদে নিম্নবর্ণের মানুষের আচার-আচরণ, জীবিকা-নির্বাহ, জীবনযাপনের পরিচয় পাওয়া যায়। ডোমনারী, অরণ্যাচারী শবর-শবরী, নৌ-নির্মাতা, গৃহনির্মাতা এবং অন্যান্য পেশাজীবীদের উল্লেখ আছে। কৃষিকাজ, শিকার এবং অন্যান্য পেশার ছবি পাওয়া যায়।

কাব্যরস অপেক্ষা তত্ত্ব অর্থাৎ সাধনকথা মুখ্য হলেও চর্যাপদে হাজার বছর আগের বাংলার সমাজজীবনের পরিচয় মেলে।

৪.৩.২ মধ্যযুগ

ত্রয়োদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত (খ্রিস্টাব্দ ১২০০-১৩৫০) বাংলা সাহিত্যের কোনো নিদর্শন মেলে না। তুর্কি আক্রমণের ফলে বাঙালিজীবন বিপর্যস্ত হয়েছিল। অস্থির সময়ে শিল্প সৃষ্টি হয় না। বাংলা সাহিত্যে প্রায় দেড়শো বছর বন্ধ্যাত্ব পর্ব চলেছিল। এই পর্যায়ে লিখিত সাহিত্যের নমুনা মেলেনি। প্রাচীনযুগের সমাপ্তি এবং মধ্যযুগের সূচনাকাল তাই অন্ধকারময়, শূন্যতার যুগ।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে অনুবাদ সাহিত্য। সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, বাংলা এবং অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায়ও অনুবাদ করা হয়েছে। বাংলায় ‘কৃত্তিবাসী রামায়ণ’, কাশীরাম দাসের ‘মহাভারত’, মালাধর বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ অনুবাদ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

রামায়ণের অনুবাদক কৃত্তিবাস পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গাতীরে অবস্থিত ফুলিয়া গ্রামে বসবাস করতেন। গৌড়েশ্বরের প্রদত্ত প্রশংসা তাঁকে রামায়ণ অনুবাদে অনুপ্রেরণা যোগায়। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচনা থেকে এ তথ্য পাওয়া যায়। কৃত্তিবাস অনূদিত রামায়ণ ১৮০২-১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরের খ্রিস্টান মিশনারি উইলিয়াম কেরির উদ্যোগে মুদ্রিত হয়। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, বাঙালির গৃহধর্ম ও গার্হস্থ্যজীবনের কাহিনি স্মরণ করিয়ে দেয়। বাল্মীকির রামায়ণের সীতা তাঁর হাতে বাঙালি কুলবধূ হয়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে তাঁকে অনুসরণ করে অনেক কবি রামায়ণ অনুবাদ করেছেন। কিন্তু কৃত্তিবাসের মতো জনপ্রিয়তা কেউ অর্জন করেননি।

বাল্মীকি রামায়ণের মতো ব্যাসদেবের মহাভারতও অনূদিত হয়েছে। বাংলায় মহাভারতের প্রধান অনুবাদকের নাম কাশীরাম দাস। অনুমান করা হয় সপ্তদশ শতকের (১৬০২-১৬১০ খ্রিস্টাব্দে) প্রথম দশকে তিনি মহাভারত অনুবাদ করেন। বর্ধমান নিবাসী কাশীরাম দাস বৈষ্ণবভাবাপন্ন ছিলেন। সংস্কৃত মহাভারতের মতো বিশাল কাহিনি, উচ্চতর জীবনের আদর্শ, শ্রীকৃষ্ণের মহিমা, এ সবই কাশীরামের অনুবাদে সহজ প্রচেষ্টায় উঠে এসেছে। মহাভারত অনুবাদ রামায়ণের মতো বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। পরবর্তী সময়ে কাশীরামের অনুবাদ অনুসরণ করে কয়েকজন কবির মহাভারত অনুবাদের পরিচয় পাওয়া যায়।

মালাধর বসু মধ্যযুগে ভাগবত পুরাণের অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণবিজয়। ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের সরল সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেন। তাঁর নিবাস ছিল বর্ধমানের কুলীন গ্রামে। গৌড়েশ্বর কবিকে ‘গুণরাজ খাঁ’ উপাধি দিয়েছিলেন। তাঁর অনুবাদটি যেন বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতিরই প্রতিচ্ছবি। পরবর্তী বাংলার বৈষ্ণবসমাজে শ্রীকৃষ্ণবিজয় যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে কাব্যটির সার্থকতা আছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের উৎসমুখ খুলে গেলেও জোয়ার আসে আরো কিছুদিন পরে। সে জোয়ারে বাঙালি জীবনে এল নতুন প্রেরণা ও উদ্দীপনা। প্রেরণদাতা ছিলেন সমগ্র বাঙালি জাতির প্রতিভূ শ্রীচৈতন্যদেব। চৈতন্যদেব যে নতুন প্রেমধর্মের আদর্শ প্রচার করলেন, তার প্রভাবে সমসাময়িক মৃতপ্রায় বাঙালি নিজের মহিমায় জেগে উঠল।

চৈতন্যদেব ইংরেজি ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৪০৭ শকাব্দে ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমার সন্ধ্যায় নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচীদেবী। চৈতন্যদেবের মৃত্যু ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে। সাধারণ হিসাবে আটচল্লিশ বছর তাঁর জীবন। স্বল্পায়ু জীবনের অর্ধেক নবদ্বীপে, বাকি অর্ধেক জীবন কাটে নীলাচলে। শেষ আঠারো বছর তিনি দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কাটিয়েছেন। মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরীর কাছে তিনি দীক্ষা নেন। তারপর তাঁর দেহে, মনে এক প্রেমভক্তি প্রবাহ সঞ্চারিত হয় এবং মানুষের মধ্যে তা ছড়িয়ে দিতে তিনি সচেষ্ট হলেন। কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস নেবার পরে তাঁর ভক্তিভাবাবেগ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল।

সৃষ্টির পর্যায়ে প্রাণের সর্বোত্তম প্রকাশ হল মানুষ। মানুষই আবার দেবতাকে গড়ে তুলছে। সুতরাং 'কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা নরবপু তাঁহার স্বরূপ।' এভাবে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি অতীত থেকে টেনে এনে বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত করে বাঙালির চিন্তাধারাকে আধুনিক খাতে তিনি বইয়ে দিলেন। তবে চৈতন্য প্রবর্তিত দৃষ্টিকোণই বৈষ্ণবসাহিত্যের বিচার্য নয়। তিনি সমগ্র বাঙালি সমাজ ও বাংলা সাহিত্যে বিশেষ প্রভাব ফেলেছেন।

চৈতন্যদেবের পূর্বে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ রচয়িতা কিছু কবির পরিচয় আমরা পাই। এর মধ্যে বড়ু চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি দ্বিজ চণ্ডীদাসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মধ্যযুগের সূচনাতে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক একটি কাব্য রচিত হয়। রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে 'বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্‌বল্লভ' বড়ু চণ্ডীদাসের ওই প্রাচীন পুঁথিটি আবিষ্কার করে সম্পাদনা করেন। পুঁথির নামকরণ করেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। সহজ সরল ভাষায় নাটকীয়ভাবে কৃষ্ণ-রাধা-বড়ায়ি প্রভৃতি চরিত্রগুলি উপস্থাপিত হয়েছে। প্রাক্-চৈতন্য পর্বে রচিত তাঁর কাব্যটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ সমাদর পেয়েছে।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস, এই দুজন কবির কাব্যের বিষয় ছিল, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। সুতরাং চৈতন্যপূর্বযুগে বৈষ্ণব পদবলির একটি বিশেষ ধারা পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস কেউই বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত নন, কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁদের বিশিষ্ট স্থান আছে। তার প্রধান কারণ তাঁদের রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ চৈতন্যদেব আস্বাদন করতেন। উভয় কবির রচনার বিষয়ে এক হলেও ভাব ও প্রকাশে পার্থক্য রয়েছে। চণ্ডীদাস সহজ, সরল প্রাণের কবি। তাঁর অঙ্কিত রাধা গভীর মনের কথা সহজ ভাষায় ব্যক্ত করেছে। বিদ্যাপতির রাধা তুলনামূলকভাবে চঞ্চলপ্রাণা দু'জনের ভাষাশৈলীও আলাদা। ভাষার ক্ষেত্রে দুই কবির স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে। ভাষার জন্যই রাধাচরিত্রটি দুজন কবির কাছে দু'রকমভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

মহাভাবে আশ্রিত চৈতন্যদেবকে দেখে এবং তাঁর কথা শুনে যাঁরা পদ রচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে গোবিন্দ ঘোষ বলরাম দাস জ্ঞান দাস প্রমুখ কবিগণ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। চৈতন্যদেবের তিরোধনের পর যাঁরা পদ রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে গোবিন্দদাস যাদবেন্দ্র ঘনরাম দাস উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস শুধু কবি, ভক্ত নন। তাঁদের লেখায় তত্ত্ব নেই। তত্ত্ব বলতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যা বুঝিয়েছেন তা হল, প্রিয়তমকে কান্তভাবে বা ভগবানরূপে উপাসনা করা হল ধর্মের শেষ কথা। রাধাকৃষ্ণ প্রেম সম্পর্ক তাঁদের কাছে তত্ত্ব হয়ে উঠল। লৌকিক জীবন বা নায়ক-নায়িকার প্রেম সম্পর্ক, মা-সন্তানের বাৎসল্য সম্পর্ক রাধা-কৃষ্ণ প্রতীকে কবিরা পদ রচনা করেছেন। রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' ও 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থ দুটিতে বৈষ্ণব তত্ত্বসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেই ব্যাখ্যা অনুসারে পদকর্তারা পদ রচনা করতেন। রসতত্ত্ব নির্দেশিকায় পূর্বরাগ, অভিসার, মান, মাথুর ইত্যাদির সংজ্ঞা সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

পদাবলি সাহিত্য ছাড়া এই সময়ে সাহিত্যের আরেকটি দিক লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ ও নীলাচলের লীলা দিয়ে চরিতসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। আদি দুই জীবনীকার, মুরারি গুপ্ত এবং স্বরূপ দামোদর দুজনেই

চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে জীবনীকাব্য লিখেছেন। চৈতন্যপার্ষদ মুরারি গুপ্তের 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্' বা মুরারি গুপ্তের কড়চা সংস্কৃতে লেখা প্রথম জীবনীকাব্য। স্বরূপ দামোদরের কড়চাও সংস্কৃতে লেখা। জয়ানন্দ ও লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল', বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' এবং কৃষ্ণদাস-কবিরাজ গোস্বামীর 'চৈতন্যচরিতামৃত' উৎকৃষ্ট জীবনীকাব্য। পরবর্তীকালে এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বহু কবি বাংলায় চরিত-সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করেছেন। রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণনা করার সময়ে পদকর্তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত'—শ্রীগৌরাঙ্গ অর্থাৎ চৈতন্যদেবের প্রেমময় মুখ। বৈষ্ণবের তত্ত্বদৃষ্টিতে গৌরচন্দ্র একাধারে রাধা ও কৃষ্ণ। চৈতন্যদেবের দিব্যজীবনকে যাঁরা নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাঁদের মধ্যে নরহরি সরকার বাসুদেব ঘোষ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য কবি। রাধাভাবে ভাবিত চৈতন্যদেবের কৃষ্ণ আরাধনা লক্ষ করে পদকর্তারা যে-সব গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ লিখেছেন, সেগুলিকে 'গৌরচন্দ্রিকা' বলা হয়ে থাকে। গৌরচন্দ্রিকা অর্থ হল ভূমিকা। পালা শুরু করার আগে কীর্তনীয়ারা গৌরচন্দ্রিকা গেয়ে বুঝিয়ে দেন যে এরপর রাধা-কৃষ্ণের কোন্ বিষয়টি উত্থাপন করা হবে। এছাড়া বাল্যলীলার গৌরাঙ্গপদও আছে। সেগুলি অবশ্য রাধাভাবে ভাবিত নয়। তাই গৌরচন্দ্রিকা বলা যায় না। জীবনীসাহিত্য ও পদাবলি সাহিত্য নিয়েই সুসমৃদ্ধ ছিল ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্য।

খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী থেকে বিভিন্ন জনসম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি মঙ্গলগান সুসংবদ্ধ কাহিনির আকারে রচিত হয়ে প্রচার লাভ করেছিল। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক এই আখ্যানকাব্যগুলি মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত লাভ করেছে।

'মঙ্গল' কথাটির অর্থ কল্যাণ, অর্থাৎ গৃহকল্যাণ বিষয়ক রচনাকে মঙ্গলকাব্য বলে। মঙ্গলকাব্য দেবদেবীর পূজা প্রচারের কাহিনি। তাঁরাই প্রধান চরিত্র। মঙ্গলকাব্যের প্রধান তিনটি ধারা হল, মনসাদেবীকে নিয়ে 'মনসামঙ্গল', চণ্ডীদেবীকে নিয়ে 'চণ্ডীমঙ্গল', ধর্মঠাকুরকে নিয়ে 'ধর্মমঙ্গল'। মোটামুটিভাবে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে মনসামঙ্গল কাব্য, ষোড়শ শতাব্দী থেকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য এবং সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ধর্মমঙ্গল কাব্য লেখা শুরু হয়। শিবায়ন বা শিবমঙ্গল নামে মঙ্গল কাব্যের চতুর্থ একটি ধারা আছে।

আনুষ্ঠানিকভাবে মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল আট দিন ধরে ধর্মমঙ্গল বারো দিন গাওয়া হয়ে থাকে।

মনসা পৌরাণিক দেবী। 'মনসা'র স্থান বৈদিক সাহিত্যে নেই। কিন্তু বাংলা ভাষায় রচিত মনসামঙ্গলের মূল বিষয় : বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনি। মনসার গীত প্রথম রচনা করেন বলে কানা হরিদত্ত-এর নাম জানা যায়। বিজয়গুপ্ত বিপ্রদাস পিপলাই মনসামঙ্গল কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবি। চৈতন্য সমসাময়িক মনসামঙ্গল কাব্যের কবি নারায়ণদেব এবং সপ্তদশ শতকে মনসামঙ্গলের উল্লেখযোগ্য কবি হলেন কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ।

চণ্ডীমঙ্গলের দেবী চণ্ডী মহিষাসুর বিনাশিনী নন, তিনি অভয়া বনদেবী। কাব্যে দুটি কাহিনি আছে—এক 'আখেটিক খণ্ড', দুই 'বণিক খণ্ড'।

প্রথম খণ্ডে দেবী অরণ্যের পশুমাতা। ব্যাধের অত্যাচার থেকে পশুদের রক্ষার জন্য ব্যাধকে প্রচুর সম্পত্তি নিয়ে বনভূমি পরিষ্কার করিয়ে রাজ্য স্থাপন করিয়েছিলেন এই দেবী। দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি অরণ্যপালিকা। দুর্গত নারীকে অনুকম্পা দেখিয়ে, তাকে দিয়ে পূজা করিয়ে নিজের মহিমা প্রচার করেছেন তিনি।

চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবির নাম মাণিক দত্ত। তবে এই কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। দেবদেবী মাহাত্ম্য প্রচারের আড়ালে কবিরা মানুষের জয়গান করেছেন। মঙ্গলকাব্য যেহেতু মধ্যযুগের সাহিত্য, স্বাভাবিকভাবে সেখানে দেবতা প্রাধান্য পেয়েছে। তবুও কাব্যগুণে মঙ্গলকাব্যে যথেষ্ট চমৎকারিত্ব রয়েছে।

ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য অবলম্বন করে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিশেষত্ব হল যে, কেবলমাত্র বাংলাদেশের রাঢ় অঞ্চলে এর প্রচার সীমাবদ্ধ। এর কারণ বোধ করি, মনসা বা চণ্ডীর মতো ধর্মদেবতার মাহাত্ম্য এত ব্যাপক নয়। একমাত্র ডোম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ ধর্মপূজায় পৌরোহিত্য করার অধিকার পেয়েছিল। মঙ্গলকাব্যের দেবতা প্রধানত নারী। ধর্মমঙ্গলে পুরুষ দেবতা স্থান পেয়েছে। বীররসের প্রকাশ প্রথম পাওয়া যায় ধর্মমঙ্গল কাব্যে। কাব্যকাহিনীতে একটি বৈশিষ্ট্য আছে। বিবরণে ঐতিহাসিক পটভূমির আভাস পাওয়া যায়। গৌড়ের সম্রাট ধর্মপালের পুত্রের সঙ্গে অজয় নদের দক্ষিণ্ তীরবর্তী পার্বত্য গড়ের অধিপতি ইছাই ঘোষের যুদ্ধের বৃত্তান্ত নিয়ে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত।

কাব্যের আদিকবি হিসেবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন ময়ূরভট্ট। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কবির নাম খেলারাম চক্রবর্তী। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্য যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। এছাড়া আরও কয়েকজনের মধ্যে ঘনরাম চক্রবর্তী, রামদাস আদক এবং সীতারাম দাস উল্লেখযোগ্য।

মধ্যযুগীয় চেতনায় ধর্মের একটি বিশেষ স্থান ছিল। ফলে, স্বাভাবিকভাবে সাহিত্য ধর্মীয় প্রভাব মুক্ত হতে পারেনি। বৈষ্ণবপদাবলি রোমান্টিক কাব্য হলেও ধর্মীয় তত্ত্ব বা দার্শনিকতা বহির্ভূত নয়। সপ্তদশ শতাব্দীর অধিকাংশ রচনায় দেবতা সম্পর্কে ভীতি যতটা আছে, ভক্তি ততটা নেই।

ধর্ম ও দেবতা বাদ দিয়ে সপ্তদশ শতাব্দীতে কয়েকখানি প্রেমগাথা রচিত হয়েছিল। রচয়িতারা মুসলমান কবি। তাঁদের কাব্যের শ্রোতা পাঠক আরাকানের রাজা এবং রাজপুরুষ সম্প্রদায়। গোহারি দেশের রাজা লোরের সঙ্গে ময়নাবতীর বিবাহ হয়; কিন্তু চন্দ্রাণী নামে অপর নারীর সঙ্গে লোর প্রণয়ে আবদ্ধ হয়, বহু ক্লেশের পর উভয়ের মিলন হয়। প্রথম খণ্ড তাই লোরচন্দ্রাণী নামে অভিহিত।

দ্বিতীয় খণ্ডে আছে, সতীময়নার বিরহের বর্ণনা কাহিনির শেষে ময়নার কৌশলে চন্দ্রাণীকে নিয়ে তার কাছে লোর ফিরে আসতে বাধ্য হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কাহিনি দুটি দেবতাবিহীন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান রাজসভার আনুকূল্যে বাংলা সাহিত্যের দুজন বড়ো কবি হিন্দিতে লেখা প্রণয় কাব্য ভাষান্তর করেন। সতীময়না বা লোরচন্দ্রাণী কাব্যের রচয়িতা হলেন দৌলতকাজি। তিনি শক্তিশালী কবি ছিলেন। গ্রন্থসমাপ্তির পূর্বেই দৌলতকাজির মৃত্যু হয়। দৌলতকাজির কাব্যরচনার আনুমানিক সময়কাল ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ।

আরাকান বা রোসাঙের রাজসভায় দৌলতকাজির পরে আসেন সৈয়দ আলাওল। তিনি ছিলেন সভার শ্রেষ্ঠ কবি। দৌলত কাজির অসমাপ্ত গ্রন্থ তিনি শেষ করেন। আলাওলের প্রধান কীর্তি 'পদ্মাবতী' কাব্য। তিনি আরো কয়েকটি কাব্য ও কিছু গান রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছেন।

প্রাচীনযুগের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নাথযোগী ও সিদ্ধাচার্যদের নাম। নাথযোগীদের কাহিনি দুভাগে বিভক্ত। একটি সিদ্ধাদের কাহিনী, অপরটি মীননাথ ও তাঁর শিষ্য গোরখনাথের কাহিনি। প্রথম কাহিনির মূল বিষয় হল, শিষ্য গোরখনাথ কামিনী মোহগ্রস্ত গুরু মীননাথকে উদ্ধার করেছেন। কাহিনির নাম তাই মীনচেতন বা গোরখবিজয়। দ্বিতীয় কাহিনির বিষয় হল, রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণ। কাহিনির প্রধান আকর্ষণ হল রাজপুত্রের সন্ন্যাসগ্রহণের অধ্যায়। ফয়জুল্লা, শ্যামদাস সেন হলেন কাহিনিগুলির প্রধান কবি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ বাংলা সাহিত্যে যুগসন্ধিক্ষণ নামে চিহ্নিত হয়েছে। মোঘল শাসন অবলুপ্তির পথে পা দিয়েছে আর ইংরেজ আগমন সূচিত হচ্ছে, তাই যুগসন্ধি। ফলত সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সর্বোপরি সাংস্কৃতিক

ক্ষেত্রে বিপর্যয় নেমে এসেছিল, এমনই এক মুহূর্তে দুজন বিখ্যাত কবি ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের আবির্ভাব ঘটে।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর অনুসরণে ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীতে অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। রামপ্রসাদও এই সময় রচনা করেন বিদ্যাসুন্দর কাব্য। কাহিনির কাঠামোতে বিশেষ কোনো ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায় না। এমনকি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে গঠন বিন্যাসে মূল পরিবর্তন আনা হয়নি। রামপ্রসাদ মূলত শাক্তপদাবলি রচনার জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। আগমনী ও বিজয়া পর্বের পদ এবং ভক্তের আকুতি শীর্ষক পদগুলি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। ভাগীরথীর পূর্বতীরে নবাবি শাসনের ব্যর্থতা, পশ্চিম তীরে বর্গিদের অবাধ লুণ্ঠন, বিদেশি জলদস্যুদের বাংলার উপকূল অঞ্চলের ফসল অপহরণ বাংলার সমাজ ও গার্হস্থ্যজীবন দুর্বিসহ করে তোলে। ঘরে ঘরে অন্নাভাব, রুচির অধঃপতন দুঃখ দুঃসহ দুর্দিনের কালোছায়া ফেলেছে। একদিকে দরিদ্র স্বামীর ঘরে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, অন্যদিকে কন্যার পিতৃগৃহে আসার আকুতি এবং জননীর উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা বাড়তে থাকে। সংকটগ্রস্ত মানুষের আকুল প্রার্থনা 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে' এই দুঃসময়ের প্রতিচ্ছবি।

যুগসন্ধির নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদের মতো কবিদের বহুমুখী বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাই। যুগচেতনা, সমাজবোধ, ভক্তি ও সুগভীর আকুতি, দেবদেবীর বাস্তবায়ন, সর্বোপরি ভাষা, ছন্দ, অলংকারের বৈচিত্র্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যে সমকালীন যুগচেতনা সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

ইংরেজি অষ্টাদশ শতাব্দীতে মধ্যযুগে প্রচলিত বাংলা সাহিত্য ধারার পাশাপাশি আরেকটি নতুন ধারার সৃষ্টি হয়। এই ধারার সাহিত্য লিখিত সাহিত্য নয়, বৈষ্ণব সাহিত্যের মতো গীতিকবিতা। তবে নগর সংস্কৃতির পটভূমিতে এর জন্ম। নতুন যুগের এই সাহিত্যকে বলা হয় কবিগান। সংস্কৃত 'কবি' শব্দটি এক্ষেত্রে প্রযুক্ত নয়। এখানে কবিতা রচনাকারীদের 'কবিওয়ালা' বলা হয়েছে। জীবিকার তাগিদে তাঁরা কবিতা রচনা করতেন। এই কবিওয়ালাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি রামবসু। ভোলা ময়রা হরুঠাকুর অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি প্রমুখ বহু কবিওয়ালার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বল্প শিক্ষিত স্তর থেকে কবিওয়ালাদের উদ্ভব হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর নানা রাজনৈতিক বিপর্যয়ে সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভাবনা প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছিল। পলাশী যুদ্ধোত্তর সমাজে দেখা দিয়েছিল বিশৃঙ্খলা, ফলে প্রাচীন আভিজাত্য ভাঙতে থাকে। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ও নবাবি দ্বৈতশাসনের সুযোগে কিছু মানুষ নানাভাবে বিত্ত অর্জন করে নতুন নাগরিক সমাজ গড়ে তুলল। গঙ্গাতীরবর্তী কলিকাতা, চন্দননগর হুগলি প্রভৃতি অঞ্চল থেকে কবিওয়ালাদের উদ্ভব হয়। সমাজের একশ্রেণির নতুন নাগরিক মানুষদের মনোরঞ্জন করাই ছিল কবিওয়ালাদের গান রচনার উদ্দেশ্য। বিশিষ্ট শিল্পরূপের বিকাশ তাঁদের লক্ষ্য ছিল না।

৪.৩.৩ আধুনিক যুগ

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে সে যুগের সাহিত্য ছিল প্রধানত দেবনির্ভর। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকে আধুনিক যুগের সূচনাকাল ধরা হয়ে থাকে। ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলাদেশে ইংরেজ শাসনকালে ইংরেজি সাহিত্যের যে প্রভাব পড়েছিল, তার ফলস্বরূপ বাংলা সাহিত্য নতুন পথের সন্ধান পেল। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ও সাহিত্যে পালাবদল ঘটল। ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে উনিশ শতকের বাঙালি সাদরে অনেক কিছু গ্রহণ করে নিল। এযুগে দেবতা নয়, মানুষই মুখ্য হয়ে উঠেছে সাহিত্যে। কাব্য নাটক গদ্য উপন্যাস—এক-কথায় নতুন চেতনার উদ্ভব ঘটেছে। তাই উনিশ শতককে বাংলার নবজাগরণের যুগ বলা হয়।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন যেমন মহাকাব্য রচনা করেছেন, অন্যদিকে ঈশ্বরগুপ্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তেমনই দেশাত্মবোধক কবিতা রচনা করেছেন। মহাকাব্যের দেবদেবীরা মানুষ হয়ে

সমকালীন কাব্যে দেখা দিলেন। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীরামপুরের মিশনারি এবং ফোর্টউইলিয়াম কলেজের লেখকবৃন্দের প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্যের নতুন দিগন্ত খুলে গেল। যুক্তি নির্ভর গদ্যভাষা হাজির হতে এই যুগের মানুষ তাঁদের বক্তব্য গদ্যে প্রকাশ করতে পেরেছেন। কাহিনির মাধ্যম হিসেবে গদ্যভাষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় দত্তের মতন মনীষীদের হাতে বিকশিত হয়েছে গদ্যভাষা। এঁদের অনুসরণ করে বাঙালি লেখকরা পরবর্তীকালে গদ্যে বৈচিত্র্য দেখাতে পেরেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে নাট্য জগতেও নবজাগরণ দেখা দিল। রামনারায়ণ তর্করত্ন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশ ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশের স্বাদেশিকতা নিয়ে এই নাট্যকারগণ নাটক লিখেছেন। রঙ্গ-ব্যঙ্গ ট্র্যাজেডি সব কিছুই তাঁদের নাটকে বিচিত্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

গল্পের প্রতি মানুষের সবসময়ই আকৃষ্ট হওয়ার প্রবণতা আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্যারীচাঁদ মিত্র উপন্যাস রচনার গোড়াপত্তন করলেও প্রথম সার্থক বাংলা উপন্যাস লেখেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁকে অনুসরণ করে আধুনিক বাংলা উপন্যাস পরিণতি লাভ করেছে।

উপন্যাসের পাশাপাশি এসেছে গীতিকবিতা। কবিহৃদয়ের একান্ত প্রকাশ গীতিকবিতা। মহাকাব্যের আখ্যান কাহিনি গদ্যের ভাষায় প্রবেশ করতে মহাকাব্যের আবেদন লুপ্ত হয়ে গেল। জন্ম নিল গীতিকবিতা, যার মধ্যে রয়েছে গানের ধর্ম। ঊনবিংশ শতাব্দী মূলত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ। কবির একান্ত অনুভূতি গীতিকবিতার প্রাণ।

মধুসূদন দত্তের হাতে গীতিকবিতা রচিত হলেও সার্থক গীতিকবিতা লেখেন বিহারীলাল চক্রবর্তী। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি সাহিত্যিকদের বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর রচনাসম্ভার বাংলা সাহিত্যিকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

৪.৪. অনুশীলনী

১) **নীচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর ডান দিকে দেওয়া সম্ভাব্য ৫টি উত্তর থেকে বেছে (×) চিহ্ন দিন। উত্তর করা হয়ে গেলে এককের শেষে দেওয়া ৫০ পৃষ্ঠায় উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।**

(ক) শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনা করেছেন

(১) চৈতন্যদেব

(২) বিদ্যাপতি

(৩) রামপ্রসাদ

(৪) মালাধর বসু

(খ) শাক্তবদাবলির রচয়িতা

(১) রামপ্রসাদ সেন

(২) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

(৩) রূপরাম চক্রবর্তী

(৪) ভারতচন্দ্র

(৫) কাশীরাম দাস

(গ) চণ্ডীমঙ্গলের রচয়িতা

(১) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

(২) মুরারি গুপ্ত

(৩) কৃত্তিবাস

(৪) আলাওল

(৫) গোবিন্দদাস

২) নীচের শূন্যস্থানগুলি সঠিক উত্তর লিখে পূরণ করুন।

(ক) মঙ্গলকাব্যের দেবতা প্রধানত ....।

(খ) গৌড়েশ্বর মালাধর বসুকে .... উপাধি দিয়েছিলেন।

(গ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা হলেন ....।

(ঘ) লোচনদাস .... রচনা করেছিলেন।

৩) নীচের প্রশ্নগুলি সঠিক উত্তর ডান দিকে দেওয়া সম্ভাব্য ৩টি উত্তর বেছে টিক চিহ্ন (✓) দিন। উত্তর করার পর এককের শেষে দেওয়া ৫০ পৃষ্ঠায় উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

(ক) চর্যাগীতির উদ্ভব
(১) প্রাচীন যুগ
(২) মধ্যযুগ
(৩) আধুনিক যুগ

(খ) চর্যাগীতির আবিষ্কারক
(১) মালাধর বসু
(২) বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
(৩) হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয়
(৪) বড়ু চণ্ডীদাস
(৫) রামপ্রসাদ

(গ) বাংলা রামায়ণের অনুবাদক
(১) তুলসীদাস
(২) কাশীরাম দাস
(৩) কৃত্তিবাস
(৪) মালাধর বসু
(৫) দ্বিজ চণ্ডীদাস

(ঘ) মুরারি গুপ্ত রচিত জীবনীকাব্য
(১) শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত
(২) চৈতন্যচরিতামৃত
(৩) চৈতন্যমঙ্গল
(৪) উজ্জ্বলনীলমণি
(৫) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

৪) নীচে কয়েকজন রচয়িতা ও গ্রন্থের নাম দেওয়া আছে। আপনি সেগুলিকে দুই স্তম্ভে উপযুক্তস্থানে লিখুন।

(ক)	মহাভারত	কেতকদাস ক্ষেমানন্দ
(খ)	মনসামঙ্গল	রূপরাম
(গ)	ধর্মমঙ্গল	কাশীরাম দাস
(ঘ)	বৈষ্ণবপদাবলি	জ্ঞানদাস
(ঙ)	সতীময়না	দৌলতকাজি
	রচয়িতা	গ্রন্থ
(ক)	....	....
(খ)	....	....
(গ)	....	....
(ঘ)	....	....
(ঙ)	....	....

৫। নিম্নলিখিত রচয়িতাদের গ্রন্থগুলির নামকরণ কিছু শুদ্ধ এবং কিছু অশুদ্ধ দেওয়া আছে। কোন্‌টি শুদ্ধ বা অশুদ্ধ তা নির্দিষ্ট ঘরে (×) চিহ্ন দিয়ে দেখান। এরপর ৫০ পৃষ্ঠার উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

		শুদ্ধ	অশুদ্ধ
(ক)	কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত চৈতন্যচরিতামৃত।	☐	☐
(খ)	কাশীরাম দাসের রচনা রামায়ণ।	☐	☐
(গ)	বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।	☐	☐
(ঘ)	শাক্তপদাবলি রামপ্রসাদের লেখা।	☐	☐
(ঙ)	নাথ সাহিত্য লিখেছেন ফয়জুল্লা।	☐	☐
(চ)	রূপরাম বিখ্যাত রচয়িতা ধর্মমঙ্গলের।	☐	☐
(ছ)	'অন্নদামঙ্গল কাব্য' ভারতচন্দ্রের রচনা।	☐	☐
(জ)	'মেঘনাদবধ কাব্য' মধুসূদন দত্তের রচনা।	☐	☐
(ঝ)	'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' বিদ্যাপতির রচনা।	☐	☐

৬। নীচের শূন্যস্থানগুলি সঠিক উত্তর লিখে পূরণ করুন। এরপর ৫০ পৃষ্ঠার উত্তর-সংকেত দেখুন।

(ক) .... থেকে চর্যাপদের আবিষ্কার হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয়ের বিশিষ্ট কীর্তি।

(খ) শ্রীকৃষ্ণবিজয় .... রচনা।

(গ) .... চৈতন্যদেবের জন্মস্থান।

(ঘ) গোবিন্দদাস একজন .... কবি ছিলেন।

(ঙ) .... সংস্কৃত ‘কবি’ অর্থে কবি নয়।

(চ) .... উনিশ শতকের গদ্য লেখক।

৪.৫ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত : ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪.৬ উত্তর-সংকেত

১। ক-৫, খ-১, গ-১

২। (ক) নারী, (খ) গুণরাজ খাঁ, (গ) বড়ু চণ্ডীদাস, (ঘ) চৈতন্যমঙ্গল।

৩। ক-১, খ-৩ গ-৩, ঘ-১

৪। মহাভারত—কাশীরামদাস, মনসামঙ্গল—কেতকদাস ক্ষেমানন্দ, ধর্মমঙ্গল—রূপরাম, বৈষ্ণবপদাবলি—জ্ঞানদাস, সতীময়না—দৌলতকাজি।

৫। (ক) শুদ্ধ

(খ) অশুদ্ধ

(গ) শুদ্ধ

(ঘ) শুদ্ধ

(ঙ) অশুদ্ধ

(চ) শুদ্ধ

(ছ) শুদ্ধ

(জ) শুদ্ধ

(ঝ) অশুদ্ধ

৬। (ক) নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগার

(খ) মালাধর বসুর

(গ) নবদ্বীপ

(ঘ) বৈষ্ণব

(ঙ) কবিওয়ালা

(চ) রাজা রামমোহন রায়

একক ৫ ❑ ধ্বনিবিজ্ঞান ঃ বাংলা ধ্বনির পরিচয়

গঠন

৫.১ উদ্দেশ্য
৫.২ প্রস্তাবনা
৫.৩ মূলপাঠ-১
 ৫.৩.১ বাগ্‌যন্ত্র
 ৫.৩.২ বাংলাভাষার ধ্বনি বর্ণ অক্ষর
৫.৪ সারাংশ-১
৫.৫ অনুশীলনী-১
৫.৬ মূলপাঠ-২
 ৫.৬.১ স্বরধ্বনি আর স্বরবর্ণ
 ৫.৬.২ দ্বিস্বরধ্বনি আর অর্ধস্বরধ্বনি
 ৫.৬.৩ স্বরধ্বনির উচ্চারণ
 ৫.৬.৪ ব্যঞ্জনধ্বনি আর ব্যঞ্জনবর্ণ
 ৫.৬.৫ ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ
৫.৭ সারাংশ-২
৫.৮ অনুশীলনী-২
৫.৯ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ
৫.১০ উত্তর-সংকেত

৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে

- বাগ্‌যন্ত্র ও স্বরধ্বনি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- বাংলা ধ্বনির বিভিন্ন শ্রেণি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ভাষার প্রধান একক ধ্বনিকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে সমর্থ হবেন।

৫.২ প্রস্তাবনা

যে-কোনো ভাষাই যদি শোনা যায় তাহলে প্রথমে মনে হবে বেশ কিছু ধ্বনি প্রবাহিত হচ্ছে। যে-কোনো ভাষারই প্রাথমিক একক হচ্ছে এই ধ্বনি। বাংলা বর্ণমালা এসেছে সংস্কৃত বর্ণমালা থেকে। সংস্কৃত বর্ণমালা অনেক আগেই

ধ্বনিগুলিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সাজিয়ে রেখেছিল, উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রত্যেকটি ধ্বনিকে আলাদা আলাদা সাজানো হয়েছিল। এই আলোচনা পড়লে বাংলাভাষার ধ্বনি সম্পর্কিত প্রয়োগ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অবহিত হবেন এবং ধ্বনির সঠিক প্রয়োগে সক্ষম হবেন।

৫.৩ মূলপাঠ-১

ধ্বনিবিজ্ঞানের এই এককে আমরা আলোচনা করব—ধ্বনির উৎপত্তি কী করে হয়, বাংলাভাষায় কথা বলতে গিয়ে আমাদের কী কী ধ্বনির উচ্চারণ করতে হয়, নানাধ্বনির নানা উচ্চারণে কথাবলার যন্ত্রের বা বাগ্‌যন্ত্রের কোন্ অংশ কী কাজ করে—ইত্যাদি। এককের ১ম অংশে আমরা প্রথমে বাগ্‌যন্ত্রটাকে চিনে নেবার চেষ্টা করি এবং তারপর বুঝে নিই, বাংলাভাষায় ধ্বনি বর্ণ অক্ষর—এদের পার্থক্য কী।

৫.৩.১ বাগ্‌যন্ত্র

অন্য প্রাণীরা যে কথা বলতে পারে না তার অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি হল মুখের গঠন। মানুষের মুখের ভিতরের এবং বাইরের গঠন কথা বলার পক্ষে সুবিধাজনক। যেমন,

চোয়াল—হালকা এবং বারবার ওঠানামা করার উপযুক্ত।

মাংসপেশী—নমনীয় এবং নাড়াচাড়ার পক্ষে সুবিধাজনক। ঠোঁট দাঁত জিভ আলজিভ অধিজিহ্বা তালু স্বরপল্লব ফুসফুস—এ সবই কথা বলার সময় নানাধরনের কাজ করে।

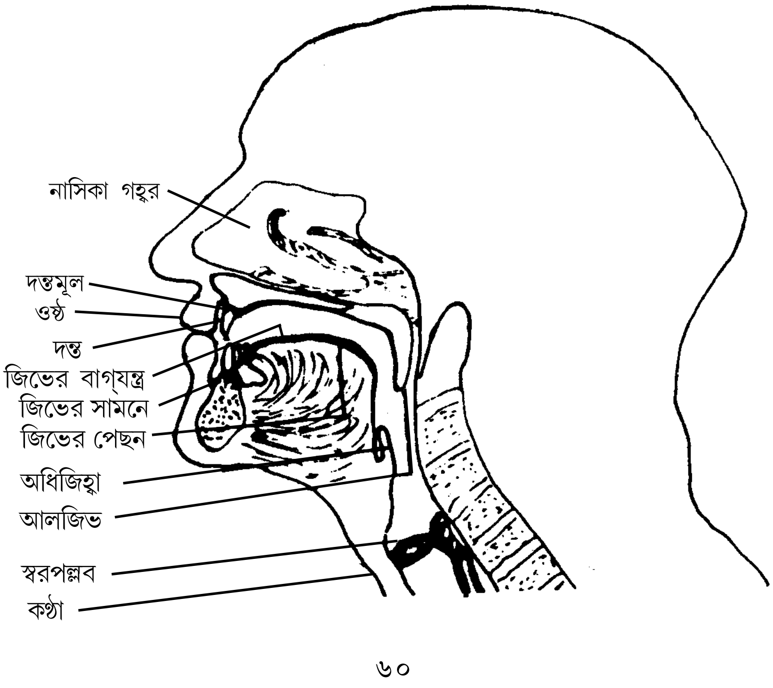

আমরা অনবরতই শ্বাস নিচ্ছি আর শ্বাস ফেলছি, মুখ আর নাক দিয়ে শ্বাস নিয়ে সোজা শ্বাসনালি দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি ফুসফুসে। আবার ফুসফুস থেকে সেই বাতাস বেরিয়ে আসছে বাইরে। এই বাতাস বেরিয়ে আসার সময়েই আমরা 'কথা' বলে থাকি। বাতাস প্রথমে এসে ধাক্কা মারে **স্বরপল্লবে** (Vocal fold)। মাঝখানে চেরা পাতলা পর্দা দিয়ে তৈরি এই স্বরপল্লব বাতাস চাপ দিলে ফাঁক হয়ে যায় আর কাঁপতে থাকে। কথা বলার সময় এই স্বরপল্লব নানারকমভাবে কাঁপতে থাকে। কখনও বেশি কখনও বা কম। এই স্বরপল্লবে উপরটা ঢাকা থাকে একটা শক্ত আবরণ দিয়ে। বাইরে থেকে হাত দিলে গলায় উঁচু মতো একটা জায়গা ঠেকে, তার মাঝখানে একটু ফাঁকা অংশ। একে বলে অ্যাডমস **অ্যাপেল**। বাতাস এরপর গিয়ে ধাক্কা মারে **অধিজিহ্বাতে** (Epiglottis)। শ্বাসনালির উপরে ঢাকনা মতো একটা অংশ আছে। একে অধিজিহ্বা বলে। কথা বলার সময় বাতাসের ধাক্কায় এটি উপরে ওঠে, আবার খাওয়ার সময় এটি ঢাকনার মতো শ্বাসনালিকে চাপা দিয়ে দেয়। এই জন্য খাবার সময় কথা বলতে গেলে আমাদের বিষম লাগে। আর মনে করি কেউ বোধহয় নাম করছে বা গাল দিচ্ছে। অনেকে 'ষাট' 'ষাট'

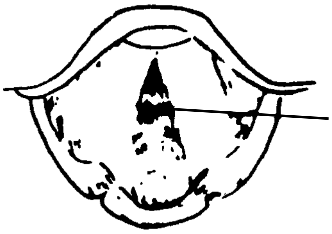

বলে মাথায় চাপড় মেরেও দেন। এরপর কথা বলার সময় বাতাস কোথাও বাধা না পেয়ে, আংশিক বাধা পেয়ে বা পুরোপুরি বাধা পেয়ে নাক দিয়ে বা মুখ দিয়ে বেরোয়। এই সময় জিভ মুখের ভিতরে উপরে ওঠে, নীচে নামে, সামনে যায় এবং পিছনে আসে। তালু সংকুচিত হয়, ঠোঁট ছড়িয়ে যায়, কুঁচকে যায়, খুলে যায়, বন্ধ হয়। চোয়াল ওঠানামা করে। মুখের মাংসপেশিই এইসব নাড়াচাড়া করতে সাহায্য করে।

কথা বলার সময় কোন্ কোন্ অংশ কাজ করে, বাগ্‌যন্ত্রের ছবিটি মিলিয়ে দেখে নিন। স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি পড়ার সময় বাগ্‌যন্ত্রের ছবিটি সামনে রেখে পড়লে বুঝতে সুবিধা হবে।

৫.৩.২ বাংলাভাষার ধ্বনি বর্ণ ও অক্ষর

আমাদের বাগ্‌যন্ত্র সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা হয়েছে। এখন, বাংলাভাষার ধ্বনি ও বর্ণ সম্পর্কে আলোচনা করি।

যদি কোনো বাঙালিকে জিজ্ঞেস করি, আপনি যে ভাষাটা ব্যবহার করেন, তাতে ক-টা ধ্বনি আছে বলুন তো? একটু ভেবে, হয়তো কিছুটা অনিশ্চিতভাবে তিনি উত্তর দেবেন, কেন, গোটা পঞ্চাশেক? মানে, স্বরবর্ণ এই গোটা বারো, আর ব্যঞ্জন হল গিয়ে—কটা যেন?

আমরা বলব, না মশাই, আপনি ঠিক ধরতে পারেননি। আমরা বর্ণ ক-টা জানতে চাইনি। 'ধ্বনি' ক-টা জানতে চেয়েছি।

কেন? বর্ণ আর ধ্বনি কি এক নয়?

না; ধ্বনির হয় উচ্চারণ, আর বর্ণ হল লেখার চিহ্ন। একটা মুখে বলি, কানে শুনি, আর একটা কাগজের উপর লেখা বা ছাপা প্রতীক চিহ্ন, সেটা চোখে দেখি। অনেক পাঠক শুনলে অবাক হবেন, মান্য বাংলায় আমরা মুখে বলি সাতটা স্বরধ্বনি, কিন্তু লেখায় লিখি এগারোটা স্বরবর্ণ। বর্ণকে আমরা অনেক সময় 'অক্ষর'-ও বলি, কিন্তু অক্ষর বলতে আমরা আর একটা জিনিস বোঝাব। একবারের চেষ্টায় একটি শব্দের যতটা অংশ উচ্চারণ করা যায় তাকে আমরা অক্ষর (Syllable) বলব। তাই 'ক-অক্ষর' 'যুক্তাক্ষর' না বলে লেখার বেলায় 'ক-বর্ণ' 'যুক্তবর্ণ' বলব, উচ্চারণের বেলায় 'ক-ধ্বনি' 'যুক্তধ্বনি' বলব।

৫.৪ সারাংশ-১

মানুষের বাগ্‌যন্ত্র কথা বলার উপযুক্ত। জিভ চোয়াল মুখের মাংসপেশি আলজিভ অধিজিহ্বা স্বরপল্লব-কথা বলার সময় নানা ভূমিকা পালন করে।

আমরা উচ্চারণ করি ধ্বনি আর লিখি বর্ণ। আর একে ঝোঁকে যতগুলি ধ্বনি উচ্চারণ করে ফেলি তার নাম অক্ষর।

৫.৫ অনুশীলনী-১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে পৃষ্ঠা ৫৯-এর উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১। (ক) আমাদের বাগ্‌যন্ত্রে যেসব অংশ রয়েছে, পরপর সাজিয়ে তাদের নাম লিখুন। ধ্বনি উচ্চারণ করতে যেসব অংশ কাজে লাগে, কেবলমাত্র তাদের নাম লিখবেন।

(খ) ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভ কী কী কাজ করতে পারে?

(গ) মুখের মাংসপেশি কীভাবে ধ্বনির উচ্চারণে সাহায্য করে?

২। (ক) ধ্বনি আর বর্ণের মধ্যে পার্থক্য কী?

(খ) বর্ণ আর অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য কী?

(গ) অ ক ং ঁ — এগুলি ধ্বনি না বর্ণ না অক্ষর?

৩। নীচের কথাগুলি পুরো করার জন্য ডানদিকে দেওয়া শব্দগুলি থেকে সঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে টিক চিহ্ন দিন—

(ক) আমরা যা উচ্চারণ করি তার নাম ঃ (১) বর্ণ (২) ধ্বনি (৩) লিপি

(খ) আমরা যা লিখি তার নাম ঃ (১) বর্ণ (২) ধ্বনি (৩) অক্ষর

(গ) আমরা একেবারে যতটুকু উচ্চারণ করি তার নাম ঃ (১) বর্ণ (২) ধ্বনি (৩) অক্ষর

৫.৬ মূলপাঠ-২

এককের ২য় অংশে আমাদের আলোচনার বিষয় বাংলাভাষার দু-রকমের ধ্বনি—স্বরধ্বনি আর ব্যঞ্জনধ্বনি। পাশাপাশি স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবহারটাও জেনে নেওয়া যাবে। এই অংশেই আমরা দেখতে পাব, কোন্ ধ্বনির উচ্চারণে বাগ্‌যন্ত্রের কোন্ অংশ কী কাজ করে।

৫.৬.১ স্বরধ্বনি আর স্বরবর্ণ

বাংলা স্বরধ্বনি আর স্বরবর্ণ পাশাপাশি দেখি আমরা

উচ্চারিত স্বরধ্বনি	**লেখার স্বরবর্ণ**
অ, আ, ই,	অ আ ই ঈ
উ, এ, ও,	উ ঊ ঋ
অ্যা	এ ঐ ও ঔ

বাকিগুলির কী হল তাহলে? বাকিগুলি লেখার সময় লিখি কিন্তু উচ্চারণ করি না। বাংলায় ই-ঈ বা উ-ঊ যেভাবে লেখা হয়, হ্রস্ব-দীর্ঘ সেভাবে হয় না। ঋ আসলে রি উচ্চারণই করি আমরা। ঐ বাংলায় ও + ই আর, ঔ বাংলায় ও + উ। একটা স্বর নয়, উচ্চারণে দুখানা, আসলে বলতে পারি দেড়খানা স্বর। এদের বলে দ্বিস্বর। ফলে এক স্বরধ্বনির তালিকায় তারা থাকবে কেন?

৫.৬.২ দ্বিস্বরধ্বনি আর অর্ধস্বরধ্বনি

বর্ণমালার বর্ণে দ্বিস্বর এই দুটো মাত্র, কিন্তু বাংলা শব্দের মধ্যে উচ্চারণে দ্বিস্বর আছে আরও অনেকগুলো—পাশে (ব্র্যাকেটে) উদাহরণসুদ্ধ তার তালিকা দিচ্ছি—অএ্ = অয় (হয়), অও্ (হও), আই্ (ভাই), আউ্ (ঝাউ), আএ্ = আয় (আয়, হায়), আও্ (যাও) ইই্ (দিই), ইউ্ (শিউ-লি), এই্ (নেই), এউ্ (ঢেউ), এও্ (দেও-য়া), অ্যাএ্ = অ্যায় (দেয়, নেয়), অ্যাও্ (ন্যাও-টা), এই্ (বই), ওউ্ (মউ), ওএ্ = ওয় (ধোয়), ওও্ (ছোঁও)—অর্থাৎ প্রায় সতেরোটার মতো। কিন্তু এদের মাত্র দুটিকে এক বর্ণে লেখা হয়—ঐ ঔ। বাকিগুলিকে ভেঙে দুটি স্বরবর্ণে লিখতে হয়।

দ্বিস্বর আসলে একটি পূর্ণস্বর + একটি অর্ধস্বর। অর্ধস্বর কী? না, আধখানা উচ্চারিত হওয়া স্বর। 'মই' কথাটার ই উচ্চারিত হচ্ছে আধখানা, কিন্তু 'ময়ী' কথাটার ই উচ্চারিত হচ্ছে পুরো। আধখানা উচ্চারিত স্বরের তলায় হসন্ত দিয়ে বোঝাচ্ছি আমরা। বাংলায় আছে মোট এরকম চারটি অর্ধস্বর—ই্, উ্, এ্, ও্। এ্-কে লেখার সময় আমরা লিখি 'য়' হিসেবে, যার উচ্চারণ হসন্ত। অর্থাৎ তার পরে কোনো স্বর উচ্চারিত হয় না। যেমন, 'হয়'।

৫.৬.৩ স্বরধ্বনির উচ্চারণ

স্বরধ্বনির উচ্চারণের উৎপত্তি হচ্ছে শ্বাসনালির স্বরপল্লবে, কিন্তু স্বরধ্বনির পার্থক্য তৈরি হচ্ছে মুখগহ্বরের মধ্যে।

তা কী করে হয়? তা হয় জিভের ওঠা-নামা ও এগোনো-পিছোনো এবং ঠোঁট দুটির সংকোচন-প্রসারণের দ্বারা। মুখের পথ বন্ধ না করেও স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভ দু-রকমভাবে চলাফেরা করে—১. উপরে-নীচে, ২. সামনে-পিছনে; আর ঠোঁট দুটিও খোলা অবস্থাতেই গোল, ছড়ানো, কম খোলা, বেশি খোলা ইত্যাদি আকৃতি নেয়। জিহ্বা ও ঠোঁটের এই গতি ও আকৃতি পরিবর্তনের উপর নির্ভর করেই স্বরধ্বনিগুলিও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। যেমন, চলিত ভাষায় সাতটি স্বরধ্বনির উচ্চারণে এই ব্যাপারগুলি ঘটে—

আ ঃ জিভ নীচে পড়ে থাকে, এগোয় না, পিছোয়-ও না, ঠোঁট দুটি বেশ খুলে থাকে;

অ ঃ জিভ সামান্য একটু উঠে পিছিয়ে যায়, ঠোঁট দুটি বেশ খোলা (আ-এর মতো অতটা নয়) অবস্থাতেই 'গোল' হয়;

অ্যা ঃ জিভ সামান্য একটু উঠে একটু এগিয়ে আসে, ঠোঁট দুটি বেশ খোলা (আ-এর চেয়ে কম) অবস্থাতেই 'ছড়িয়ে' থাকে;

ও ঃ জিভ আর-একটু উঠে পিছিয়ে আসে; ঠোঁট দুটি গোল থাকে, কিন্তু কিছুটা ছোটো দেখায়।

এ ঃ জিভ ও-র ধরনেই উঠে আসে। কিন্তু এগিয়ে যায়; ঠোঁট দুটি ছড়িয়ে থাকে, তবে অ্যা-র বেলায় যতটা খোলা ছিল ততটা থাকে না।

উ ঃ জিভের পিছনটা বেশ উপরে উঠে আসে এবং জিভটাও পিছিয়ে যায়। মুখ গোল থাকে, কিন্তু তার পথটা বেশ সরু দেখায়।

ই ঃ জিভের সামনেটা বেশ উপরে উঠে আসে। ঠোঁটদুটি ছড়িয়ে থাকে, কিন্তু খুব খুলে থাকে না। (আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্বরধ্বনিগুলি বলে ঠোঁটের আকৃতি লক্ষ করুন)।

৫.৬.৪ ব্যঞ্জনধ্বনি আর ব্যঞ্জনবর্ণ

তার তালিকা এই—	**উচ্চারিত ব্যঞ্জন ধ্বনি**	**লেখার ব্যঞ্জনবর্ণ**
	ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্	ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্
	চ্ ছ্ জ্ ঝ্	চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঞ্
	ট্ ঠ্ ড্ ঢ্	ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ণ্
	ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্	ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্
	প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্	প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্
	র্ ল্ শ্ (স্)	য্ র্ ল্ ব্ শ্
	হ্ ড়্ ঢ়্	ষ্ স্ হ্ ড়্ ঢ়্
		য়্ ৎ ং ঃ ঁ

বর্ণমালার বাকি ব্যঞ্জনগুলির কপাল এইরকম—ঞ্ আমরা উচ্চারণ করতে পারি না। ঞ্ (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে)

আর ণ্ (প্রায় সবসময়) দুই-ই আমরা ন্-এর মতো উচ্চারণ করি। য্-এর উচ্চারণ হয়ে গেছে জ্-এর মত। য্-এর উচ্চারণ ভুলে গেছি। ং-এর উচ্চারণ করি ঙ্-এর মতো। চন্দ্রবিন্দু আসলে অনুনাসিক বা 'নাকা' হয়ে যায়। তা স্বরধ্বনির সঙ্গে করি অর্থাৎ স্বরধ্বনিটাই 'নাকা' হয়ে যায়। যখন বলি 'চাঁদ' তখন আসলে আ-তে নাকা আওয়াজ হচ্ছে। বলি বটে 'চ' এ চন্দ্রবিন্দু, কিন্তু সেটা লেখার বর্ণনা, উচ্চারণের ঠিক রিপোর্ট নয়।

তাহলে যদি আবার প্রশ্ন করি, ধ্বনি ক-টা আর কী কী, তার উত্তর হল—

স্বর ঃ সাতটা; এ সাতটাই 'নাকা' (= অনুনাসিক) হতে পারে

অর্ধস্বর ঃ চারটে

ব্যঞ্জন ঃ তিরিশটার মতো।

তিরিশটার মতো কেন? নাস্ (ইংরেজি S-এর মতো) আসলে শ্-এরই আরেকটা রূপ, না আলাদা ধ্বনি তা নিয়ে একটু তর্ক আছে। আমাদের মতে শ্-এরই অন্যরকম উচ্চারণে তৈরি হয় 'সামবাজারের সসিবাবুর'স। তবে, মস্ত বস্তি সস্তা শব্দে যে যুক্তধ্বনি রয়েছে (স্ত), তার স্-এর উচ্চরণ শ্ থেকে একটু আলাদা।

৫.৬.৫ ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ

ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে প্রধান ভূমিকা জিভ আর ঠোঁটের। কণ্ঠনালির স্বরপল্লবের কম্পনে যে ধ্বনির সৃষ্টি হল, তা স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে বিনা বাধায় প্রকাশিত হয় এবং স্বরধ্বনিই আমরা স্পষ্টভাবে শুনতে পাই। কিন্তু ব্যঞ্জনের উচ্চরণ এই ধ্বনির নির্গমে বাধা ঘটিয়ে করতে হয়। জিভের দ্বারা মুখের ছাদে অর্থাৎ তালুতে নানা জায়গা ছুঁয়ে কিংবা ঠোঁটদুটি বন্ধ করে ধ্বনিবাহী বহির্গামী বাতাসের পথ রুদ্ধ বা সংকীর্ণ করে ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ ঘটাতে হয়। মনে রাখবেন, ব্যঞ্জনের উচ্চারণ আসলে স্বরের উচ্চারণে বাধা ঘটিয়ে হয়। বেশিরভাগ ব্যঞ্জনের উচ্চারণ নিঃশব্দ তা আমরা শুনতে পাই না, তার ব্যঞ্জনা বা আভাষ পাই মাত্র। সেইজন্যই হয়তো এর নাম ব্যঞ্জন।

চলিত বাংলাভাষার তিরিশটি ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণকালে বাগ্‌যন্ত্রের কোন্ অংশ কী কাজ করে তা লক্ষ্য করুন—

ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ	ঃ	জিভের পিছনটা একটু উঁচু হয়ে আলজিভের গোড়ার কাছাকাছি নরম তালু ছুঁয়ে ফেলে।
চ্ ছ্ জ্ ঝ্ শ্	ঃ	জিভের সামনের অংশটা তালুর সামনের শক্ত অংশ ছুঁয়ে থাকে।
ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ র্ ড়্ ঢ়্	ঃ	জিভের ডগা উলটে গিয়ে তালুর উপরের অংশে ঘা দেয়।
ত্ থ দ্ ধ্ ন্ স্	ঃ	জিভের ডগা উপরের পাটির মাঝামাঝি দাঁতের ঠিক উপরের মাড়িতে লগ্ন হয়ে থাকে।
প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্	ঃ	ঠোটদুটি পুরোপুরি অথবা প্রায় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।
ল্	ঃ	জিভের ডগা কখনো উপরে পাটির মাঝামাঝি দাঁতের ঠিক ওপরের মাড়িতে আটকে থাকে ('আলতা'-র ল্), আবার কখনো জিভের ডগা উলটে গিয়ে তালুর উপরের অংশে ঘা দেয় ('উল্টা'-র ল্)।
হ্	ঃ	ফুসফুস থেকে শ্বাসনালির পথে বাতাস যখন ধ্বনি বয়ে নিয়ে মুখের ভিতরের দিকে আসতে থাকে শ্বাসনালিতে একটু চাপ পড়ে।

৫.৭ সারাংশ—২

বাংলায় স্বরবর্ণ এগারোটি, কিন্তু স্বরধ্বনি মাত্র সাতটি। এছাড়া অর্ধস্বর চারটি এবং দ্বিস্বর সতেরোটি। জিভের ওঠা-নামা এগোনো-পিছানো এবং ঠোঁটের সংকোচন প্রসারণের সাহায্যে। এইসব স্বরধ্বনির উচ্চারণ হয়। অন্যদিকে, ব্যাঞ্জনবর্ণ বাংলায় চল্লিশটি লেখা হলেও ব্যঞ্জনধ্বনি মাত্র তিরিশটি। ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণেও আসল কাজটা করে জিভ আর ঠোঁট। জিভের কোনো অংশ কখনো কখনো তালুর কোনো অংশ ছুঁয়ে, কখনো দাঁদের উপরের মাড়িতে লগ্ন থেকে অথবা ঠোঁট্‌দুটি কখনো পুরোপুরি বন্ধ থেকে এইসব ধ্বনির উচ্চারণ ঘটায়।

৫.৮ অনুশীলনী—২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে পৃষ্ঠা ৫৯-এর উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১। (ক) বাংলাভাষার স্বরধ্বনি রয়েছে
(১) ১৩টি
(২) ১০টি
(৩) ৭টি
(৪) ৫টি

(খ) বাংলাভাষার ব্যঞ্জনধ্বনি রয়েছে
(১) ৪০টি
(২) ৩০টি
(৩) ৩৬টি
(৪) ১২টি

২। নীচে অর্ধস্বরধ্বনি দ্বিস্বরধ্বনি মেশোনো আছে। কোনটি অর্ধস্বরধ্বনি আর কোনটি দ্বিস্বরধ্বনি, লিখুন—

এও্‌ ই্‌ এই্‌ ও্‌ আউ্‌ উ্‌ অএ্‌ এ্‌

৩। কোন্‌ ধ্বনির উচ্চারণ হয় লিখুন —

(ক) যখন, জিভের পিছনটা বেশ উপরে উঠে আসে এবং জিভটাও পিছিয়ে যায়। মুখ গোল থাকে, কিন্তু তার পথটা বেশ সরু দেখায়।

(খ) যখন, জিভের ডগা উলটে গিয়ে তালুর উপরের অংশে ঘা দেয়।

(গ) যখন, ঠোঁটদুটি হয় পুরোপুরি না-হয় প্রায়-পুরোটাই বন্ধ করতে হয়।

৫.৯ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

ভাষার ইতিবৃত্ত ঃ সুকুমার সেন

সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ ঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বাংলাভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিহাস ঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

ভাষাজিজ্ঞাসা ঃ পবিত্র সরকার

৫.১০ উত্তর-সংকেত

অনুশীলনী - ১

১। (ক) ফুসফুস, স্বরপল্লব, আলজিভ, অধিজিহ্বা, তালু, জিভ, দাঁত, ঠোঁট।

(খ) স্বরধ্বনি উচ্চরণের সময় জিভ মুখের ভিতরে উপরে ওঠে, নীচে নামে, সামনে যায় এবং পিছনে আসে। ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চরণের সময় জিভের কোনো অংশ তালুর কোনো অংশ ছুঁয়ে থাকে বা তালুর কোনো অংশে ঘা দেয় বা দাঁতের উপরের মাড়িতে লগ্ন হয়ে থাকে।

(গ) জিভের ওঠা-নামা এগোনো-পিছোনো, তালুর সংকোচন, ঠোঁটের ছড়ানো-কুঁচকানো-খুলে যাওয়া-বন্ধ হওয়া, চোয়ালের ওঠা-নামা—এইসব নাড়াচড়ায় মুখের মাংসপেশিই সাহায্য করে এবং তার ফলেই ধ্বনির উচ্চারণ সম্ভব হয়।

২। (ক) ধ্বনি হল উচ্চারণের বস্তু, আর বর্ণ হল লেখার চিহ্ন। ধ্বনি মুখে বলি কানে শুনি, বর্ণ কাগজে লিখি চোখে দেখি।

(খ) বর্ণকে আমরা অনেক সময় ভুল করে অক্ষর বলি। যে-ধ্বনি উচ্চারণ করি তা যখন লিখে বোঝাতে চাই, তখনই তা বর্ণ হয়ে ওঠে। আর, এক ঝোঁকে বা একবারে যে-কটা ধ্বনি একসঙ্গে উচ্চারণ করে ফেলি, তাই হয়ে ওঠে অক্ষর। ব ক আলাদাভাবে যখন লিখি, তখন এরা এক-একটি বর্ণ। 'বক' যখন একসঙ্গে উচ্চারণ করে ফেলি, তখন এটি একটি অক্ষর।

(গ) এগুলি লেখা হয়ে গেছে, অতএব এগুলি বর্ণ।

৩। (ক) ধ্বনি, (খ) বর্ণ, (গ) অক্ষর।

অনুশীলনী-২

১। (ক) ৭ টি, (খ) ৩০টি

২। ই্ ও্ উ্ এ্ — অর্ধস্বরধ্বনি।

এও্ এই্ আউ্ অএ — দ্বিস্বরধ্বনি।

৩। (ক) উ, (খ) ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ র্ ড়্ ঢ়্, (গ) প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্

(হিত্-অ-এষী = হিত্-ঐ-ষী

একক ৬ ❑ বাংলা ভাষার উদ্ভব, সাধুভাষা ও চলিত ভাষা এবং বাক্য ও বাক্যাংশ সংকোচন

গঠন

৬.১ উদ্দেশ্য

৬.২ প্রস্তাবনা

৬.৩ মূলপাঠ-১ : বাংলা ভাষার উদ্ভব

৬.৪ সারাংশ-১

৬.৫ অনুশীলনী-১

৬.৬ মূলপাঠ-২ : সাধুভাষা ও চলিত ভাষা

৬.৭ সারাংশ-২

৬.৮ অনুশীলনী-২

৬.৯ মূলপাঠ-৩ : বাক্যাংশ সংকোচন

৬.১০ অনুশীলনী-৩

৬.১১ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

৬.১২ উত্তর-সংকেত

৬.১৩ অতিরিক্ত অনুশীলনী

৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি

- ভারতবর্ষের বিভিন্ন গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষাগোষ্ঠীতে বাংলার স্থান এবং ইতিহাস সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- কথ্য ভাষার সঙ্গে লিখিত ভাষার পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- সর্বজনগ্রাহ্য লিখিত বাংলা যা শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তার ব্যবহার করতে পারবেন।

৬.২ প্রস্তাবনা

আলোচ্য পাঠ্যটিতে কী করে বাংলা ভাষার উদ্ভব হল তা বর্ণনা করা হয়েছে। এই এককটিতে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠী সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা এবং ভারতীয় আর্য ভাষা গোষ্ঠীর

(যা থেকে বাংলাসহ অনেক আধুনিক আর্য ভাষা সৃষ্টি হয়েছে।) ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে কীভাবে বাংলা ভাষার উদ্ভব হল তা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে 'সাধু ভাষা' ও 'চলিত ভাষা' সম্পর্কে মোটামোটি বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অংশে পাবেন একাধিক পদ নিয়ে তৈরি ব্যাক্যাংশকে একটি পদে সংকুচিত করার কিছু উদাহরণ।

৬.৩ মূল পাঠ-১ ঃ বাংলাভাষার উদ্ভব

উপভাষাগুলিকে বাদ দিলে সারা পৃথিবীতে প্রায় হাজার তিনেক ভাষা প্রায় তিনশো কোটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। ভাষাবিজ্ঞানীরা প্রায় তিন হাজার ভাষাকে আনুমানিক ২৫/২৬টি পরিবারে ভাগ করে থাকেন। এগুলি হল—

১. ইন্দো-ইউরোপীয়
২. সেমীয়-হামীয়
৩. যুরালীয় বা ফিন্নো-উগ্রীয়
৪. আলতাইক
৫. জাপানি ও কোরীয়
৬. এস্কিমো
৭. ককেশীয়
৮. আইবেরীয় বাস্ক্
৯. এশীয় বা প্রায়-প্রাচ্য
১০. হাইপারবোরীয় বা প্রাচীন এশীয়
১১. বুরুশাসকি
১২. দ্রাবিড়
১৩. আন্দামানি
১৪. চিনা-তিব্বতীয় বা ভোট-চীনীয়
১৫. লা-তি
১৬. অস্ট্রো-এশীয়
১৭. মালয়ি-পলিনেশীয়
১৮. প্যাপুয়ান
১৯. অস্ট্রেলীয়
২০. তাসমানীয়
২১. সুদানি-গিনীয়
২২. বান্টু
২৩. হটেনটট-বুশমান

২৪. উত্তর আমেরিকা দেশীয়

২৫. মধ্য-আমেরিকা দেশীয় বা মেক্সীয়

২৬. দক্ষিণ আমেরিকা দেশীয়

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষাগুলি হল—

১. গ্রিক

২. ইতালিক

৩. জার্মানিক বা টিউটোনিক'

৪. কেলতিক

৫. হিট্টাইট বা হিট্টী

৬. তুখরীয়

৭. আর্মেনীয়

৮. আলবনীয়

৯. বালতোস্লাবিক

১০. ইন্দো-ইরানীয় বা আর্য

খ্রিস্ট জন্মাবার প্রায় দু হাজর বছর আগে এই ইন্দো-ইরানীয় বা আর্যভাষা প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়—

(ক) ভারতীয় আর্য

(খ) ইরানীয় আর্য

প্রায় দেড় হাজার খ্রিস্ট পূর্বাব্দে এই আর্যভাষা প্রবেশ করে। আর্যদের প্রবেশের আগে অবশ্য ভারতবর্ষে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা, অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা প্রচলিত ছিল। এছাড়া ভারতবর্ষে ভোটবর্মী ভাষার প্রচলন ছিল।

ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হিসাবে বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্য পাওয়া যায়। বৈদিক প্রাকৃত বা কথ্য প্রাকৃত নামক ভাষার নিদর্শনও মেলে।

ভারতীয় আর্যভাষার এই স্তরটিকে বলা হয় প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা। এর পরবর্তী স্তর হল মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষা।

মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষার আনুমানিক স্থিতিকাল খ্রিস্টপূর্ব ছশো অব্দ থেকে আজার খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির জন্ম হয়েছে এই হাজার খ্রিস্টাব্দ থেকে। হিন্দি বাংলা উড়িয়া অসমিয়া মৈথিলি ভোজপুরি প্রভৃতি ভাষা বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রাকৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। পূর্বী প্রাকৃত থেকে এসেছে বাংলা ওড়িয়া অসমিয়া প্রভৃতি ভাষা। প্রথমে পূর্বী প্রাকৃত থেকে ওড়িয়া ভাষা এবং বঙ্গ-অসমিয়া ভাষা পৃথক হয়। অর্থাৎ উপভাষা থেকে ভাষার মর্যাদা লাভ করে। পরে বঙ্গ-অসমিয়ার দুটি উপভাষা বাংলা ও অসমিয়া এই দুটি ভাষার মর্যাদা লাভ করে। বাংলা ভাষার প্রথম নিদর্শন চর্যাপদ। হাজার বছর ধরে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা আধুনিক বাংলা ভাষার রূপ গ্রহণ করেছে।

৬.৪ সারাংশ - ১

পৃথিবীর ভাষাগুলিকে ২৫/২৬টি পরিবারে বিভক্ত করা যায়। এর অন্যতম হল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা। এর দশটি শাখার অন্যতম হল ইন্দো-ইরানীয় বা আর্যশাখা। আর্যশাখার একটি ভাগ ভারতীয় আর্য। এই ভারতীয় আর্যভাষা গোষ্ঠীর লোক ভারতে প্রায় ১৫০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দে প্রথম আসতে শুরু করে।

ভারতীয় আর্যভাষাকে কাল অনুযায়ী তিনভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা— বৈদিক এবং সংস্কৃত এই দুটি ভাষা এই যুগের প্রতিনিধি। আনুমানিক সময় খ্রিঃ পূর্ব ১৫০০ থেকে খ্রিঃ পূর্ব ৬০০ পর্যন্ত। তারপর এল মধ্যভারতীয় আর্যভাষা, আনুমানিক ৬০০ খ্রিঃ পূর্ব থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তারপর এল আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা, আনুমানিক ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে যার সৃষ্টি। প্রাচীন বাংলার উদাহরণ পাওয়া যায় চর্যাপদের ভাষায়। এ-থেকেই ক্রমে ক্রমে আধুনিক বাংলাভাষার জন্ম হয়েছে।

৬.৫ অনুশীলনী-১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হলে ৭৫ পাতার উত্তর-সংকেত এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। সঠিক উত্তরটি বেছে নিন।

(ক) ভারতীয় আর্যভাষার অন্তর্গত ভাষা হল

(১) দ্রাবিড়
(২) এস্কিমো
(৩) আলতাইক
(৪) সংস্কৃত

(ঘ) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষা হল

(১) এস্কিমো
(২) আন্দামানি
(৩) লা-তি
(৪) গ্রিক

৬.৬ মূল পাঠ-২ ঃ বাংলা সাধুভাষা ও চলিতভাষা

আমর মুখে যে বাংলা বলি তার নাম কথ্যভাষা, আর লেখায় যে বাংলা লিখি তার নাম লেখ্যভাষা। এই লেখ্য ভাষারই একটি রূপ সাহিত্যিক ভাষা, কেননা সব সাহিত্য এখন লেখাই হয়। সাহিত্য লেখার আবার দুটি রীতি- গত্য আর পদ্য। গত্যরীতির আছে দু-রকমের ভাষা — সাধু ও চলিত। পদ্যরীতির ভাষা অবশ্য মিশ্রভাষা — সাধু-চলিতে মেশানো। নীচের ছকটি দেখলে এই ভাগগুলি বোঝা যাবে।

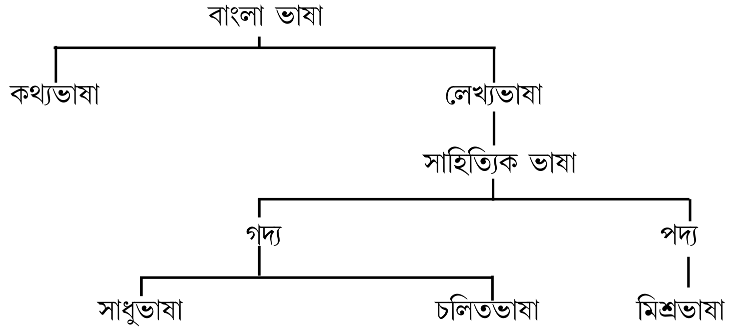

উনিশ শতকের গোড়াতেই ছাপার কাজ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি এবং আধুনিক যুগের শুরু। এর আগে প্রাচীন বাংলা ও মধ্যবাংলার সাহিত্য পদ্য সাহিত্য। যদিও উনিশ শতকের গোড়াতেই গদ্য সাহিত্য শুরু কিন্তু এই গদ্যের মৌখিক রূপ সম্ভবত সতেরো শতক থেকে শুরু হয়েছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলার শিক্ষকরা প্রথম গদ্য সাহিত্য শুরু করেন, যদিও এই রচনা অনেকটা কৃত্রিম ছিল। এর পরে বিদ্যাসাগরের হাতেই বাংলা গদ্য প্রথম প্রকৃত সাহিত্যের ভাষার মর্যাদা পেল।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা সারা দেশের রাজনৈতিক, শিক্ষা সংস্কৃতির পীঠস্থানরূপে পরিগণিত হওয়ায় কলকাতা অঞ্চলের বাংলাই আজকের কথ্যভাষার সর্বজনগ্রাহ্য রূপ বলে স্বীকৃত হয়। এর সাহিত্যিক নির্দশন ১৮৬২ সালে প্রকাশিত কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘হুতোম প্যাঁচার নকশায়’ পাওয়া যায়। কিন্তু এই ভাষার বিশেষ সাহিত্যিক মর্যাদা ছিল না। বাংলা সাহিত্য রচিত হয়েছে প্রধানত ‘সাধুভাষায়’। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে ওই যুগের সব প্রখ্যাত সাহিত্যিকই রচনা করেছেন ‘সাধুভাষায়’। রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে কিছু লেখা চলিত ভাষায় লেখেন। চলিত ভাষায় সাহিত্য রচনার পথিকৃৎ প্রমথ চৌধুরী। সেই সময় থেকে কিছু কিছু চলিত ভাষায় রচনা শুরু হলেও ‘সাধুভাষার’ সাহিত্যের পরিমাণের তুলনায় তা ছিল একেবারেই নগণ্য। ব্যাপকভাবে, চলিতভাষায় সাহিত্য রচনা শুরু হয় বিশ শতকের শেষার্ধে। মোটামুটি আজকাল সাহিত্যের মাধ্যমে এই ‘চলিতভাষা’ কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’ দিয়ে যার যাত্রা শুরু, তা সর্বজনীন সাহিত্যের মাধ্যম হতে লাগল প্রায় একশো বছর।

‘সাধুভাষা’ ও ‘চলিত ভাষা’র পার্থক্য দেখা যায় প্রধানত ক্রিয়াপদে সর্বনামে ও অনুসর্গে। নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

	সাধু ভাষা	**চলিত ভাষা**
(ক) ক্রিয়াপদ	করিয়া	করে
	খাইলে	খেলে
	করিতে	করতে
	যাইতেছিল	যাচ্ছিল

(খ) সর্বনাম	তাহাকে	তাকে
	যাকে	যা
	ইহা	এ
	উহা	ও
(গ) অনুসর্গ	কর্তৃক, দিয়া	দ্বারা, দিয়ে
	মধ্য	মধ্যে
	হইতে	হতে, থেকে

এ ছাড়া ‘শব্দ’ নির্বাচনে পার্থক্য রয়েছে। সংস্কৃত শব্দের বেশি প্রচলন দেখা যায় ‘সাধু ভাষায়’, তবে ‘চলিত ভাষাতে’ ও সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার লেখকের লিখন-শৈলী এবং লেখার বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে। কাজে কাজেই ‘সাধুভাষা’ ও ‘চলিতভাষার’ পার্থক্য মূলত ‘ক্রিয়াপদ’ সর্বনাম’ ও ‘অনুসর্গেই’ দেখা যায়।

এবার সাধুভাষার নমুনা দেখুন।

সাধুভাষার নমুনা ঃ

উত্তরচরিতের উপাখ্যানভাগ রামায়ণ (হইতে) গৃহীত। [ইহাতে] রাম (কর্তৃক) সীতার প্রত্যাখ্যান ও তৎসঙ্গে পুনর্ম্মিলন বর্ণিত **হইয়াছে**। স্থূল বৃত্তান্ত রামায়ণ (হইতে) গৃহীত বটে, কিন্তু অনেক বিষয় ভবভূতির স্বকপোলকল্পিত। রামায়ণে যেরূপ বাল্মীকির আশ্রমের সীতার বাস, এবং যেরূপ ঘটনার পুনর্ম্মিলন, এবং মিলনান্তেই সীতার ভূতল প্রবেশ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে, উত্তরচরিতে সে সকল সেরূপ বর্ণিত **হয় নাই**। উত্তরচরিতে সীতার রসাতল বাস, লবের যুদ্ধ এবং তদন্তে সীতার সহিত রামের পুনর্ম্মিলন ইত্যাদি বর্ণিত **হইয়াছে**। এইরূপ ভিন্ন পন্থায় গমন করিয়া, ভবভূতি রসজ্ঞতার এবং আত্মশক্তিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। কেন না, [যাহা] একবার বাল্মীকি (কর্তৃক) বর্ণিত **হইয়াছে**, পৃথিবীর কোন কবি [তাহা] প্রশংসাভাজন হইতে পরেন? যেমন ভবভূতি এই উত্তরচরিতের উপাখ্যান অন্য কবির গ্রন্থ (হইতে) গ্রহণ **করিয়াছেন**, তেমনি সেক্সপীয়র [তাঁহার] রচিত প্রায় সকল নাটকের উপাখ্যান ভাগ অন্য গ্রন্থকারের গ্রন্থ (হইতে) গ্রহণ **করিয়াছেন** কিন্তু তিনি ভবভূতির ন্যায় পূর্বকবিগণ (হইতে) ভিন্ন পথে গমন **করেন নাই**। (বঙ্কিমচন্দ্র ঃ উত্তরচরিত ঃ বিবিধ প্রবন্ধ)

মোটা হরফের পদগুলি ক্রিয়া, ( ) বন্ধনী যুক্ত পদগুলি অনুসর্গ এবং [ ] বন্ধনী যুক্ত পদগুলি সর্বনাম। সাধুভাষার সঙ্গে চলিত ভাষার পার্থক্য মূলত এই পদগুলিতে। এখন উদাহরণ হিসেবে নীচে সাধুভাষা ও চলিতভাষার পার্থক্য উপরের অনুচ্ছেদ অবলম্বন করে দেওয়া হল।

	সাধু ভাষা	**চলিত ভাষা**
ক্রিয়াপদ	হইয়াছে	হয়েছে
	হয় নাই	হয়নি
	হইতে	হতে
	করিয়া	করে

	করিয়াছেন	করেছেন
	করেন নাই	করেননি
অনুসর্গ	হইতে	হতে, থেকে
	কর্তৃক	দ্বারা
সর্বনাম	ইহাতে	এতে
	যাহা	যা
	তাহা	তা
	তাঁহার	তাঁর

আগেই বলা হয়েছে, শব্দ নির্বাচনে 'সাধু ভাষা' ও চলিত ভাষায়' পার্থক্য দেখা যায়; কিন্তু শব্দ নির্বাচনে চলিত ভাষায় এত কড়াকড়ি নেই, যেমন রয়েছে ক্রিয়াপদ অনুসর্গে ও সর্বনাম নির্বাচনে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় 'সংগ্রহ' এই শব্দটি সাধুতে চলে, এর চলিত রূপ 'জোগাড়'। কিন্তু 'চলিত ভাষায়' 'জোগাড়' এবং 'সংগ্রহ' দুই চলতে পারে। অথচ সাধুতে কেবলমাত্র 'সংগ্রহ'ই চলে, 'জোগাড়' চলে না একটি উদাহরণ দেখুন ঃ

চলিত (১) অনেক কষ্টে আমি বইটা জোগাড় করেছি।

(২) অনেক কষ্টে আমি বইটা সংগ্রহ করেছি।

এবার চলিত ভাষার কয়েকটি নমুনা দেখুন ঃ

(ক) ''অন্ততপক্ষে আমি অবিলম্বে বুঝেছিলুম যে শ্রেণীসংঘর্ষে স্বতঃসিদ্ধি একবার জানলে ভাববিলাসই শ্রমিক জগতে আমার একমাত্র প্রবেশ পথ, এবং সেইজন্যে আমি সর্বদা জানতে চাইতুম সাম্যবাদে অবনতের উন্নতি যেমন অবশ্যম্ভাবী, উন্নতের অবনতিও তেমনি অনিবার্য কিনা''। (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ কুলায় ও কালপুরুষ ঃ মুখবন্ধ) এখানে দেখুন ''ক্রিয়া পদ'' ছাড়া আর সবই সাধুভাষার মতো। বিশেষ করে 'তৎসম' শব্দের ব্যবহারে। কাজে কাজেই 'সাধু ভাষা' ও 'চলিত ভাষা'-র মধ্যে পার্থক্য রয়েছে কেবলমাত্র 'ক্রিয়াপদে সর্বনামে এবং অনুসর্গে। তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের ব্যবহার লেখকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। সুধীন্দ্রনাথ দত্তর লেখায় প্রচুর অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের সমাহার দেখা যায়।

(খ) ''আসল কথা আমি ঘরকুনো, আমি গুছিয়ে বসতে ভালোবাসি, শিকড় গজাতে ভালোবাসি, অনেকদিন বাস করবার ফলে যে ঘরটি আমার ব্যক্তিত্বে একবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, তার বাইরে বেশিক্ষণ মন টেকে না আমার। বাঁধা ধরা কতগুলো অভ্যাসের দৈনন্দিন দাসত্বে আমার তৃপ্তি। কখনো কোনো কারণে তার একটু বিচ্যুতি হলেও আমার অস্বস্তি লাগে।'' (বুদ্ধদেব বসু ঃ 'পুরোনো পল্টন)

বুদ্ধদেব বসুর এই লেখাও 'চলিত ভাষায়' লেখা। অনেকটা মুখের ভাষার কাছাকাছি। কিন্তু লেখার মধ্যে রয়েছে সংস্কৃত শব্দ 'ব্যক্তিত্ব' 'আচ্ছন্ন' 'দাসত্ব' 'তৃপ্তি' 'বিচ্যুতি' 'দৈনন্দিন' ইত্যাদি। এই শব্দগুলি আমরা কথা বলার সময়ে ব্যবহার করি না। তবুও লেখার ঢং অনেকটা কথা বলার মতো।

(গ) ''আমার বুকটা ধুক পুক করে উঠল। কিন্তু ভদ্রলোক আমার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই বললেন—'কেন থাকুক না—কোন ক্ষতি নেই।' 'তারপর ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন ইয়ে—'আপনারা কিছু খাবেন-টাবেন?

চা বা কফি?’

(সত্যজিৎ রায় ঃ শেয়ালদেবতা রহস্য ঃ আরো এক ডজন)

সত্যজিৎ রায়ের এই লেখাটি পড়লে মনে হবে যেন কথা শুনছি। এখানে মুখের ভাষা আর লেখার ভাষার মধ্যে কোনো পার্থক্যই প্রায় নেই। এও ‘চলিত ভাষা’।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ‘চলিত ভাষা’ মানেই মুখের ভাষা নয়। মনে হতে পারে কথ্যভাষার লেখারূপই বুঝি চলিত ভাষা, আসলে তা কিন্তু নয়। উপরের উদাহরণগুলি থেকেই তা প্রমাণিত হয়। সত্যজিৎ রায়ের লেখাটি ছেড়ে দিলে বুদ্ধদেব বসু এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তর লেখার যে নমুনা, তাকে কখনও কথ্যভাষা বলা যাবে না। আবার বুদ্ধদেব বসুর লেখা কথ্যভাষার কাছাকাছি, সুধীন্দ্রনাথ দত্তর লেখা কথ্যভাষা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। আপনারা বিভিন্ন লেখকের লেখা যখন পড়বেন তখন তাঁদের লেখার সঙ্গে কথ্যভাষার পার্থক্য যদি থাকে, তা লক্ষ করবেন।

৬.৭ সারাংশ-২

আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি উনিশ শতকের গোড়ায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর। বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলা গদ্য সাহিত্যের বাহন ছিল প্রধানত “সাধু ভাষা”। আজকাল চলিত ভাষাতেই সাহিত্য রচিত হচ্ছে। এবং সব রকম কাজকর্ম চলছে চলিত ভাষাতেই। কলকাতা অঞ্চলের মুখের ভাষাই উনিশ শতক থেকে সর্বজনগ্রাহ্য চলিত ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং পরে তা সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

৬.৮ অনুশীলনী-২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন ৭৫ পৃষ্ঠার উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. সঠিক উত্তরটি বেছে নিন—

(ক) সাধুভাষার সঙ্গে চলিতভাষার পার্থক্য প্রধানত
(১) বিশেষণ পদের প্রয়োগে
(২) বিশেষ্য ও নির্দেশকের ক্ষেত্রে
(৩) ক্রিয়া সর্বনাম ও অনুসর্গে

(খ) চলিতভাষা মূলত
(১) কথ্যভাষার একটি শাখা
(২) গদ্যরীতির একটি শাখা
(৩) মিশ্রভাষার একটি শাখা

২. সাধুভাষা না চলিত ভাষা লিখুন —

(ক) আজ ছুটির দিনে বারান্দার সেই কোনটায় বসে তোমাকে লিখছি।

(খ) রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ন আমি কস্মিনকালে বিস্মৃত হইতে পারিব না।

(গ) যাদের অবজ্ঞা করি তাদের আলগা করে রাখি।

(ঘ) মনের জানলা যখন সব বন্ধ হয়ে যায়, মন হয় বন্দী।

(ঙ) ইহা হইতেই আমাদের প্রয়োজন বুঝা যাইবে।

৩. ২নং প্রশ্নের বাক্যগুলি সাধুভাষা থেকে চলিতভাষার অথবা চলিতভাষা থেকে সাধুভাষায় পরিবর্তন করে লিখুন।

৬.৯ মূলপাঠ-৩ ঃ বাক্যাংশ সংকোচন

মনের কোনো ভাবকে একাধিক পদে প্রকাশ না করে প্রয়োজন মতো একটি শব্দে প্রকাশ করা যায়। একাধিক পদকে একটি শব্দে প্রকাশ করার নাম বাক্যাংশ সংকোচন। কৃৎ প্রত্যয় তদ্ধিত প্রত্যয় এবং সমাসের সাহায্যে বাক্যাংশ সংকোচন করা হয়। নীচে এই ধরনের কিছু সংকোচনের উদাহরণ দেওয়া হল।

যা দেখা যায় না — অদৃশ্য।

যা বলা হয়েয়ে — উক্ত।

যেখানে যাওয়া যায় না — অগম্য।

যা পোড়ে না — অদাহ্য।

যা সাধন করা যায় না — অসাধ্য।

যা অতিক্রম করা যায় না — অনতিক্রমণীয়।

যিনি আগে জন্মগ্রহণ করেছেন — অগ্রজ।

যার অন্তিমকাল উপস্থিত — মুমূর্ষু।

যা আগে কোনোদিন শোনা যায়নি — অশ্রুতপূর্ব।

যা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না — অনির্বচনীয়।

যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে না — কৃতঘ্ন।

অনুসন্ধান করবার ইচ্ছা — অনুসন্ধিৎসা

হত্যা করার ইচ্ছা — জিঘাংসা।

যার ভিতরে সার বস্তু কিছুই নেই — অকৃতদার।

যে পুরুষ বিয়ে করেনি — অকৃতদার।

যা অবশ্যই হবে — অবশ্যম্ভাবী।

যা বলা যায় না — অকথ্য।

যা চিবিয়ে খেতে হয় — লেহ্য।

যা পান করা হয় — পেয়।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত — আপাদমস্তক।

যা সহজেই ভেঙে যায় — ভঙ্গুর
যা দিনে দিনে বাড়ে — বর্ধিষ্ণু।
যে নারীর পতিও নেই ছেলেও নেই — অবীরা।
অনুকরণ করবার ইচ্ছা — অণুচিকীর্ষা।
যিনি ব্যাকরণ জানেন — বৈয়াকরণ।
যিনি নিজেকে পণ্ডিত মনে করেন — পণ্ডিতম্মন্য।
যে নারী কখনও সূর্যের মুখ দেখেনি — অসূর্যম্পশ্যা।
যার মৃত্যু নেই — অমর।
দিনের শেষ ভাগ — অপরাহ্ন।
হরিণের চামড়া — অজিন।
যা চিন্তা করা যায় না — অচিন্তনীয়।
যা কল্পনা করা যায় না — অকল্পনীয়।
যার এখনো দাড়ি গোঁফ গজায়নি — অজাতশ্মশ্রু।
যে শত্রুকে দমন করেছে — অরিন্দম।
যিনি প্রবাসে থাকেন — প্রবাসী।
যা উড়ে যাচ্ছে — উড়ন্ত।
সমুদ্র থেকে হিমাচল পর্যন্ত — আসমুদ্রহিমাচল।
ঈশ্বরে যার বিশ্বাস আছে — আস্তিক।
ইন্দ্রকে যিনি জয় করেছেন — ইন্দ্রজিৎ।
জল ও স্থল উভয় জায়গায় যে চলে — উভচর।
যা মাটি ভেদ করে উপরে উঠে — উদ্ভিদ।
এক থেকে আরম্ভ করে — একাদিক্রমে।
যিনি দিনে একবার আহার করেন — একাহারী।
যিনি ইতিহাস লেখেন — ঐতিহাসিক।
যে ফল পাকালেই গাছ মরে যায় — ওষধি।
জানবার ইচ্ছা — জিজ্ঞাসা।
যারা ঝগড়া করছে — বিবদমান।
যা বার বার দুলছে — দোদুল্যমান।
যার স্ত্রী মারা গেছেন — বিপত্নীক।

যার কাজ করবার ক্ষমতা নেই — অকর্মণ্য।

পাখির কলরব — কাকলি।

ময়ূরের ডাক — কেকা।

যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে — কৃতজ্ঞ।

কী করবে, কী না করবে বুঝতে না পারা — কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

সবার চেয়ে বয়সে ছোটো — কনিষ্ঠ।

দিনের আলো ও রাত্রির অন্ধকারের সন্ধিক্ষণ — গোধূলি।

যা যুক্তিসংগত নয় — অযৌক্তিক।

যিনি একবার মাত্র সন্তান প্রসব করেছেন — কাকবন্ধ্যা।

যা কোনো কাজের নয় — অকেজো।

বনে থাকে যে — বন্য।

রেশম দিয়ে তৈরি — রেশমি।

যিনি দর্শন শাস্ত্র জানেন — দার্শনিক।

যা অল্প সময়েই ভেঙে যায় — ক্ষণভঙ্গুর।

শুভক্ষণে যাঁর জন্ম — ক্ষণজন্ম।

চিরকাল মনে রাখবার যোগ্য — চিরস্মরণীয়।

যা চিরকাল মনে রাখবার যোগ্য — চিরন্তন।

যিনি ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন — জিতেন্দ্রিয়।

যার আগের জন্মের কথা স্মরণ আছে — জাতিস্মর।

বীণার ধ্বনি — ঝংকার।

ধনুকের শব্দ — টংকার।

পুরুষের উদ্দাম নৃত্য — তাণ্ডব।

যিনি তির নিক্ষেপে ওস্তাদ — তিরন্দাজ।

যিনি শ্রদ্ধার যোগ্য — শ্রদ্ধেয়।

যা সহজে সাধন করা যায় না — দুঃসাধ্য।

দূরের ঘটনাও যিনি দেখতে পান — দূরদর্শী।

যাঁর দেশের প্রতি প্রীতি আছে — দেশপ্রেমিক।

যা ভস্ম করা হয়েছে — ভস্মীভূত।

যিনি দুবার জন্ম নিয়েছেন — দ্বিজ।

যা একটি ধারা ধরে চলে — ধারাবাহক।

যার জন্য কর দিতে হয় না — নিষ্কর।

যার এখনো বালকত্ব কাটেনি — নাবালক।

নৌ চলাচলের যোগ্য — নাব্য।

যিনি বিজ্ঞান শাস্ত্র জানেন — বিজ্ঞানী।

যে নারীর উপমা নেই — নিরুপমা।

যা খুব দীর্ঘ নয় — নাতিদীর্ঘ।

যা খুব গরমও নয় ঠান্ডাও নয় — নাতিশীতোষ্ণ।

যিনি আমিষ খান না — নিরামিষাশী।

পূজা পাবার যোগ্য — পূজ্য।

যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে — প্রত্যুৎপন্নমতি।

যে গাছ অন্য গাছের উপর নির্ভর করে — পরগাছা।

যে পালিয়ে যাচ্ছে — পলায়মান।

যে নারী প্রিয় কথা বলে — প্রিয়ংবদা।

যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে — প্রোষিতভর্তৃকা।

যার স্ত্রী বিদেশে থাকেন — প্রোষিতভার্য।

যে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে — প্লবগ।

পথ চলার খরচ — পাথেয়।

যারা বিষ্ণুর উপাসক — বৈষ্ণব।

ভগীরথের আনীত নদী — ভাগীরথী।

যে মধু পান করে — মধুপ।

মূর্ধা যার উচ্চারণ স্থান — মূর্ধন্য।

যিনি যুদ্ধে স্থির থাকেন — যুধিষ্ঠির।

যার একবার শুনলেই মনে থাকে — শ্রুতিধর।

যিনি শুভ কামনা করেন — শুভাকাঙ্ক্ষী।

একই গুরুর শিষ্য — সতীর্থ।

যার দুই হাত সমান ভাবে চলে — সব্যসাচী।

সত্ত্বগুণ আছে যার — সাত্ত্বিক।

একই সময়কার — সমসাময়িক।

যার সব কিছুই হারিয়ে গেছে — হৃতসর্বস্ব।
যা হৃদয়ে গমন করে — হৃদয়ংগম।
নিজেকে হীন মনে করার ভাব — হীনমন্যতা।
শাস্ত্র সম্বন্ধীয় — শাস্ত্রীয়।
যা পরিশ্রমের দ্বারা করতে হয় — শ্রমসাধ্য।
জয় করিবার ইচ্ছা — জিগীষা।
যার কুল শীল জানা নেই — অজ্ঞাতকুলশীল।
অন্য ভাষায় রূপান্তরিত — ভাষান্তরিত।
যে দুজন একই সঙ্গে জন্মগ্রহণ করছে — যমজ।
যা অবশ্যই ঘটবে — অবশ্যম্ভাবী।
যে পরের মুখ চেয়ে থাকে — পরমুখাপেক্ষী।
যারা পট আঁকেন — পটুয়া।
আকাশে বিহার করে যে — বিহঙ্গ।
যে আদব কায়দা জানে না — বেআদব।
যিনি আয় বুঝে ব্যয় করেন — মিতব্যয়ী।
যা মর্ম ভেদ করে — মর্মভেদী।
যতদিন জীবন থাকবে — যাবজ্জীবন।
যারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গমন করে— যাযাবার।
যিনি শত্রুকে বধ করেন — শত্রুঘ্ন।
যে পুরুষ স্ত্রী বশীভূত — স্ত্রৈণ।
যার সব কিছুই চলে গেছে — সর্বস্বান্ত।
যে নারীর হাসি সুন্দর — শুচিস্মিতা।
যিনি সব কিছুই সহ্য করেন — সর্বংসহ।
একই মায়ের গর্ভজাত — সহোদর।
যা হৃদয়কে বিদীর্ণ করে — হৃদয় বিদারক।
যা হৃদয়কে আকর্ষণ করে — হৃদয়গ্রাহী।
যার উপাস্য দেবতা যুদ্ধ — বৌদ্ধ।
যা অনায়াসে লাভ করা যায় — অনায়াসলভ্য।
যা আগে ছিল এখন নেই — ভূতপূর্ব।

যে পরের দোষ খুঁজে বেড়ায় — ছিদ্রান্বেষী।

যে নারীর স্বামী মারা গিয়েছে — বিধবা

সারা জীবন ধরে — আজীবন

যে রাত্রে চোখে দেখে না — রাতকানা।

৬.১০ অনুশীলনী - ৩

১) নীচের বাঁদিকে দেওয়া বাক্যগুলিকে ডানদিকে দেওয়া কোন শব্দটিতে এক কথায় সঠিক ভাবে রূপান্তরিত হয়েছে (✓) চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুন —

(ক) যে আগে যায়	(১) দ্রুতগামী	☐
	(২) শ্লথগামী	☐
	(৩) মন্দগামী	☐
	(৪) অগ্রগামী	☐
(খ) যিনি আগে জন্মগ্রহণ করেছেন	(১) সরোজ	☐
	(২) অনুজ	☐
	(৩) অগ্রজ	☐
	(৪) পঙ্কজ	☐
(গ) দিনের শেষ ভাগ	(১) অপরাহ্ন	☐
	(২) মধ্যাহ্ন	☐
	(৩) সায়াহ্ন	☐
	(৪) পূর্বাহ্ন	☐
(গ) যে জলে ও স্থলে বাস করে	(১) খেচর	☐
	(২) স্থলচর	☐
	(৩) নিশাচর	☐
	(৪) উভচর	☐
(ঘ) স্মরণ করবার যোগ্য	(১) বরণীয়	☐
	(২) স্মরণীয়	☐
	(৩) বন্ধনীয়	☐
	(৪) আচরণীয়	☐

(চ) যে ক্ষতি করে	(১) ঘৃণাকর	☐
	(২) ক্ষতিকর	☐
	(৩) পুষ্টিকর	☐
	(৪) সুখকর	☐
(ছ) পরলোক সম্বন্ধীয়	(১) জাগতিক	☐
	(২) ইহলোকিক	☐
	(৩) ঐহিক	☐
	(৪) পারলৌকিক	☐
(জ) যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে	(১) কৃতজ্ঞ	☐
	(২) কৃতঘ্ন	☐
	(৩) পাদপ	☐
	(৪) শুভদ	☐
(ঝ) যাকে ঘোড়ানো হচ্ছে	(১) ঘূর্ণমান	☐
	(২) ঘূর্ণায়মান	☐
	(৩) ঘূর্ণ্যমান	☐
	(৪) দোদুল্যমান	☐
(ঞ) জীবিত থাকার ইচ্ছা	(১) জিজীবিষা	☐
	(২) জিগমিষা	☐
	(৩) জিহীষা	☐
	(৪) জিঘাংসা	☐

(২) নীচের বাক্যগুলোকে একপদে পরিণত করুন ঃ

ক) যার কুলশীল জানা নেই।
খ) হনন করবার ইচ্ছা।
গ) যার দুহাত সমানে চলে।
ঘ) যে ইন্দ্রকে জয় করে।
ঙ) পা থেকে পাথা পর্যন্ত।
চ) যে গাছ অন্য গাছের উপর জন্মায়।
ছ) যে নারী প্রিয় কথা বলে।
জ) যিনি শ্রদ্ধার যোগ্য।
ঝ) যার মমতা নেই।
ঞ) যে বিদেশে থাকে

এবারে নীচের সংকেতের সঙ্গে উত্তর মিলিয়ে নিন।

৬.১১ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

১) ভাষার ইতিবৃত্ত ঃ সুকুমার সেন

২) সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ ঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৩) সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ ঃ পরেশচন্দ্র মজুমদার।

৬.১২ উত্তর-সংকেত

অনুশীলনী - ১

১. (ক) সংস্কৃত (খ) গ্রিক

অনুশীলনী - ২

১. (ক) — ৩ (খ) — ২ ২. (ক) চলিত (খ) সাধু (গ) চলিত (ঘ) চলিত (ঙ) সাধু

৩. (ক) বসিয়, লিখিতেছি (খ) হতে, পারব (গ) যাহাদের, তাহাদের, করিয়া (ঘ) সকল, হইয়া (ঙ) এ , থেকেই যাবে।

অনুশীলনী - ৩

১. (ক) অগ্রগামী (খ) অগ্রজ (গ) অপরাহ্ন (ঘ) উভচর (ঙ) স্মরণীয় (চ) ক্ষতিকর (ছ) পারলৌকিক (জ) কৃতজ্ঞ (ঝ) ঘূর্ণ্যমান (ঞ) জিজীবিষা

২. (ক) অজ্ঞাতকুলশীল (খ) জিঘাংসা (গ) সব্যসাচী (ঘ) ইন্দ্রজিৎ (ঙ) আপাদমস্তক (চ) পরগাছা (ছ) প্রিয়ংবদা (জ) শ্রদ্ধেয় (ঝ) নির্মম (ঞ) প্রবাসী।

৬.১৩ অতিরিক্ত অনুশীলনী

৬.১৩.১ বাংলা ধ্বনি

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(ক) বর্ণ আর......................এক নয়।

(খ) 'আ' উচ্চরণের সময় জিভ......................থাকে।

(গ) ত্ থ্ দ্ ধ্ উচ্চারণকালে জিভের ডগা......................থাকে।

(ঘ) ক-অক্ষর না বলে লেখার বেলায়......................বলব।

(ঙ) দ্বিস্বর আসলে...................... + ...।

২। স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে তফাত কী তা জানিয়ে বাংলা ভাষায় কোন কোন ধ্বনি ব্যবহৃত হয় তা জানান।

৩। বর্ণ ও ধ্বনির মধ্যে পার্থক্য কী, বাংলা ধ্বনিগুলির একটি তালিকা দিন।

৪। বাগ্‌যন্ত্রের চিত্র এঁকে উচ্চরণ স্থানগুলি চিহ্নিত করুন।

৬.১৩.২ প্রত্যয়

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(ক) আ, অন, অন্ত প্রভৃতিকে বাংলা.......................বলা হয়।

(খ) আ, ঈ, ইনি, ইকা ইত্যাদি যোগ করে.......................তৈরি করা হয়।

(গ) টি, টা হল.......................প্রত্যয়।

(ঘ) না হল......................বিশ্লেষণ।

(ঙ) শব্দ থাকে অভিধানে.......................থাকে ব্যবহৃত বাক্যে।

২। ঠিক না ভুল তা (✓) চিহ্ন দিয়ে জানানা।

	ঠিক	ভুল
(ক) ক্ত, ক্তি হল সংস্কৃত প্রত্যয়ঃ	☐	☐
(খ) গণ, বৃন্দ দিয়ে একবচন করা হয়	☐	☐
(গ) 'অধ্যাপকেকা' ঠিক শব্দ	☐	☐
(ঘ) 'শত্রুদের' হল শব্দ	☐	☐

৩। সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

বচন প্রত্যয়, লিঙ্গ প্রত্যয়, নির্দেশক প্রত্যয়।

৪। বাংলা বচন সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

৫। লিঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৬। নির্দেশক প্রত্যয়গুলি সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

৬.১৩.৩ সন্ধি

১। সংস্কৃত সন্ধির নিয়ম অনুসারে সন্ধি বিচ্ছেদ করুন।

স্বাধীন, কটূক্তি, দুর্গোৎসব, দিগন্ত, জগন্মোহন, তন্ময়, শরৎকাল, সন্তাপ, সংহার।

২। বাংলা সন্ধির নিয়মানুসারে সন্ধি বিচ্ছেদ করুন।

গুনিয়াছি, বারেক, আগাছা, যদ্দিন, বজ্জাত।

৩। সংস্কৃত স্বরসন্ধির তিনটি নিয়ম উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৪। সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধির তিনটি নিয়ম উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৫। বাংলা সন্ধির তিনটি নিয়ম উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৬। ঠিক না ভুল জানান।

		ঠিক	ভুল
(ক)	দুর্গোৎসব	☐	☐
(খ)	মরৌদ্যান	☐	☐
(গ)	অভ্যুদয়	☐	☐
(ঘ)	বনোষধি	☐	☐
(ঙ)	বদজাত	☐	☐

৭। সন্ধি করুন।

(ক) আবিঃ + কার (খ) দুঃ + সময় (গ) আবিঃ + ভাব

(ঘ) অতি + অন্ত (ঙ) মহা + ইন্দ্র (চ) সৎ + জন

৮। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(ক) এর সঙ্গে........................মিলনে হয় স্বরসন্ধি।

(খ) ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে........................মিলে হয়........................সন্ধি।

(গ) খাঁটি বাংলায়........................উচ্চারণ নেই।

(ঘ) নরেশ হল........................সন্ধির উদাহরণ।

(ঙ) ত্ বা দ্ এর পর........................থাকলে 'চ্' হয়।

৬.১৩.৪ বাংলা বাক্য ঃ গঠন ও প্রকার

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(ক) বাক্য হল........................।

(খ) একটি মাত্র বাক্যখণ্ড থাকলে........................বাক্য বলা হবে।

(গ) একাধিক বাক্যখণ্ড থাকলে........................বাক্য ও .... বাক্য হবে।

(ঘ) কোনও রকম হুকুম, প্রার্থনা বোঝালে........................বাক্য বলে।

২। কাকে বলে জানান।

সরলবাক্য, বিবৃতিমূলক বাক্য, প্রশ্নবাক্য, অনুজ্ঞাবাচক বাক্য।

৩। কী বাক্য তা জানান।

(ক) আমি বাড়ি যাব (খ) তুমি কোথায় যাবে?

(গ) আমি বলব না (গ) আপনি খেলেন যে?

৬। ঠিক না ভুল জানান।

		ঠিক	ভুল
(ক)	মৌলিক বাক্যে একাধিক বাক্যখণ্ড থাকবে।	☐	☐
(খ)	আমি যাব না, সদর্থক বাক্য।	☐	☐
(গ)	তুমি খাবে কি? হ্যাঁ-না প্রশ্ন।	☐	☐
(ঘ)	আপনি কোথায় যাবেন? হ্যাঁ-না প্রশ্ন।	☐	☐

৫। গঠন অনুসারে বাক্যগুলির শ্রেণী নির্দেশ করে আলোচনা করুন।

৬। প্রকার অনুসারে বাক্য কয়প্রকার ও কী কী?

৭। আশ্রয়মূলক বাক্য কাকে বলে আলোচনা করুন।

৮। সংযোগমূলক বাক্য সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।

৯। বাক্য কাকে বলে সংক্ষেপে তা আলোচনা করুন।

৬.১৩.৫ বাংলা বাগ্‌বিধি, বাগ্‌ধারা ও প্রবাদ

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(ক) তুই মুখ....................... কথা বলবি।

(খ) তুই আমাদের গাঁয়ের ....।

(গ) মেয়েটির গায়ের রং.......................সোনা।

(ঘ) ....গলায় গান ভালো শোনায় না।

(ঙ) সম্পত্তি.......................র দরে ছাড়তে হল।

২। বাক্য রচনা করুন।

আকাশকুসুম, আমড়াগাছি, কানপাতলা, কথার কথা, উত্তম মধ্যম, কাঁচা পয়সা, গোকুলের ষাঁড়।

৩। যে কোনও দশটি প্রবাদ অর্থসহ লিখুন।

৪। প্রবাদ কাকে বলে তা আলোচনা করুন।

৫। ‘মুখ’ এবং ‘মাথা’ দিয়ে পাঁচটি করে বাক্য রচনা করে মুখ ও মাথার বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ দেখান।

৬। দশটি প্রবাদ লিখে উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৭। বাগ্‌ধারা কাকে বলে। দশটি উদাহরণ দিন।

৬.১.২.৬ বাংলা ভাষার উদ্ভব, সাধুভাষা ও চলিত ভাষা এবং বাক্য ও বাক্যাংশ সংকোচন

১। **শূন্যস্থান পূরণ করুন।**

(ক) পৃথিবীর ভাষাগুলিকে ২৫/২৬টি.......................ভাগ করা যায়।

(খ) কেলটিক.......................ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত।

(গ) ....আর্য নামক তৃতীয় শাখার কথা আমরা পাই।

(ঘ) মুখে যা বলি তাকে.......................ভাষা বলে।

(ঙ) সাধু ও চলিত হল.......................উপভাষা।

২। **চলিতভাষায় রূপান্তরিত করে দেখান।**

আমি তাহাকে দেখিয়া অবাক হইলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, কেমন আছেন? অনেকদিন আপনাকে দেখি নাই। আমি কহিলাম, ভালো আছি।

৩। **সাধুভাষায় রূপান্তরিত করে দেখান।**

সে এখানে এসে বলল, ভালো নেই। ভালো ছিলাম না অনেকদিন। আমি তাগে বসতে বললাম। সে বসল না।

৪। **বাক্য সংকোচন করুন।**

(ক) যা দেখা যায় না (খ) অনুসন্ধান করবার ইচ্ছা। (গ) যা বলা যায় না। (ঘ) একই গুরুর শিষ্য (ঙ) যা অবশ্যই ঘটবে। (চ) সারা জীবন ধরে।

৫। পৃথিবীর ভাষাবর্গগুলিকে কটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় তা আলোচনা করুন।

৬। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীতে কোন কোন ভাষা পড়ে তা জানান।

৭। প্রাচীন-ভারতীয় আর্যভাষা সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখুন।

৮। মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৯। প্রাচীন-ভারতীয় আর্যভাষা থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি কীভাবে হল জানান।

১০। সাধু ও চলিত ভাষা নিয়ে আলোচনা করুন।

১১। বাক্যাংশ ও বাক্য সংকোচন কাকে বলে? কুড়িটি উদাহরণ দিন।

একক ৭ ❑ ভারতবর্ষের সংস্কৃতি : বর্ত্তমান ভারত—স্বামী বিবেকানন্দ

গঠন

৭.১ উদ্দেশ্য

৭.২ প্রস্তাবনা

৭.৩ মূলপাঠ-১

৭.৪ সারাংশ-১

৭.৫ অনুশীলনী-১

৭.৬ মূলপাঠ-২

৭.৭ সারাংশ-২

৭.৮ অনুশীলনী-২

৭.৯ উত্তর-সংকেত

৭.১০ গ্রন্থপঞ্জি

৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি :

- ভারতবর্ষের পরিবর্তনের ধারাকে স্বামীজির আদর্শের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- স্বামী বিবেকানন্দের গদ্য লেখার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

৭.২ প্রস্তাবনা

মূলপাঠটি স্বামী বিবেকানন্দ রচিত 'বর্ত্তমান ভারত' এর 'শূদ্র জাগরণ', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংঘর্ষ' এবং 'স্বদেশমন্ত্র' নামক অনুচ্ছেদ থেকে গৃহীত। স্বামী বিবেকানন্দকে কেউ সাহিত্যিক বলে দাবি না করলেও তিনি যে অল্প সংখ্যক বাংলা রচনা লিখে গেছেন তাতেই নতুন একটা বাংলা গদ্যরীতির সৃষ্টি হয়েছে। 'বর্ত্তমান ভারত' এর বিষয় হল পুরোনোর সঙ্গে নতুনের সংঘর্ষ, নতুনের সারাংশ গ্রহণ ও পুরোনোর সারাংশ রক্ষার দ্বারা বর্ত্তমান ভারতকে সৃষ্টি করা। তিনি একদিকে যেমন নতুনকে গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন অন্যদিকে তেমনি ভারতের শাশ্বত অংশকেও রক্ষা করার উপদেশ দিয়েছেন। নির্বিচারে নতুনকে গ্রহণ করা ও নির্বিচারে পুরোনোকে আঁকড়ে ধরে রাখা দুই-ই বিপজ্জনক। কিন্তু উভয়ের সমন্বয়ই ভারতের ভবিষ্যতের পক্ষে কল্যাণকর। পুরোনো ভারতীয় সভ্যতা নতুনের সংঘাতে বিব্রতবোধ করছে। এখন ভারতীয়দের সামনে দুটো রাস্তাই খোলা। একটি পুরোনোকে আকড়ে ধরে মৃত্যুবরণ করা, অপরটি নতুনকে আত্মস্থ করে নববলে বলীয়ান হয়ে ওঠা। বলা বাহুল্য স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে শেষোক্ত পন্থাটি অবলম্বন করতে উপদেশ দিয়েছেন।

৭.৩ মূলপাঠ ১

সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যালয়ের দ্বারাই অধিকৃত হউক, বাহুবলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা

দুর্বল। কিন্তু মায়ার এমনই বিচিত্র খেলা, যাহাদের নিকট হইতে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষভাবে ছল-বল-কৌশল বা প্রতিগ্রহের দ্বারা শক্তি পরিগৃহীত হয়, তাহারা অচিরেই নেতৃসম্প্রদায়ের গণনা হইতে বিদূরিত হয়। পৌরোহিত্যশক্তি কালক্রমে শক্ত্যাধার প্রজাপুঞ্জ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া তাৎকালিক প্রজাসহায় রাজশক্তির নিকট পরাভূত হইল; রাজশক্তিও আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বিচার করিয়া প্রজাকুল ও আপনার মধ্যে দুস্তর পরিখা খনন করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সাধারণ প্রজাসহায় বৈশ্যকুলের হস্তে নিহত বা ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া গেল। এক্ষেত্রে বৈশ্যকুল আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে; অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্যক জ্ঞানে আপনাদিগকে প্রজাপুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে; এস্থানে এ শক্তির মৃত্যুবীজ উপ্ত হইতেছে।

সাধারণ প্রজা সমস্ত শক্তির আধার হইয়াও পরস্পরের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া আপনাদের সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, এবং যতকাল এইভাব থাকিবে ততকাল রহিবে। সাধারণ বিপদ ও ঘৃণা এবং সাধারণ প্রীতি—সহানুভূতির কারণ। মৃগয়াজীবী পশুকুল যে নিয়মাধীনে একত্রিত হয়, মনুজবংশও সেই নিয়মাধীনে একত্রিত হইয়া জাতি বা দেশবাসীতে পরিণত হয়।

একান্ত স্বজাতি-বাৎসল্য ও একান্ত ইরান-বিদ্বেষ গ্রীক-জাতির, কার্থেজ-বিদ্বেষ, রোমের, কাফের-বিদ্বেষ আরবজাতির, মুর-বিদ্বেষ স্পেনের, স্পেন-বিদ্বেষ ফ্রান্সের, ফ্রান্স-বিদ্বেষ ইংলন্ড ও জার্মানির এবং ইংলন্ড-বিদ্বেষ আমেরিকার উন্নতির (প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমাধান করিয়া) এক প্রকার কারণ নিশ্চিত।

স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রধান শিক্ষক। ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত; স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ; স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ। বহুজনের সহায়তা ভিন্ন অধিকাংশ কার্য কোনও মতে চলে না, আত্মরক্ষা পর্যন্ত অসম্ভব। এই স্বার্থরক্ষার সহকারিত্ব সর্ব্বদেশে সর্বজাতিতে বিদ্যমান। তবে স্বার্থের পরিধির তারতম্য আছে। প্রজোৎপাদন ও যেন-তেন-প্রকারেণ উদরপূর্তির অবসর পাইলেই ভারতবাসীর সম্পূর্ণ স্বার্থসিদ্ধি; আর উচ্চবর্ণের ইহার উপর ধর্মের বাধা না হয়। এতদপেক্ষা বর্তমান ভারতে দুরাশা আর নাই; ইহাই ভারতজীবনের উচ্চতম সোপান।

ভারতবর্ষের বর্তমান শাসনপ্রণালীতে কতকগুলি দোষ বিদ্যমান, কতকগুলি প্রবল গুণও আছে। সর্বাপেক্ষা কল্যাণ ইহা যে, পাটলিপুত্র-সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত, এ প্রকার শক্তিমান ও সর্বব্যাপী শাসনযন্ত্র অস্মদ্দেশে পরিচালিত হয় নাই। বৈশ্যাধিকারের যে চেষ্টায় এক প্রান্তের পণ্যদ্রব্য অন্য প্রান্তে উপনীত হইতেছে, সেই চেষ্টারই ফলে দেশদেশান্তরের ভাবরাশি বলপূর্বক ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিতেছে। এই সকল ভাবের মধ্যে কতকগুলি অতি কল্যাণকর, কতকগুলি অমঙ্গলস্বরূপ, আর কতকগুলি পরদেশবাসীর এ দেশের যথার্থ কল্যাণনির্ধারণে অজ্ঞতার পরিচায়ক।

কিন্তু গুণদোষরাশি ভেদ করিয়া সকল ভবিষ্যৎ মঙ্গলের প্রবল লিঙ্গ দেখা যাইতেছে যে, এই বিজাতীয় ও প্রাচীন স্বজাতীয় ভাবসংঘর্ষে, অল্পে অল্পে দীর্ঘসুপ্ত জাতি বিনিদ্র হইতেছে। ভুল করুক, ক্ষতি নাই; সকল কার্যেই ভ্রম প্রমাদ আমাদের একমাত্র শিক্ষক। যে ভ্রমে পতিত হয়, ঋতপথ তাহারই প্রাপ্য। বৃক্ষ ভুল করে না; প্রস্তরখণ্ডও ভ্রমে পতিত হয় না, পশুকুলে নিয়মের বিপরীতাচরণ অত্যল্পই দৃষ্ট হয়; কিন্তু ভূদেবের উৎপত্তি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ নরকুলেই। দন্তধাবন হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত কর্ম, নিদ্রাভঙ্গ হইতে শয্যাশ্রয় পর্যন্ত সমস্ত চিন্তা যদি অপরে আমাদের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নির্ধারিত করিয়া দেয় এবং রাজশক্তির পেষণে ঐ সকল নিয়মের বজ্রবন্ধনে আমাদের বেষ্টিত করে, তাহা হইলে আমাদের আর চিন্তা করিবার কি থাকে? মননশীল বলিয়াই না আমরা মনুষ্য,

মনীষী, মুনি? চিন্তাশীলতা লোপের সঙ্গে সঙ্গে তমোগুণের প্রাদুর্ভাব, জড়ত্বের আগমন। এখনও প্রত্যেক ধর্মনেতা, সমাজনেতা সমাজের জন্য নিয়ম করিবার জন্য ব্যস্ত!!! দেশে কি নিয়মের অভাব? নিয়মের পেষণে যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত, কে বুঝে?

সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনে বিজিত জাতিবিশেষ ঘৃণার পাত্র হয় না। অপ্রতিহতশক্তি সম্রাটের সকল প্রজারই সমান অধিকার, অর্থাৎ কোনও প্রজারই রাজশক্তির নিয়মের কিছুমাত্র অধিকার নাই। সে স্থলে জাত্যাভিমানজনিত বিশেষাধিকার অল্পই থাকে। কিন্তু যেখানে প্রজানিয়মিত রাজা বা প্রজাতন্ত্র বিজিত জাতির শাসন করে, সে স্থানে বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে অতি বিস্তীর্ণ ব্যবধান নির্মিত হয় এবং যে শক্তি বিজিতদিগের কল্যাণে সম্পূর্ণ নিযুক্ত হইলে অত্যল্পকালে বিজিত জাতির বহুকল্যাণসাধনে সমর্থ, সে শক্তির অধিকাংশভাগই বিজিত জাতিকে স্ববশে রাখিবার চেষ্টায় ও আয়োজনে প্রযুক্ত হইয়া বৃথা ব্যয়িত হয়। প্রজাতন্ত্র রোমাপেক্ষা সম্রাড়ধিষ্ঠিত রোমক-শাসনে বিজাতীয় প্রজাদের সুখ অধিক এজন্যই হইয়াছিল। এজন্যই বিজিত-য়াহুদীবংশসম্ভূত হইয়াও খ্রীষ্টধর্মপ্রচারক পৌল (St. Paul) কেশরী (Caesar) সম্রাটের[১] সমক্ষে আপনার অপরাধ-বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ব্যক্তিবিশেষ ইংরেজ কৃষ্ণবর্ণ বা 'নেটিভ' অর্থাৎ অসভ্য বলিয়া আমাদিগকে অবজ্ঞা করিল, ইহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। আমাদের আপনার মধ্যে তদপেক্ষা অনেক অধিক জাতিগত ঘৃণাবৃদ্ধি আছে এবং মূর্খ ক্ষত্রিয় রাজা সহায় হইলে ব্রাহ্মণেরা যে শূদ্রদের 'জিহ্বাচ্ছেদ, শরীরভেদাদি' পুনরায় কবির চেষ্টা করিবেন না, কে বলিতে পরে? প্রাচ্য আর্য্যাবর্ত্তে সকল জাতির মধ্যে যে সামাজিক উন্নতিকল্পে কিঞ্চিত সদ্ভাব দৃষ্ট হইতেছে, মহারাষ্ট্রদেশে ব্রাহ্মণেরা 'মারাঠা' জাতির যে সকল স্তবস্তুতি আরম্ভ করিয়াছেন, নিম্ন জাতিদের এখনও তাহা নিঃস্বার্থভাব হইতে সমুত্থিত বলিয়া ধারণা হইতেছে না। কিন্তু ইংরাজ সাধারণের মনে ক্রমশঃ এক ধারণা উপস্থিত হইতেছে যে, ভারতসাম্রাজ্য তাঁহাদের অধিকারচ্যুত হইলে ইংরাজজাতির সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। অতএব যেন-তেন-প্রকারেণ ভারতে ইংলন্ডাধিকার প্রবল রাখিতে হইবে। এই অধিকার-রক্ষার প্রধান উপায় ভারতবাসীর বক্ষে ইংরাজজাতির 'গৌরব' সদা জাগরূক রাখা। এই বুদ্ধির প্রাবল্য ও তাহার সহযোগী চেষ্টার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখিয়া যুগপৎ হাস্য করুণরসের উদয় হয়। ভারতনিবাসী ইংরাজ বুঝি ভুলিয়া যাইতেছেন যে, যে বীর্য্য অধ্যবসায় ও স্বজাতির একান্ত সহানুভূতি বলে তাঁহারা এই রাজ্য অর্জন করিয়াছেন, যে সদাজগারুক বিজ্ঞানসহায় বাণিজ্য-বুদ্ধিবলে সর্বধনপ্রসূ ভারতভূমিও ইংলন্ডের প্রধান পণ্যবীথিকা হইয়া পড়িয়াছে, যতদিন জাতীয় জীবন হইতে এই সকল গুণ লোপ না হয় ততদিন তাঁহাদের সিংহাসন অচল। এই সকল গুণ যতদিন ইংরাজ থাকিবে এমন ভারতরাজ্য শত শত লুপ্ত হইলেও, শত শত আবার অর্জ্জিত হইবে। কিন্তু যদি ঐ সকল গুণপ্রবাহের বেগ মন্দীকৃত হয়, বৃথা গৌরব-ঘোষণে কি সাম্রাজ্য শাসিত হইবে? এজন্য এসকল গুণের প্রাবল্যসত্ত্বেও অর্থহীন 'গৌরব'-রক্ষার জন্য এত শক্তিক্ষয় নিরর্থক। উহা প্রজার কল্যাণের নিয়োজিত হইলে, শাসক ও শাসিত উভয় জাতিরই নিশ্চিত মঙ্গলপ্রদ।

৭.৪ সারাংশ-১

ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থার মূল্যায়ন করতে গিয়ে এক ঐতিহাসিক পটভূমিকায় স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের এই পরিবর্তনের ধারাকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। ইংরেজ শাসনের নাগপাশে পরাধীন ভারত যখন নানা সমস্যায় জর্জরিত তখন লক্ষ করা যাচ্ছে যে, ইংরেজ শাসন, ইংরেজ জাতির উপস্থিতি ও ইংরেজি সংস্কৃতি ভারতের পক্ষে

১. রোমক সম্রাট সীজার

পুরোপুরি অকল্যাণকর হয়নি। যে জাতি দীর্ঘকাল এক অচেতনতার মধ্যে বাস করেছে তাদের ধীরে ধীরে জাগরিত করার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য বিজাতীয় ভাবের সঙ্গে প্রাচীন স্বদেশীয় ভাবের সংঘর্ষের এক বিশেষ মূল্য রয়েছে। এই বিজাতীয় শাসনে এদেশের প্রজাবৃন্দ হয়ত পুরোপুরি উপেক্ষিত নয়। সামান্য দু-একজন ভারতবিদ্বেষী ইংরেজের ঘৃণা দিয়ে সম্যক অবস্থার বিচার সম্ভব নয়। ভারতবাসীদের নিজেদের মধ্যেই ক্ষেত্রবিশেষ পরস্পরের প্রতি এর চেয়ে বেশি ঘৃণা ও অসদ্ভাব লক্ষ করা যায় যেটা দেশের একতা সমৃদ্ধি ও উন্নতির পক্ষে সহায়ক নয়। কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে যদি যথেষ্ট পরিমাণে সচেতনতা ও জাগরণের সৃষ্টি না হয় তবে শক্তিমান ইংরেজ ভারতবর্ষকে যেকোনো উপায়ে দখলে রাখবার চেষ্টা করবে এবং ইংরেজের জাতিগত বিশেষ গুণগুলি যতদিন বিদ্যমান থাকবে ততদিন হয়ত তারা এদেশে শাসন করতে সক্ষম হবে। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা থেকে লেখকের আশা এই যে, বৈশ্যকুল অর্থাৎ এই বণিক জাতি ভারতের শাসনক্ষমতা লাভের পর সাধারণ প্রজা অর্থাৎ জনসাধারণ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চাইছে। প্রজারাই হচ্ছে শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতার আধার। প্রজাশাসক বা রাজা যখন প্রজাদের থেকে দূরে সরে যায়, তাদের অবহেলা করে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ বলে ভাবতে থাকে, তখন প্রকৃতই সে দুর্বল হয়ে পড়ে। যেহেতু ইংরেজের মধ্যেও সেই ভাব লক্ষ করা যাচ্ছে, সেই কারণে হয়ত ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষ (প্রজা) অর্থাৎ শূদ্রকুলের হাতে তারা নিজেদের পরাজয়ের পথ তৈরি করছে।

৭.৫ অনুশীলনী-১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন।

১. **নিম্নলিখিত বিবৃতগুলি 'ঠিক' না 'ভুল' তা নির্দিষ্ট ঘরে টিক (✓) দিয়ে চিহ্নিত করুন।**
(উত্তর সংকেত ১৫ পৃষ্ঠায়।)

		ঠিক	ভুল
(ক)	প্রজারাই সমাজ নেতৃত্বের মূলশক্তি।	☐	☐
(খ)	লেখকের মতে বর্তমান (ইংরেজ) শাসনপ্রণালীতে কোনো দোষ নেই।	☐	☐
(গ)	লেখকের মতে স্বার্থত্যাগের প্রধান শিক্ষক স্বার্থ।	☐	☐
(ঘ)	লেখক দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের চিহ্ন দেখতে পেয়েছেন।	☐	☐
(ঙ)	লেখকর মতে কঠিন নিয়মের ফলে দেশের অবস্থার উন্নতি হয়েছে।	☐	☐

২. **নীচের প্রশ্নগুলির জন্য ডানদিকে দেওয়া সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটির পাশে (✓) টিক চিহ্ন দিন।**

(ক) দেশের নেতৃসম্প্রদায় দুর্বল হয়— (১) নিজেদের মধ্যে কলহের দ্বারা।
(২) প্রজাদের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে।
(৩) শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা।

(খ) বিজিত ও বিজয়ীর মধ্যে বাবধান সৃষ্টি হয়, যখন— (১) রাজতন্ত্র বিজিত জাতিকে শাসন করে।
(২) স্বেচ্ছাচারী সম্রাট বিজিত জাতিকে শাসন করে।
(৩) প্রজা নিয়মিত রাজা বা প্রজাতন্ত্র বিজিত জাতিকে শাসন করে।

(গ) ভারতে ইংরেজের অধিকার রক্ষার প্রধান উপায়—	(১) ভারতবাসীর উপর কঠিন অত্যাচার। (২) ভারতবাসীর বুকে ইংরেজ জাতির গৌরব সর্বদা জাগিয়ে রাখা। (৩) শাসনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভারতীয়দের নিয়োগ।
(ঘ) দীর্ঘসুপ্ত ভারতীয় জাতির ধীরে ধীরে বিনিদ্র হবার কারণ—	(১) দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা (২) দেশের শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থা ও খাদ্যাভাব। (৩) বিজাতীয় পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচীন ভারতীয় ভাবের মধ্যে সংঘাত।
(ঙ) লেখকের মতে ইংরেজের সিংহাসন এদেশে অচল—	(১) যতদিন ভারতীয়রা নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন না হবে ততদিন। (২) যতদিন ভারতীয়রা নানা প্রকার আচার ও নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে ততদিন। (৩) যতদিন ইংরেজের জাতীয় জীবন থেকে তাদের জাতিগত বিশেষ গুণগুলি লোপ না পায় ততদিন।

৭.৬ মূলপাঠ-২

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বাহ্য জাতির সংঘর্ষে ভারত ক্রমে বিনিদ্র হইতেছে। এই অল্পজাগরূকতার ফলস্বরূপ স্বাধীন চিন্তার কিঞ্চিৎ উন্মেষ। একদিকে প্রত্যক্ষশক্তি-সংগ্রহরূপ-প্রমাণ-বাহন, শতসূর্য্যজ্যোতিঃ, আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিপ্রতিঘাতিপ্রভা; অপরদিকে স্বদেশি বিদেশি বহুমনীষী-উদঘাটিত, যুগযুগান্তরের সহানুভূতিযোগে সর্বশরীরে ক্ষিপ্রসঞ্চারী, বলদ, আশাপ্রদ, পূর্বপুরুষদিগের অপূর্ব বীর্য্য, অমানব প্রতিভা ও দেবদুর্লভ অধ্যাত্মতত্ত্বকাহিনী। একদিকে জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভূতবলসঞ্চয়, তীব্র ইন্দ্রিয়সুখ বিজাতীয় ভাষায় মহাকোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে; অপরদিকে ঐ মহাকোলাহল ভেদ করিয়া ক্ষীণ অথচ মর্মভেদী স্বরে পূর্বপুরুষদিগের আর্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছেদে লজ্জাহীনা বিদূষী নারীকুল, নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গি অপূর্ব বাসনার উদয় করিতেছে; আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া ব্রত, উপবাস, সীতাসাবিত্রী, তপোবন জটাবল্কল, কাষায়, কৌপীন, সমাধি আত্মানুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে। একদিকে পাশ্চাত্ত্য সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা অপরদিকে আর্য্যসমাজের কঠোর আত্ম-বলিদান। এ বিষম সংঙঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে তাহাতে বিচিত্রতা কি? পাশ্চাত্যে উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা—অর্থকরী বিদ্যা, উপায়—রাষ্ট্রনীতি। ভারতে উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভাষা—বেদ, উপায়—ত্যাগ। বর্তমান ভারত একবার যেন বুঝিতেছে—বৃথা ভবিষ্যৎ অধ্যাত্মকল্যাণের মোহে পড়িয়া ইহলোকের সর্বনাশ করিতেছি; আবার মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতেছে।

'ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ।
কথামিহ মানব তব সন্তোষঃ।।'

২. 'মোহ মুদ্গর, শঙ্করাচর্য'

একদিকে, নব্য ভারত-ভারতী বলিতেছেন—পতিপত্নী-নির্বাচনে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা হওয়া উচিত, কারণ যে বিবাহে আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-দুঃখ তাহা আমরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নির্বাচন করিব; অপরদিকে, প্রাচীন ভারত আদেশ করিতেছেন—বিবাহ ইন্দ্রিয়সুখের জন্য নহে, প্রজোৎপাদনের জন্য। ইহাই এ দেশের ধারণা। প্রজোৎপাদন দ্বারা সমাজের ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের তুমি ভাগী, অতএব যে প্রণালীতে বিবাহ করিলে সমাজের সর্বাপেক্ষা কল্যাণ সম্ভব, তাহাই সমাজে প্রচলিত; তুমি বহুজনের হিতের জন্য নিজের সুখভোগেচ্ছা ত্যাগ কর।

একদিকে নব্যভারত বলিতেছেন—পাশ্চাত্য ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন করিলেই আমরা পাশ্চাত্য জাতির ন্যায় বলবীর্যসম্পন্ন হইব; অপদিকে প্রাচীন ভারত বলিতেছেন—মূর্খ! অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না, অর্জন না করিলে কোন বস্তুই নিজের হয় না; সিংহ-চর্মে আচ্ছাদিত হইলেই কি গর্দভ সিংহ হয়?

একদিকে, নব্যভারত বলিতেছেন—পাশ্চাত্ত্য জাতিরা যাহা করে তাহাই ভালো; ভালো না হইলে উহারা এত প্রবল কি প্রকারে হইল? অপরদিকে প্রাচীন ভারত বলিতেছেন—বিদ্যুতের আলোক অতি প্রবল, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী; বালক, তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, সাবধান!

তবে কি আমাদের পাশ্চাত্য জগৎ হইতে শিখিবার কিছুই নাই? আমাদের কি চেষ্টা-যত্ন করিবার কোন প্রয়োজন নাই? আমরা কি সম্পূর্ণ? আমাদের সমাজ কি সর্বতোভাবে নিশ্ছিদ্র? শিখিবার অনেক আছে, যত্ন আমরণ করিতে হইবে, যত্নই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।' যে ব্যক্তি বা সমাজের শিখিবার কিছুই নাই, তাহা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।—(শিখিবার) আছে; কিন্তু ভয়ও আছে।

কোনও অল্পবুদ্ধি বালক শ্রীরমকৃষ্ণের সমক্ষে সর্বদাই শাস্ত্রের নিন্দা করিত। একদা সে গীতার অত্যন্ত প্রশংসা করে। তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 'বুঝি, কোনও ইংরাজ পণ্ডিত গীতার প্রশংসা করিয়াছে, তাহাতে এ-ও প্রশংসা করিল।'

হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা। পাশ্চাত্য-অনুকরণ মোহ এমনই প্রবল হইতেছে যে, ভালোমন্দের জ্ঞান, আর বুদ্ধি, বিচার, শাস্ত্র, বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। শ্বেতাঙ্গ যে ভাবের, যে আচারের প্রশংসা করে, তাহাই ভালো; তাহারা যাহার নিন্দা করে, তাহাই মন্দ। হা ভাগ্য, ইহা অপেক্ষা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় আর কি?

পাশ্চাত্য নারী স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, অতএব তাহাই ভালো; পাশ্চাত্ত নারী স্বয়ংম্বরা, অতএব তাহাই উন্নতির উচ্চতম সোপান; পাশ্চাত্য পুরুষ আমাদের বেশ, ভূষা, অসন, বসন ঘৃণা করে, অতএব তাহা অতি মন্দ; পাশ্চাত্যেরা মূর্তিপূজা দোষাবহ বলে; মূর্তিমূজা দূষিত, সন্দেহ কি?

পাশ্চাত্যেরা একটি দেবতার পূজা মঙ্গলপ্রদ বলে, অতএব আমাদের দেবদেবী গঙ্গাজলে বিসর্জন দাও। পাশ্চাত্যেরা জাতিভেদ ঘৃণিত বলিয়া জানে, অতএব সর্ববর্ণ একাকার হও। পাশ্চাত্ত্যেরা বাল্যবিবাহ সর্বদোষের আকর বলে, অতএব তাহাও অতি মন্দ নিশ্চিত।

আমরা এই সকল প্রথা রক্ষণোপযোগী বা ত্যাগযোগ্য—ইহার বিচার করিতেছি না; তবে যদি পাশ্চাত্যদিগের অবজ্ঞাদৃষ্টিমাত্রই আমাদের রীতিনীতির জঘন্যতার কারণ হয়, তাহার প্রতিবাদ অবশ্য কর্তব্য।

বর্তমান লেখকের পাশ্চাত্য সমাজের কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে; তাহাতে ইহাই ধারণা হইতেছে যে, পাশ্চাত্ত্য সমাজ ও ভারত সমাজের মূল গতি ও উদ্দেশ্যের এতই পার্থক্য যে, পাশ্চাত্য অনুকরণে গঠিত সম্প্রদায়মাত্রই এদেশে নিষ্ফল হইবে। যাহারা পাশ্চাত্য সমাজে বসবাস না করিয়া, পাশ্চাত্য সমাজের স্ত্রীজাতির

পবিত্রতারক্ষার জন্য স্ত্রী-পুরুষ-সংমিশ্রণের যে সকল নিয়ম ও বাধা প্রচলিত আছে তাহা না জানিয়া স্ত্রী-পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণ প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের অণুমাত্রও সহানুভূতি নাই। পাশ্চাত্ত্যদেশেও দেখিয়াছি, দুর্ব্বলজাতির সন্তানেরা ইংলন্ডে যদি জন্মিয়া থাকে, আপনাদিগকে স্পানিয়ার্ড, পোর্ত্তুগিজ, গ্রীক ইত্যাদি না বলিয়া, ইংরেজ বলিয়া পরিচয় দেয়।

বলবানের দিকে সকলে যায়; গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গাত্রে কোন প্রকারে একটু লাগে—দুর্বলমাত্রেরই এই ইচ্ছা। যখন ভারতবাসীকে ইউরোপী বেশ-ভূষা-মণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত!! চতুর্দশশত-বর্ষ যাবৎ হিন্দুরক্তে পরিপালিত পার্সী এক্ষণে আর 'নেটিভ' নহেন। জাতিহীন ব্রাহ্মণম্মন্যের ব্রাহ্মণ্যগৌরবের নিকট মহারথী কুলীন ব্রাহ্মণেরও বংশমর্যাদা বিলীন হইয়া যায়। আর পাশ্চাত্ত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কটিতটমাত্র-আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচতাজি, তাহারা অনার্য্যজাতি!! উহারা আর আমাদের নহে!!!

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উপানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না— তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না— তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিনরাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'

৭.৭ সারাংশ-২

পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে এ দেশীয় ভাবধারার সংঘর্ষে ভারতবাসীর মনে এক নবচেতনার ও স্বাধীন চিন্তাশক্তির উদয় হয়েছে। এমন ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে যে অনাগত ভবিষ্যতের জন্য যে অধ্যাত্মচিন্তা, তা আমাদের বর্তমান সম্পর্কে ভাবনাচিন্তার কোনো সুযোগ দেয় না। অথচ আমাদের জীবনের অর্থ শুধু ভবিষ্যতের আশায় দিন গোনা নয়, বর্তমানকেও যথাযথরূপে উপলব্ধি করা, ভোগ করা। স্বাধীন চিন্তার ফলে ভারতবাসীর মনে নানা প্রশ্ন, নানা জিজ্ঞাসা। পাশ্চাত্য ভাবের সঙ্গে সংঘর্ষের চিন্তা আমাদের ভাবাতে চাইছে যে, পাশ্চাত্য জাতির চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণ শ্রেষ্ঠ এবং সেগুলিই আমাদের মনেপ্রাণে গ্রহণ করা উচিত, তাতেই আমাদের উন্নতি ও সমৃদ্ধি। অপরদিকে প্রাচীন ভারত ভারতবাসীকে নিজের ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন

করে দিতে চায়। লেখকের মতে, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভাবসংঘর্ষে যেমন আমাদের মধ্যে একটা জাগরণ দেখা দিয়েছে, তেমনি অন্ধ পাশ্চাত্য অনুকরণপ্রিয়তাও মারাত্মক হয়ে উঠেছে। আমরা পাশ্চাত্য প্রভাবের মোহে যেন স্বদেশকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে না দেখি, নিজেকে এদেশীয় বা ভারতীয় বলে পরিচয় দিয়ে লজ্জা না পাই, ভারতবর্ষকে মনেপ্রাণে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে যেন এদেশের সঙ্গে সর্বপ্রকার একাত্মতা অনুভব করতে পারে।

৭.৮ অনুশীলনী-২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন।

১. নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলি 'ঠিক' না 'ভুল' তা নির্দিষ্ট ঘরে টিক (✓) দিয়ে চিহ্নিত করুন। (উত্তর সংকেত ১৫ পৃষ্ঠায়।)

		ঠিক	ভুল
(ক)	আধুনিক ভারতীয়রা পতি-পত্নী নির্বাচনে স্বাধীনতার পক্ষপাতী।	☐	☐
(খ)	অনুসরণ দ্বারা পরের ভাব নিজের হয়।	☐	☐
(গ)	পাশ্চাত্যরা বাল্যবিবাহকে সমাজের মূল-ভিত্তি বলে জানে।	☐	☐
(ঘ)	নব্য ভারত বলছে, পাশ্চাত্য জাতি যা করে তাই ভালো।	☐	☐
(ঙ)	যে ব্যক্তি বা সমাজের শেখবার কিছু নেই তা মৃত।	☐	☐

২. নীচের প্রশ্নগুলির জন্য ডানদিকে দেওয়া সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) লেখকের মতে, ভারতের উদ্দেশ্য
- (১) ঐহিক সুখ।
- (২) রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ
- (৩) মুক্তি

(খ) আধুনিক ভারত বলছে যে, পাশ্চাত্য জাতির ন্যায় শক্তিশালী হতে হলে—
- (১) দেশের জন্য আত্মত্যাগে সর্বদা প্রস্তুত থাকা দরকার।
- (২) পাশ্চাত্য ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ গ্রহণ করা দরকার।
- (৩) ভারতীয়দের দুর্বলতার কারণগুলি অনুসন্ধান করা দরকার।

(গ) রামকৃষ্ণ বলতেন
- (১) যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি।
- (২) যতদিন শিখি ততদিন বাঁচি।
- (৩) বেঁচে থাকার অর্থই, নতুন কিছু শেখা।

(ঘ) পাশ্চাত্য অনুকরণে গঠিত সম্প্রদায় মাত্রই এদেশে নিষ্ফল হবে, কারণ—
- (১) প্রাচ্য ভাবধারাতেই এদেশের অন্যান্য সকল-সম্প্রদায় অনুপ্রাণিত।
- (২) পাশ্চাত্য অনুকরণপ্রিয়তাকে এদেশের সব সম্প্রদায়ই ঘৃণার চক্ষে দেখে।
- (৩) পাশ্চাত্য সমাজ ও ভারতীয় সমাজের মূল গতি ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান।

(ঙ) ভারতবাসীকে ইউরোপীয় বেশভূষা মণ্ডিত দেখলে মনে হয়—

(১) ইউরোপীয় পোশাকের প্রতি তাদের বিশেষ একটা আকর্ষণ আছে।
(২) ওরা বুঝি দরিদ্র ও বিদ্যাহীন ভারতীয়দের সঙ্গে নিজেদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকারে লজ্জিত।
(৩) ইউরোপীয় প্রভাব এদেশে বেশ দৃঢ়ভাবে বাসা বেঁধেছে।

৭.৯ উত্তর-সংকেত

অনুশীলনী - ১

১. (ক) ঠিক, (খ) ভুল, (গ) ঠিক, (ঘ) ঠিক, (ঙ) ভুল।

২. (ক) (২) প্রজাদের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে।
(খ) (৩) প্রজা নিয়মিত রাজা বা প্রজাতন্ত্র বিজিত জাতিকে শাসন করে।
(গ) (২) ভারতবাসীর বুকে ইংরেজ জাতির গৌরব সর্বদা জাগিয়ে রাখা।
(ঘ) (৩) বিজাতীয় পাশ্চাত্য ও প্রাচীন ভারতীয় ভাবের মধ্যে সংঘাত।
(ঙ) (৩) যতদিন ইংরেজের জাতীয় জীবন থেকে তাদের জাতিগত বিশেষ গুণাগুলি লোপ না পায় ততদিন।

অনুশীলনী - ২

১. (ক) ঠিক, (খ) ভুল, (গ) ভুল, (ঘ) ঠিক, (ঙ) ঠিক।

২. (ক) (৩) মুক্তি।
(খ) (২) পাশ্চাত্য ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ গ্রহণ করা দরকার।
(গ) (১) যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি।
(ঘ) (৩) পাশ্চাত্য সমাজ ও ভারতীয় সমাজের মূল গতি ও উদ্দেশ্যর মধ্যে পার্থক্য বর্তমান।
(ঙ) (২) ওরা বুঝি দরিদ্র ও বিদ্যাহীন ভারতীয়দের সঙ্গে নিজেদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকারে লজ্জিত।

৭.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১. **স্বামী বিবেকানন্দ** : বিবেকানন্দ রচনাবলী।

একক ৮ ❑ আধুনিক সংস্কৃতি — প্রবোধচন্দ্র ঘোষ

গঠন

৮.১ উদ্দেশ্য

৮.২ প্রস্তাবনা

৮.৩ মূলপাঠ ১

৮.৪ সারাংশ ১

৮.৫ অনুশীলনী ১

৮.৬ মূলপাঠ ২

৮.৭ সারাংশ ২

৮.৮ অনুশীলনী ২

৮.৯ সারসংক্ষেপ

৮.১০ অনুশীলনী ৩ (ভাষাদক্ষতা বিষয়ক)

৮.১১ উত্তর সংকেত

৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর আপনি :

- বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্পর্কিত নানারকম তথ্য জানতে পারবেন।

৮.২ প্রস্তাবনা

ভাষা ও সাহিত্যে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানে সমাজের যে সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয় তার পিছনে থাকে তাদের সচেতনতা। কিন্তু যেখানে সেই সচেতনতা সক্রিয় হলেও প্রত্যক্ষ নয়, তাদের সংস্কৃতির প্রকাশ ধরা পড়ে চারুকলায় ও সংগীতে। তবে, আদিম বাঙালির চারুকলা বা সংগীত সম্পর্কে উপযুক্ত উপাদানের অভাবে বলার কিছুই নেই। চারুকলার কিছু কিছু উপাদান যদিও বা পাওয়া যায় একেবারে শেষ পর্বের আগে, সংগীত সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না। অথচ আদিম মানবগোষ্ঠীর সাংস্কৃতির প্রকাশ তো গানেই। বাঙালিও নিশ্চয় গানের মাধ্যমেই তাদের আনন্দ প্রকাশ করত। সে সব গানের রাগরাগিণী, সুর, তাল, লয়, মান কী ছিল তা আমাদের অজানা। একেবারে দশম-দ্বাদশ শতকে যে সব তাল, লয়, রাগরাগিণীর পরিচয় পাই তার মধ্যে বাইরের সংস্কৃতির স্পর্শ লেগেছে, কিন্তু বাঙালির আদি সংস্কৃতির প্রভাব যে নেই এ কথা বলা যায় না। সংস্কৃতি বলতে সারা জাতির কর্মসাধনার যুক্ত ফলকে বোঝায়। সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সবকিছুকেই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তাই সংস্কৃতিতে একটা জাতির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙালির সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি এবং বিরোধেরও সৃষ্টি করেনি।

৮.৩ মূলপাঠ ১

আধুনিক সংস্কৃতির দুর্বলতা সত্ত্বেও এর ব্যাপকতা ও বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য্য। এই যুগে প্রাচীন ও মধ্য যুগের লোকসংস্কৃতি মরেনি, এখনো গ্রাম্যজীবনে বেঁচে আছে। যদিও তার অনেক প্রথা ও পদ্ধতি আজ লুপ্তপ্রায়। তবে এ কথা ঠিক যে, নতুন কোনো লোকসংস্কৃতি এই যুগে স্পষ্টভাবে বিকশিত হয়ে ওঠেনি। উচ্চতর কৃষ্টির ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়েছে এবং সেই পরিবর্তনের মূল কারণ হচ্ছে দেশজ কৃষ্টির বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আবির্ভাব। আধুনিক সংস্কৃতির বাহন তাই প্রধানত বিদেশি ভাষা; এর আত্মা হচ্ছে বৈদেশিক সভ্যতা। পূর্ববর্তী ধারা থেকে এই গভীর বিচ্ছেদের মূলে রয়েছে আধুনিক যুগের সমগ্র ইতিহাস, শাসনপদ্ধতি ও চিন্তাধারায় ইংরেজি তথা পাশ্চাত্য প্রভাব। ফলে আধুনিক সংস্কৃতির অনেকটাই দেশজ নয় এবং পাশ্চাত্য সভ্যতাকে পরিপাক করে নেওয়াও দেড়শো বছরে সম্ভব হয়নি। কিন্তু শত ত্রুটি থাকলেও আধুনিক বাঙালি সংস্কৃতি হচ্ছে সারা ভারতের নব জাগৃতির ইতিহাস ও সম্পদ এবং এর প্রধান স্রষ্টা বাংলার ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু নাগরিক।

মধ্যযুগে বাংলার বৃহত্তর সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল গৌড়, নবদ্বীপ, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ, যদিও বৈষ্ণব কবিরা নবদ্বীপের মাহাত্ম্য সম্বন্ধতেই বেশি উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। কিন্তু আধুনিক যুগে বাঙালির প্রায় সমগ্র সাধনা কেন্দ্রীভূত হয়েছে কলকাতায়। সারা বাংলা কলকাতার দিকেই চেয়ে থাকে। ১৯৪৭ এর বাংলা বিভাগের ফলে ঢাকা একটি রাজধানীতে পরিণত হলেও একাধিক কারণে ভারতের বিভিন্ন শহরের মতোই তার পক্ষে হঠাৎ আধুনিক মহানগরী হয়ে ওঠা সম্ভব নয়।

অর্থনীতি ও বিজ্ঞান, গণতন্ত্রের আদর্শ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, স্বাধীন চিন্তার সুযোগ—এই সমস্তই বাংলায় এই মহানগরী সৃষ্টির ফল এবং এর জন্য সারা ভারতও অগ্রসর হয়ে গেছে কৃষ্টির পথে। মহানগরীর সভ্যতা আধুনিক যুগে সমগ্র বাংলার সাধনাকে আচ্ছন্ন করেছে, বিপন্নও করেছে একাধিক দিকে।

আধুনিক সংস্কৃতির বিরাট ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার না করেও বলা যায় যে, এর ভিত্তি খুব দৃঢ় নয়, এর রূপান্তর আবশ্যক ও অনিবার্য। তার কারণ হচ্ছে, বর্তমান সামাজিক জীবনের অপূর্ণতা। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই এই অপূর্ণতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও স্বাধীনতা লাভের পর সামাজিক জীবনের ভাঙন ও সংস্কৃতির সংকট হল স্পষ্টতর। মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল কৃষ্টির বাহক ও প্রচারক; কিন্তু এখন সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ভেঙে পড়েছে আভ্যন্তরীণ দুর্বলতায় এবং বর্তমান পরিস্থিতির নিষ্ঠুর আঘাতে। আজও আবশ্য সাধনা চলেছে; কিন্তু সাধনার রূপান্তরও যে হচ্ছে তা বোঝা যায় শ্রেণীলোপের দ্রুত বর্ধমান সম্ভাবনায়, বিপ্লবী সমাজদৃষ্টির দাবিতে আর বামপন্থী কৃষ্টির সূচনায়।

দেড়শো বছরের আধুনিক সভ্যতা আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে পরাধীনতা ও মূলগত দুর্বলতা সত্ত্বেও এই সাধনা অভূতপূর্ব এবং এর জন্য সারা ভারত বাংলার কাছে ঋণী। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, বাঙালি বৈশিষ্ট্যের ছাপ স্পষ্ট থাকলেও এই বিরাট সাধনা সংকীর্ণতা বা প্রাদেশিকতা থেকে মুক্ত এবং সারা ভারতে সার্থকভাবে গ্রাহ্য ও গৃহীত। এই দীর্ঘ ও বিচিত্র সাধনার মূলসূত্রগুলির সন্ধান পাওয়া যাবে নিম্নলিখিত বিষয়ে—

(১) পাশ্চাত্য সভ্যতাকে উপলব্ধি এবং প্রাচ্য সভ্যতার সঙ্গে মিশিয়ে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ;

(২) বিজ্ঞানচর্চা ও বিভিন্ন বিভাগে বৈজ্ঞানিকদের অবদান;

(৩) শিক্ষার প্রয়োজনবোধ ও প্রচার, নানাপ্রকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংগঠন এবং বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, অর্থনীতি প্রভৃতির চর্চা;

(৪) রাষ্ট্রীয় সামাজিক চেতনা ও আন্দোলন এবং সাংবাদিকতার প্রসার;

(৫) নারীজাগরণ ও কর্মক্ষেত্রে নারীর আবির্ভাব;

(৬) উচ্চতর সাহিত্যের বিপুল সাধনা;

(৭) প্রাচ্য ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে নতুন কলাশিল্পের সৃষ্টি ও প্রচার—অবনীন্দ্রনাথ থেকে যামিনী রায় পর্যন্ত; তার নতুনত্ব; নাটক, কথাচিত্র ও বেতারে নতুন কৃষ্টির সম্ভাবনা;

(৮) সমাজ সংস্কার ও সেবা প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় জীবনের অন্যান্য সংগঠনী সাধনা;

(৯) জড়বাদী যুগে আধ্যাত্মিক মূল্য সম্বন্ধে সচেতনতা রামমোহন থেকে শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত;

(১০) ভারতীয় সংস্কৃতির জীবনে রবীন্দ্রনাথের অজস্র অবদান।

ঐতিহাসিক ঘটনার দিকে লক্ষ্য রেখে বাঙালির সংস্কৃতিকে আধুনিক যুগে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়—১৮০০-১৮৫৭; ১৮৫৭-১৯১৯; ১৯১৯-১৯৪৭। অবশ্য এ ধরনের পর্ববিভাগ খানিকটা কৃত্রিম হবেই কারণ রূপান্তর বছরের হিসাবে ঘটে না।

১৮০০-১৮৫৭ : এ যুগের চিন্তানায়কেরা পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে এসে আবিষ্কার করলেন প্রাচ্য জীবনের অসম্পূর্ণতা। তাই প্রাচ্য জীবনকে পাশ্চাত্য ভাবধারার মধ্য দিয়ে নতুন করে গড়ে তোলাই হল তাঁদের সাধনা আর প্রথমেই তাঁদের নজর গেল সমাজ-সংস্কারের দিকে। এর বিশেষ প্রয়োজনও ছিল, কারণ মোগল যুগের অবসানের সময়ে সারা দেশে এমন একটা মানসিক স্থবিরতা এবং সামাজিক অবনতি এসেছিল যাকে দূর করা একান্ত আবশ্যক হল। অবশ্য এই অভিযানে বাড়াবাড়ি খানিকটা হয়েছিল এবং অন্ধ অনুকরণও যে হয়নি তা নয়। কিন্তু তাহলেও সংস্কৃতির দিক দিয়ে এ আন্দোলনের মধ্যে ছিল এক সুস্থ রূপান্তর ও গতিশীলতার ধারা।

এ যুগের বহু সাধকের মধ্যে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব দেখি রামমোহনের চরিত্রে। তাই ঘরে বাইরে তাঁর প্রতিভা সমভাবেই অনুভূত হয়েছিল। তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সমন্বয়ে। হিন্দু মুসলমান ও য়ুরোপীয় সংস্কৃতিকে তিনি সার্থকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং বুঝেছিলেন কোথায় তাঁর সমসাময়িক ভারতের গলদ আর অসম্পূর্ণতা। সেইজন্যেই তাঁর চিন্তাধারা ও সাধনা সেদিনের বাংলায় বিপ্লবী মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল। রামমোহন ও তাঁর সমসাময়িক সাধকেরা তাঁদের বাঙালিত্ব সম্বন্ধে সমগ্রভাবে সচেতন থেকেও প্রাদেশিকতা থেকে মুক্ত ছিলেন এবং সেইজন্যই বাঙালির সাধনায় হয়েছিল ভারতের নবজাগৃতি। ধর্ম,সমাজ শিক্ষায় সংস্কার, জাতীয় চেতনার উদ্রেক, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর সংস্কৃতির স্থাপনা—এই ছিল রামমোহনের নবযুগের আদর্শ; অর্থাৎ একটি উদার বৈজ্ঞানিক মন দিয়ে তিনি ভারতের রূপান্তর বা যুগ বিপ্লব ঘটাতে চেষ্টা করলেন। এই সংস্কারমুক্ত দৃষ্টির ফলেই ব্রাহ্মধর্মের সূচনা, সতীদাহপ্রথার সমাপ্তি এবং ইংরেজি শিক্ষার ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রবর্তন। যুক্তি ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে রামমোহন হিন্দু, মুসলিম, ক্রিশ্চান ধর্মের কু-পদ্ধতিগুলি দূর করবার চেষ্টা করলেন। ধর্ম ও সমাজের সংস্কার (বিশেষত জাতিভেদ লোপ ও সাম্প্রদায়িক সমন্বয়) তাঁর কাছে জাতীয় চেতনা থেকে পৃথক ছিল না।

তাঁর ধারণা ছিল সামাজিক ঐক্য ও সুস্থ সমাজব্যবস্থার ফলে জাতীয় চেতনা ও রাজনৈতিক মুক্তি আসবে এবং স্বাধীন ভারতের চিন্তা তিনি একাধিক পত্রে ও কথোপকথনে প্রকাশ করেছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে চিন্তা ও বিতর্কের উপযোগী গদ্যরচনাও তাঁর আর একটি ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা। রামমোহনের মন সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়ে

এ দেশকে পরিচিত করেছিল বিদেশের কাছে আর বিদেশকে গ্রহণ করেছিল দেশি চিত্তের দিগন্ত বিস্তারের জন্য। চীন, স্পেন, গ্রীস, আয়ারল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স সর্বত্রই সংস্কার ও বিদ্রোহের আন্দোলন ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তা রামমোহনের মনকে আকৃষ্ট করেছিল। স্প্যানিশ্ ভাষায় লেখা একখানি বই তাঁকে উৎসর্গ করা হয়েছিল; ইংল্যান্ডে শাসক ইংরেজ সমাজেও তিনি ছিলেন গুরুস্থানীয় ব্যক্তি। স্যার জন্ বৌরিং, রেভরন্ড পোর্টার, ডক্টর বুট, দার্শনিক বেন্থাম প্রমুখ ইংরেজরা যে ভাষায় রামমোহনকে প্রশংসা করেছেন তাতে তাঁকে মহামানব বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। রামমোহন ভারতীয় নব জাগৃতির প্রথম ও পূর্ণ প্রতীক। কিন্তু তাঁর যুগে বিরোধী লোকের অভাব ছিল না আর এই প্রাচীনপন্থীদের তীব্র বিরোধিতার জন্যই বিরাট ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও রামমোহনের প্রভাব খানিকটা সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখযোগ্য—ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও হিন্দু কলেজ। প্রথমটির মাধ্যমে প্রাচ্য পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রচুর আদানপ্রদান ও সমন্বয় হয়েছিল এবং বহু ইংরেজের সহযোগিতায় সংস্কৃতির বিকাশ দেখা দিয়েছিল প্রাচ্য গবেষণা, গদ্যরচনা ও সাংবাদিকতায়। বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে হেয়ার, কেরি, মার্শম্যান প্রমুখ ইংরেজের দান অমূল্য। হিন্দু কলেজ গেল অন্য পথে। এখানকার চিন্তানায়ক ছিলেন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান শিক্ষক ডিরোজিও। ডিরোজিওর ছাত্রেরা 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে খ্যাতি ও কুখ্যাতি অর্জন করেন। এঁরা ছিলেন স্বাধীন চিন্তার বাহক। প্রাচ্য সমাজ ও সভ্যতা সম্বন্ধে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ইংরেজদের একটা আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু হিন্দু কলেজের বাঙালি ছাত্রেরা 'স্বাধীন চিন্তা' অবলম্বন করে প্রাচ্য ভাব ও হিন্দুত্বকে এমন ঘৃণা করতে শিখল যে তাদের কেউ কেউ খ্রিস্টধর্মী হয়ে পড়ল। এদের মধ্যে ছিলেন মধুসূদন। শিক্ষাপ্রসারে ও নারীজাগরণে বাঙালি ক্রিশ্চানদের সাহায্য হয়েছিল সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যবান। ডিরোজিও, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র ইত্যাদি—তৎকালীন বাংলায় বেশ একটা সাড়া এনে দিলেন। এঁদের রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা প্রকাশ পেল প্রধানত বক্তৃতা ও সাংবাদিকতায়। এ দুটি বস্তুরই আরম্ভ হয়েছিল রামমোহনের সময়ে এবং পরবর্তী যুগের বাঙালি ও ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতি ও দুটি বস্তুর কাছেই যথেষ্ট ঋণী।

শিক্ষাব্যাপারে ও সমাজ সংস্কারে উগ্রতা বর্জন করে আরো দুটি সমাজসেবী দল গড়ে উঠল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে। দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সভা জাতীয় ও নৈতিক চরিত্র গঠনের দিকে সমাজদৃষ্টি আকর্ষণ করল। বিদ্যাসাগর ও তাঁর অনুচরেরা নজর দিলেন শিক্ষাপ্রচার, বাংলা গদ্যরচনা, স্ত্রীশিক্ষা, বাল্যবিবাহ রোধ ও বিধবাবিবাহ প্রবর্তন প্রভৃতির দিকে।

১৮৫১ সালে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠায় দলগতভাবে রাজনৈতিক চেতনা ও আন্দোলনের চেষ্টা দেখা গেল। অবশ্য এর আগেই রামগোপাল ঘোষের অধিনায়কত্বে 'কালো আইন' আন্দোলন হয়েছিল। এইভাবে শিক্ষাবিস্তার সমাজসংস্কার ও স্বল্প রাজনৈতিক চেতনার মধ্য দিয়ে আধুনিক বাঙালি সংস্কৃতির প্রথম পর্ব শেষ হল ১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহে। সেই বছরেই স্থাপিত হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৮.৪ সারাংশ ১

আধুনিক সংস্কৃতির ব্যাপকতা ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় লোকসংস্কৃতির। আধুনিক সংস্কৃতির আত্মা হচ্ছে বৈদেশিক সভ্যতা আর বাহন হচ্ছে বিদেশি ভাষা। শত ত্রুটি সত্ত্বেও আধুনিক বাঙালি সংস্কৃতির সার সম্পদ এবং স্রষ্টা বাংলার ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু নাগরিক।

মধ্যযুগে যদিও বাংলার সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল গৌড়, নবদ্বীপ, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ, আধুনিক কালের বাঙালির সংস্কৃতি কেন্দ্রীভূত হয়েছে কলকাতায়। আধুনিক সংস্কৃতির বিরাট ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার না করেও বলা যায় যে এর ভিত্তি খুব দৃঢ় নয়। তার কারণ হচ্ছে সামাজিক জীবনের অপূর্ণতা।

দেড়শো বছরের আধুনিক সভ্যতার বিচার করলে দেখতে পাই যে পরাধীনতা ও মূলগত দুর্বলতা থাকলেও এই সংস্কৃতি সাধনা অভূতপূর্ব। এই বিরাট সাধনা সংকীর্ণতা বা প্রাদেশিকতা থেকে মুক্ত। এই বিচিত্র সাধনার মূল পাওয়া যায় পাশ্চাত্য সভ্যতার উপলব্ধি, বিজ্ঞান চর্চা, রাষ্ট্রীয় সামাজিক চেতনা, নারীজাগরণ, কলাশিল্পের সৃষ্টি, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতির মধ্যে।

এ যুগের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে বুঝতে পারলেন প্রাচ্য জীবনের অসম্পূর্ণতা, তাই তাঁরা প্রথমেই নজর দিলেন সমাজ সংস্কারের দিকে। এই যুগের বহু সাধকের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের ব্যক্তিত্ব অতুলনীয়। ধর্ম-সমাজ-শিক্ষায় সংস্কার ও জাতীয়তার উদ্রেক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর সম্পর্ক স্থাপনা ছিল রামমোহনের আদর্শ। রামমোহন সংকীর্ণতার গণ্ডি ছাড়িয়ে সব সম্প্রদায়ের মানুষকেই স্থান দিয়েছিলেন তাঁর চিত্তে। এই প্রসঙ্গে দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখযোগ্য। একটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ— এর মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রচুর আদান-প্রদান ও সমন্বয় হয়েছিল, অপরটি হল হিন্দু কলেজ— এঁদের রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা প্রকাশ পেল প্রধানত বক্তৃতা ও সাংবাদিকতায়। এই দুটি ব্যাপারই আরম্ভ হয়েছিল রামমোহনের সময়ে এবং পরবর্তী যুগে বাঙালি ও ভারতীয় সংস্কৃতি এ দুটি বস্তুর কাছে ঋণী।

দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সভা মন দিল নৈতিক চরিত্র গঠনে এবং বিদ্যাসাগর ও তাঁর অনুচরেরা মন দিলেন শিক্ষাবিস্তার, স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহরোধ ও বিধবাবিবাহ প্রচলন ইত্যাদির দিকে। ১৮৫১ সালে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রচেষ্টায় রাজনৈতিক চেতনা দেখা গেল। এইভাবে শিক্ষাবিস্তার, সমাজসংস্কার ও রাজনৈতিক চেতনার মধ্য দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতির প্রথম পর্ব শেষ হল ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে এবং সেই বছরই স্থাপিত হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৮.৫ অনুশীলনী ১

১. নীচের কথাগুলি ভুল না ঠিক, যথার্থ ঘরে টিক (✓) দিয়ে চিহ্নিত করুন। (উত্তর সংকেত ২৬ পৃষ্ঠায়)

	ঠিক	ভুল
(ক) এ যুগে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সংস্কৃতি বিলুপ্ত।	☐	☐
(খ) আধুনিক সংস্কৃতির বাহন প্রধানত বিদেশি ভাষা।	☐	☐
(গ) আধুনিক বাঙালি সংস্কৃতির স্রষ্টা বাংলার ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু নাগরিক।	☐	☐
(ঘ) আধুনিক বাঙালি সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু হল নবদ্বীপ, মুর্শিদাবাদ ও ঢাকা।	☐	☐
(ঙ) রামমোহনের গভীর বিশ্বাস ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সমন্বয়ে।	☐	☐
(চ) ধর্ম ও সমাজের সংস্কার রামমোহনের কাছে জাতীয় চেতনা থেকে পৃথক ছিল।	☐	☐
(ছ) রামমোহন ভারতীয় নবজাগৃতির প্রথম ও পূর্ণ প্রতীক।	☐	☐
(জ) বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে হেয়ার, কেরি, মার্শমান প্রমুখ ইংরেজের দান অমূল্য।	☐	☐
(ঝ) ১৮৫৭ সালে স্থাপিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।	☐	☐

২. নীচের শূন্যস্থানগুলি সঠিক উত্তর লিখে পূরণ করুন।

(ক) .... সালে ঢাকা একটি পূর্ণ .... পরিণত হয়।

(খ) মধ্যবিত্ত শ্রেণি ছিল কৃষ্টির .... ও ....।

(গ) একটি উদার বৈজ্ঞানিক মন তথা সংস্কারমুক্ত দৃষ্টির ফলস্বরূপ .... সূচনা, ... প্রথার সমাপ্তি এবং .... চিন্তাধারার প্রবর্তন হয়।

(ঘ) ইংল্যান্ডের শাসক .... সমাজেও .... ছিলেন গুরুস্থানীয় ব্যক্তি।

(ঙ) সেই সময়ে দুটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান নাম .... ও ....।

(চ) ডিরোজিও ছিলেন .... গোষ্ঠীয় পুরোধা।

(ছ) আধুনিক বাঙালি সংস্কৃতির .... সমাপ্তি ঘটে .... র সিপাহি বিদ্রোহে।

৮.৬ মূলপাঠ ২

১৮৫৭-১৯১৯ : সিপাহী বিদ্রোহ যে বাঙালি মধ্যবিত্তের সহানুভূতি পায়নি তা বোঝা যায় 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা প্রভৃতি তৎকালীন রচনা থেকে। সিপাহী বিদ্রোহের পর বাঙালি সংস্কৃতি একটু স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু চেতনা আনল ১৮৫৯-এর নীলকর আন্দোলন যার চিত্র মেলে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে। নীলকর আন্দোলনের বিশেষ মূল্য গণচেতনার আবির্ভাব।

দ্বিতীয় পর্বের মূল ধারাগুলি হল : ধর্মচেতনা, জাতীয়তাবাদ, রাজনৈতিক আন্দোলন, শিক্ষার বিস্তার ও মধুসূদন থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙালির সাহিত্যসৃষ্টি ও শিল্পগঠন।

উনিশ শতকের শেষার্ধে ধর্মান্দোলনের পুনরাবির্ভাব হল বাংলায়। এ একটি ধারার নেতা হলেন কেশবচন্দ্র এবং তাঁরই নেতৃত্বে ব্রাহ্মধর্ম সমাজসংস্কারে বিশেষ উদ্যোগী হয়ে উঠল। প্রাচীনপন্থী হিন্দু সমাজেও নিজেকে বিপন্ন মনে করে সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমনকি রাজনীতিতে হিন্দুত্বের প্রচার আরম্ভ করল। হিন্দুত্বের নেতা হলেন এ যুগে রামকৃষ্ণ, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বে ও ব্যাখ্যায় সংকীর্ণতা ছিল না; তাঁর উদার মতের ফলে হিন্দুত্বের খানিকটা সংস্কার হল। রামমোহন থেকে আরম্ভ করে দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ও শিবনাথ পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্মের যে আন্দোলন তা যে বিশেষ সময়োপযোগী হয়েছিল তাতে সন্দেহ নাই। এই আন্দোলনের চাপে বাঙালি সমাজের ও হিন্দুধর্মের সংস্কার হয়েছিল এক দিকে, অপর দিকে এর ফলে খ্রিস্টধর্মের প্রসার অনেকখানি কমে গিয়েছিল। মুসলিম ধর্মমতের প্রতিক্রিয়া দেখা গেল এই যুগে ওয়াহাবি আন্দোলনে এবং এর প্রভাব এসে পৌঁছাল রাজনীতির ক্ষেত্রেও।

রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব রোঁমা রল্যাঁর মতো পাশ্চাত্য মনীষীও স্বীকার করেছেন, কিন্তু ঐতিহাসিক মূল্য বোধ হয় বিবেকানন্দেরও কম নয়। আধ্যাত্মিক শিষ্যত্ব সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিত্ব ও ভাবধারার ফল হল অন্যরকম। রামমোহনের মতো তিনিও বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেন, কিন্তু তিনি ছিলেন ব্যাপকভাবে হিন্দুত্বের প্রতিনিধি। অবশ্য বিবেকানন্দের মধ্যে প্রাচ্য গোঁড়ামি ছিল না। পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে তুলনা করে তিনি প্রাচ্যের দোষ স্পষ্টভাবেই দেখিয়েছেন। রামকৃষ্ণের ধর্মচেতনা ছিল মূল অন্তর্মুখী, কিন্তু বিবেকানন্দ তাকে চাইলেন সামাজিক জীবনেও সার্থক করে তুলতে। ফলে আদর্শবাদী কর্মনিষ্ঠা, সমাজসেবা, দেশাত্মবোধ এবং জাতীয় চরিত্রের ভিত্তিগঠন হল (বিবেকানন্দের

মতে) একটি পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবন। এ যুগের হিন্দু মেলা আন্দোলন মূলত ধর্মান্দোলন না হলেও এর আংশিক উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুত্বের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদ প্রকাশ করা।

এদিকে রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমশই বেড়ে চলেছে এবং তার চরম উত্তেজনা এল বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই রাজনৈতিক চেতনা দলগত রূপ ধারণ করে ও বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে সন্ত্রাসবাদে পরিণত হয় এবং তার পরে প্রথম মহাযুদ্ধের অন্তে বাঙালি রাজনীতির মূল ধারা শেষ হল গান্ধীজির আবির্ভাবে।

এর মধ্যে একটি উচ্চস্তরের সাহিত্য সৃষ্ট হয়েছে এবং শিক্ষা জগতে আবির্ভাব হয়েছে আশুতোষের এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষ্টি অভিযানের। ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং বিদ্যাচর্চার ফলে শুধু বাঙালি সংস্কৃতি নয়, সারা ভারতও সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। আধুনিক সংস্কৃতির গোড়া থেকেই বাঙালির নেতৃত্ব সারা ভারতবর্ষে স্বীকৃত হয়েছিল এবং কৃষ্টির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ভারতের সর্বত্র বাঙালির অবদান ছড়িয়ে পড়ল। ভারতে বাঙালি কৃষ্টি নেতৃত্বের চূড়ান্ত অবস্থায় এসেছিল বোধহয় এই দ্বিতীয় পর্বে।

১৯১৯-১৯৪৭ : সংস্কৃতির এই পর্বে মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট স্পষ্ট হয়ে উঠলেও সাধনার ধারা নানা পথে বৈচিত্র্য লাভ করতে থাকে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ ক্রমে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির আদর্শে পরিণত হয় এবং বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্দোলন গণচেতনার সঞ্চার করে। কিন্তু এই সময় থেকেই সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতির ফলে হিন্দু মুসলমানের কৃত্রিম স্বার্থবিরোধ সাম্প্রদায়িকতার আত্মঘাতী রূপে সমস্ত জাতীয় জীবনকে দুর্বল করে ফেলতে থাকে। মুসলিম মধ্যবিত্তের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে একটা কৃত্রিম ইসলামি সংস্কৃতির সাধনা আরম্ভ হয় এবং তার ভিত্তিহীনতাও প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু তা হলেও একাধিক মুসলিম কবি ও লেখকের রচনায় বাংলায় যৌথ সংস্কৃতি অনেকদিন পরে পরিপুষ্টি লাভ করতে থাকে।

সংস্কৃতির এই পর্বে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ধারা হচ্ছে নারী-জাগরণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথম দিন থেকেই এই ধারার আরম্ভ এবং দ্বিতীয় পর্বে তার ফল স্পষ্ট দেখা যায়। ক্রিশ্চান ও ব্রাহ্ম সমাজের কাছে এ বিষয়ে বাঙালি সংস্কৃতি বিশেষভাবে ঋণী। তৃতীয় পর্বে সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে দ্রুত বর্ধমান নারী-অবদান থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, বাঙালি সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ বাঙালি মেয়েদের ওপর অনেকখানি নির্ভর করছে। এই সূত্রে এই কথাও মনে রাখা উচিত যে ভারতের নানা স্থানে বাঙালি মেয়ে আজো কৃষ্টির বাহক।

সমাজ সেবার যে ধারা রামমোহনের সময় থেকে আরব্ধ হয়ে বিবেকানন্দের যুগে প্রায় একটি ধর্মের মর্যাদা লাভ করে তার বিশেষ পরিপুষ্টি হয় তৃতীয় পর্বে এবং নানারকম সেবাপ্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কর্মসংস্কৃতি গড়ে ওঠে। অপর দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সাহিত্য পরিষদ ও অন্যান্য ছোট বড় নানা রকম সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের মধ্যেও বাঙালির মানসচর্চাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখবার চেষ্টা করে।

এই যুগের সাহিত্যিক সাধনা রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরবর্তী লেখকদের মধ্যে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে ওঠে। এর সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় দ্রুত বর্ধমান সাময়িক সাহিত্য ও সাংবাদিকতার কথা। অবশ্য শেষেরটি ভেদবুদ্ধির যুগে অনেক সময়েই সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন দিয়ে ভারতীয়তা ও সংস্কৃতির ক্ষতি করেছে। নানারকম প্রতিষ্ঠান

ও অনুষ্ঠানের কল্যাণে সংগীত, কলাশিল্প ও নৃত্য ভারতীয় ও প্রাচ্য রীতির পুনরুজ্জীবন করে নবকৃষ্টির আন্দোলন আনে। নবনাট্য রচিত হয় আর আসে নতুন অভিনয় পদ্ধতি। কথাচিত্র ও বেতারেও ভবিষ্যৎ কৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেয়। মূল সূত্রটি তাহলে হল এই যে, মধ্যবিত্ত বাঙালি পাশচাত্য সাধনার ব্যাপক উপলব্ধি প্রয়োগ করেছে সংস্কৃতির সমগ্র ক্ষেত্রে এবং তার সঙ্গে চেষ্টা করেছে প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সাধনাকে আত্মসাৎ করে তার সনাতন সংস্কৃতি সমন্বয়ের ধারাকে সার্থক করে তুলতে। তাই এই যুগের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে উদারতার অভাব হয়নি এবং আন্তর্জাতিক কৃষ্টির সূচনা হয়েছে। এর জন্য প্রধানত রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বপ্রেরণাই দায়ী এবং সারা ভারত আজো বাংলার কাছে নবকৃষ্টির জন্য ঋণী।

বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের প্রথম থেকেই বাঙালির জাতীয় জীবনের সংকট মর্মান্তক স্পষ্টতা লাভ করতে থাকে; এর প্রধান কারণ হল সাম্প্রদায়িকতা ও আর্থিক বিপর্যয়; তার পরে এল ১৯৩৯-এর মহাযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তর। ভাঙনের ষোলো কলা। কিন্তু নানারকম বিক্ষোভ ও অসন্তোষের পটভূমিতে নৈরাশ্যবাদ ও পরাজয় মনোবৃত্তির সঙ্গে গজিয়ে উঠল গণজাগরণের বিপ্লবী আদর্শবাদ আর আজ ঘূণ ধরা মধ্যবিত্ত ধীরে ধীরে এই আন্দোলন গ্রহণ করতে করতে চলেছে। এর ফল ভালো না মন্দ তার বিচার এখানে করা সম্ভব নয়; তবে একটা বিরাট ঐতিহাসিক পরিবর্তন যে আসন্ন তা ঘটনার পদক্ষেপ থেকেই বোঝা যায়। কৃষ্টির ক্ষেত্রে এর প্রাথমিক মূল্য রয়েছে লোক সংস্কৃতির বিপ্লবী পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনায়।

৮.৭ সারাংশ ২

সিপাহী বিদ্রোহ যে বাঙালি মধ্যবিত্তের সহানুভূতি পায়নি তা বোঝা যায় 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা ইত্যাদির তৎকালীন রচনা থেকে। কিন্তু চেতনা আনল 'নীলদর্পণ' নাটক। উনিশ শতকের শেষের দিকে ধর্মান্দোলনের পুনরাবির্ভাব দেখা দিল। এই আন্দোলনে হিন্দুধর্মের সংস্কার হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক কর্মনিষ্ঠা হিন্দুত্বের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ প্রকাশ করল। তারপর একদিকে রাজনৈতিক আন্দোলন অপরদিকে উচ্চস্তরীয় সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষ্টি অভিযানে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা শুধু বাঙালি সংস্কৃত নয়, সারা ভারত সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। এইভাবে গণচেতনার ফল পূর্ণস্বাধীনতার দাবিতে পরিণত হল। সংস্কৃতির এই পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে নারীজগরণ। অপরদিকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের মধ্যেও বাঙালির মানসচর্চাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখবার চেষ্টা করে। এরপর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনা ও পরবর্তী লেখকদের লেখায় ব্যাপক হয়ে ওঠে নতুন ভাবধারা। নানা প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে সংগীত, শিল্পকলা ও প্রাচ্য রীতির পুনরুজ্জীবন করে নবকৃষ্টির আন্দোলন আনে। মধ্যবিত্ত বাঙালি পাশচাত্য সাধনার ব্যাপক উপলব্ধি প্রয়োগ করেছে সংস্কৃতির সমগ্র ক্ষেত্রে এবং সেই সঙ্গে প্রাচ্যের বিভিন্ন সাধনাকে গ্রহণ করে সনাতন সংস্কৃতির সমন্বয়ের ধারাকে সার্থক করে তুলতে চেষ্টা করেছে। বিশ শতকের চতুর্থ দশক থেকেই বাঙালির জাতীয় জীবনে সংকট দেখা দিল। এর কারণ হল সাম্প্রদায়িকতা ও আর্থিক বিপর্যয়। তাছাড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও নানারকম বিক্ষোভ ও অসন্তোষের পটভূমিতে নৈরাশ্যবাদ ও পরাজয়ের মনোবৃত্তির সঙ্গে গজিয়ে উঠল বিপ্লবী আদর্শবাদ। এর ফলে লোক সংস্কৃতির বিপ্লবী পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনায় বাঙালি-জীবনে একটা ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সূচনা হল।

৮.৮ অনুশীলনী ২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন :

১. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর প্রতি প্রশ্নের নীচে দেওয়া আছে। ঐগুলির যেটি ঠিক সেটির ওপরে ঠিক (✓) দিয়ে চিহ্নিত করুন। (উত্তর সংকেত ২৭ পৃষ্ঠায়)

(ক) নীলদর্পণ নাটকটি কে রচনা করেন?
(প্যারীচাঁদ মিত্র/রামমোহন/দীনবন্ধু মিত্র)

(খ) কেশবচন্দ্র সেন কোন্ ধর্ম সংস্কারে নেতৃত্ব দেন?
(ব্রাহ্মধর্ম/প্রাচীন হিন্দুধর্ম/সনাতন ধর্ম)

(গ) প্রথম মহাযুদ্ধের অন্তে বাঙালি রাজনীতির মূলধারার সমাপ্তি ঘটে কার মহান আবির্ভাবে?
(আশুতোষ/রামকৃষ্ণ/গান্ধীজি)

(ঘ) উনিশ শতকের নারী জাগরণ ও বাঙালি সংস্কৃতি উন্নয়নের জন্য বাঙালি কোন্ সমাজের কাছে ঋণী?
(মুসলিম/ক্রিশ্চান ও ব্রাহ্মসমাজ/রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সমাজ)

(ঙ) উনিশ শতকের বহু প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যে আন্তর্জাতিক কৃষ্টির সূচনা হয় তার জন্য মূলত কার ব্যক্তিত্ব প্রেরণাই দায়ী?
(রবীন্দ্রনাথ/বিবেকানন্দ/ডিরোজিও)

(চ) কোন সময় থেকে বাঙালির জাতীয় জীবনের সংকট মর্মান্তিক স্পষ্টতা লাভ করতে থাকে?
(ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে/প্রথম মহাযুদ্ধের সময়/বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের প্রথমে)

২. নীচের মন্তব্যগুলি ঠিক না ভুল, প্রশ্নের ডান দিকের ঘরে টিক (✓) দিয়ে তা নির্ধারণ করুন।

	ঠিক	ভুল
(ক) সিপাহী বিদ্রোহের পর বাঙালি সংস্কৃতি আরো জোর কদমে এগিয়ে গিয়েছিল।	☐	☐
(খ) রামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব ও ব্যাখ্যায় সংকীর্ণতা লক্ষ করা যায় নি।	☐	☐
(গ) বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব রোঁমা রঁলার মতো পাশ্চাত্য মনীষীও স্বীকার করেছেন।	☐	☐
(ঘ) হিন্দুমেলায় আংশিক লক্ষ্য জাতীয়তাবাদ প্রকাশ করা।	☐	☐
(ঙ) সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতির ফলে হিন্দু মুসলমানের কৃত্রিম স্বার্থবিরোধ সাম্প্রদায়িকতার বীজ রোপণ করে জাতীয় জীবনকে দুর্বল করেছিল।	☐	☐
(চ) বাঙালি সংস্কৃতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তর কোনও বাধা সৃষ্টি করে নি।	☐	☐

৮.৯ সারসংক্ষেপ

বর্তমানে আধুনিক বাঙালির সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় তা অনেকাংশেই বৈদেশিক সভ্যতা প্রভাবিত এবং তার স্রষ্টা বাংলাদেশের ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু নাগরিক। মধ্যযুগে যদিও বাংলার সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ,

মুর্শিদাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি স্থান, আধুনিক বাঙালি সংস্কৃতি কিন্তু কেন্দ্রীভূত হয়েছে কলকাতায়। গত দেড়শো বছরের সংস্কৃতির বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে ত্রুটিহীন না হলেও এই সংস্কৃতির মূল পাওয়া যায় পাশ্চাত্য সভ্যতার উপলব্ধি, বিজ্ঞানচর্চা, সামাজিক চেতনা, শিল্পকলার সৃষ্টি ও সমাজ সংস্কার প্রভৃতির মধ্যে। এযুগের চিন্তনশীল ব্যক্তিরা আমাদের যুগের সাংস্কৃতিক জীবনের অসম্পূর্ণতার কথা বুঝতে পারলেন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে। আধুনিক সংস্কৃতির অগ্রদূত হিসাবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি রাজা রামমোহন রায়কে। যে জ্ঞান দেশকালের সংকীর্ণতাকে ছাড়িয়ে যায় তিনি সেই জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। অসাধারণ দূরদর্শিতার সঙ্গে সার্বভৌমিক নীতি এবং সংস্কৃতিকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখযোগ্য—একটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও অপরটি হিন্দু কলেজ। এদের মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রচুর আদান-প্রদান ও সমন্বয় ঘটেছিল। সেই সময় দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সভা এবং বিদ্যাসাগর ও তাঁর অনুচরেরা নৈতিক চরিত্রগঠন, শিক্ষার বিস্তার, নারীজাগরণ ইত্যাদি সমাজ-উন্নয়নমূলক কাজে মনোনিবেশ করলেন। তারপর ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রচেষ্টায় রাজনৈতিক চেতনা দেখা দিল। তারপর সিপাহি বিদ্রোহের পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতির প্রথম পর্বের অবসান হল।

সিপাহী বিদ্রোহ যে মধ্যবিত্ত বাঙালির সহানুভূমি পায় নি তার আভাস দেখতে পাই তৎকালীন পত্রপত্রিকায় ও সাহিত্যে। সিপাহি বিদ্রোহের পর যে সংস্কৃতি স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল, তার চেতনা ফিরে এল দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের রচনা থেকে। উনিশ শতকের শেষের দিকে আরম্ভ হল ধর্ম আন্দোলন। এই ধর্মান্দোলনের একটি ধারার নেতা হলেন কেশবচন্দ্র সেন, অপর ধারার নেতা হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্মধর্ম সমাজ সংস্কারে বিশেষ উদ্যোগী হল আর রামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বে ও ব্যাখ্যায় হিন্দুধর্মের সংস্কার হল। রামকৃষ্ণের ধর্মচেতনা ছিল মূলত অন্তর্মুখী, স্বামী বিবেকানন্দ তাকে সামাজিক জীবনে সার্থক করে তুললেন।

তারপর এদিকে বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হল তার উত্তেজনা চরমে উঠল বঙ্গভঙ্গের ফলে। রাজনৈতিক চেতনা বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে সন্ত্রাসবাদে পরিণত হল এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পর গান্ধীজির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির রাজনীতির মূল ধারা শেষ হল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষ্টি অভিযানের ফলে যে উচ্চস্তরীয় সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে তার দ্বারা শুধু বাঙালি সংস্কৃতি নয়, ভারতও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। সংস্কৃতির এই পর্বে সাধনার ধারা বৈচিত্র্য লাভ করতে থাকে, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতার আত্মঘাতী রূপ জাতীয় জীবনকে দুর্বল করলেও পরে হিন্দু মুসলমানের যৌথ রচনার সংস্কৃতি পুষ্টি লাভ করে। সংস্কৃতির এই পর্বে খ্রিস্টান ও ব্রাহ্ম সমাজ এবং নারীজগরণের ভূমিক উল্লেখযোগ্য। রামমোহন থেকে যে ধারা আরম্ভ হয় বিবেকানন্দের যুগে তা ধর্মের মর্যাদা লাভ করে ও পরে বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে কর্মসংস্কৃতি গড়ে ওঠে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের মধ্যেও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান বাঙালির মানসচর্চাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখবার চেষ্টা করে। রবীন্দ্রনাথ ও পরবর্তী লেখকদের সাহিত্যসাধনার মধ্য দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতির রূপ ব্যাপক আকার ধারণ করে একটা আন্তর্জাতিক কৃষ্টির সূচনা করেছে। বিংশ শতকের চতুর্থ দশকের প্রথম থেকেই বাঙালির জাতীয় জীবনে সংকট স্পষ্ট হয়ে উঠল সাম্প্রদায়িকতা ও আর্থিক বিপর্যয়ে।

৮.১০ অনুশীলনী ৩ (ভাষাদক্ষতা বিষয়ক)

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন :

১. নীচের প্রদত্ত পদগুলির বিপরীতার্থক শব্দ মূলপাঠ থেকে খুঁজে সঠিক উত্তরটি ডান দিকের ঘরে বসান। (উত্তর সংকেত ২৭ পৃষ্ঠায়)

যেমন : আগমন—প্রত্যাগমন

(ক) তিরোভাব		(খ) অবৈজ্ঞানিক	
(গ) পরাধীনতা		(ঘ) অপসংস্কৃতি	
(ঙ) প্রারম্ভ			

২. 'জ্ঞান' শব্দটির আগে 'বি' যোগ করলে 'বিজ্ঞান' শব্দটি তৈরি হয়। জ্ঞান বলতে যা বুঝি, 'বিজ্ঞানে' এর অর্থ একটু আলাদা। 'বি' উপাদানটিকে উপসর্গ বলা হয়। সেই রকম 'গতি'র আগে 'প্র' যোগ করে 'প্রগতি' হয়েছে। নীচে দেওয়া শব্দগুলি এইরকম উপসর্গযোগে গঠিত হয়েছে।

উপসর্গগুলিকে আলাদা করে পাশের নির্দিষ্ট ঘরে লিখুন। যেমন—বিক্রয়—বি

(ক) প্রতিক্রিয়া		(খ) অনুরাগ	
(গ) নির্লোভ		(ঘ) বিহার	
(ঙ) অভিসন্ধি		(চ) উৎকৃষ্ট	

৩. নীচের বাক্যগুলির দাগ দেওয়া পদগুলির পরিবর্তে অর্থের হানি না ঘটিয়ে একটিমাত্র পদ ব্যবহার করে বাক্যগুলিকে লিখুন।

(ক) আজকাল শহরাঞ্চলে প্রাচীন পদ্ধতি <u>প্রায় শেষ হয়েছে</u>।

(খ) বাংলা ভাষার মধ্যে অনেক <u>অন্য দেশীয়</u> ভাষা মিশে আছে।

(গ) তাঁর লেখা প্রবন্ধটি এখনো <u>পূর্ণ নয়</u>।

(ঘ) <u>সেই সময়কার</u> বাংলা চিত্র এখন আর মেলে না।

(ঙ) উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় <u>প্রথম দিক</u> থেকেই নারীজাগরণ শুরু হয়েছে।

৮.১১ উত্তর-সংকেত

অনুশীলনী ১

১. (ক) ভুল, (খ) ঠিক, (গ) ঠিক, (ঘ) ভুল, (ঙ) ঠিক, (চ) ভুল, (ছ) ঠিক, (জ) ঠিক, (ঝ) ভুল।

২. (ক) ১৯৪৭, রাজনীতিতে; (খ) বাহক, প্রচারক; (গ) ব্রাহ্মধর্মের, সতীদাহ, পাশ্চাত্য চিন্তাধারার; (ঘ) ইংরেজ, রামমোহন; (ঙ) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, হিন্দু কলেজ; (চ) ইয়ংবেঙ্গল; (ছ) প্রথম পর্বের, ১৮৫৭।

অনুশীলনী ২

১. (ক) দীনবন্ধু মিত্র, (খ) ব্রাহ্মধর্ম, (গ) গান্ধীজি, (ঘ) ক্রিশ্চান ও ব্রাহ্মসমাজ, (ঙ) রবীন্দ্রনাথের, (চ) বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের প্রথম থেকে।

২. (ক) ভুল, (খ) ঠিক, (গ) ভুল, (ঘ) ঠিক, (ঙ) ঠিক, (চ) ভুল।

৩. (ক) আবির্ভাব (খ) বৈজ্ঞানিক (গ) স্বাধীনতা (ঘ) সংস্কৃতি (ঙ) পরিসমাপ্তি।

অনুশীলনী ৩ (ভাষাদক্ষতা)

১. (ক) আবির্ভাব, (খ) বৈজ্ঞানিক, (গ) স্বাধীনতা, (ঘ) সংস্কৃতি, (ঙ) পরিসমাপ্তি।

২. (ক) প্রতি, (খ) অনু, (গ) নির্, (ঘ) বি, (চ) অভি, (ছ) উৎ।

৩. (ক) লুপ্তপ্রায়, (খ) বিদেশি, (গ) অসম্পূর্ণ, (ঘ) সেকালের, (ঙ) সূচনা।

একক ৯ ❑ আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি : দণ্ডক শবরী (অংশ)—নারায়ণ সান্যাল

গঠন

৯.১ উদ্দেশ্য
৯.২ প্রস্তাবনা
৯.৩ মূলপাঠ ১
৯.৪ সারাংশ ১
৯.৫ অনুশীলনী ১
৯.৬ মূলপাঠ ২
৯.৭ সারাংশ ২
৯.৮ অনুশীলনী ২
৯.৯ অনুশীলনী ৩ (ভাষাদক্ষতা বিষয়ক)
৯.১০ উত্তর সংকেত
৯.১১ গ্রন্থপঞ্জি

৯.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর :

- ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে যারা আদিবাসী তাদের সম্পর্কে আপনি একটা ধারণা তৈরি করে নিতে পারবেন।
- ভারতের মুরিয়া আদিবাসীদের জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আপনি আলোচনা করতে পারবেন।

৯.২ প্রস্তাবনা

মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা আর অন্ধ্র—এই তিনটি প্রদেশের কিছু সীমান্তবর্তী অঞ্চল ঘিরে রয়েছে ভারতের আদিবাসীদের বাসস্থান—বাস্তার, দণ্ডকারণ্য। এই আদিবাসীদের সমাজব্যবস্থা এবং সংস্কৃতি নিয়ে লেখা 'দণ্ডক শবরী' নারায়ণ সান্যালের একটি সুপ্রসিদ্ধ তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে কয়েকটি বিশেষ আদিবাসী সম্প্রদায় যেমন, ভাত্রা, হালবা, মাড়িয়া, মুরিয়া, পরজা, গাদাভা এবং শবর জাতিদের জীবনযাত্রার নিরপেক্ষ অথচ সহানুভূতিশীল বিবরণ রয়েছে।

এই পাঠে 'দণ্ডক শবরী' থেকে মুরিয়া জাতিদের সামাজিক নিয়মকানুন এবং ধর্মীয় উৎসব নিয়ে লেখা কিছু অংশ তুলে দেওয়া হল। এই পাঠটিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশে রয়েছে মুরিয়াদের পরিচয় এবং দ্বিতীয় অংশে আছে নাচ গানের মাধ্যমে তাদের উৎসব পালনের কথা।

৯.৩ মূলপাঠ ১

মুরিয়া : কোণ্ডাগাঁও-নারানপুর সড়কের দুই ধারে এবং কোণ্ডগাঁও-জগদলপুর ন্যাশনাল হাইওয়ের পশ্চিমধারে মুরিয়াদের বাস। জগদলপুর থেকে যে কাঁচা রাস্তাটা চলে গেছে চিত্রকোট জলপ্রপাতের দিকে তার দুপাশেও অনেকগুলি মুরিয়া গ্রাম আছে। কিন্তু তারা নিজেদের বলে রাজ-মুরিয়া, মনে করে জাত হিসাবে তারা সাধারণ মুরিয়াদের চেয়ে উন্নততর। প্রসঙ্গত বলে রাখি, গোণ্ডদের একটি উপশাখা—যারা রাজবাড়ির কাছাকাছি থাকে—তারা আত্মপরিচয় দেয় রাজ-গোন্ড বলে। মুরিয়ারা মাড়িয়াদের মতো অপরিষ্কার নয়। তার অবশ্য কারণও আছে। মাড়িয়ারা বাস করে পাহাড় অঞ্চলে—জল সেখানে দুষ্প্রাপ্য। মুরিয়ারা বাস করে সমতলে—নদীর ধারে ধারে। মুরিয়ারা যখন দল বেঁধে চলে তখন পথে কোন নদী পড়লে ওদের মন চুলবুল করে ওঠে। ছেলেরা আর মেয়েরা পৃথক হয়ে যায়, তারপর নদীর ধারে কাপড় ছেড়ে রেখে অন্তত একটা ডুব দিয়ে নেয়। মুরিয়া সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ওদের ঘটুল। অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের নৈশ-ক্লাব। না, ক্লাব নয় তার বেশি কিছু। নৈশ-ক্লাবে তথাকথিত সভ্য যুবকযুবতীর দল সমবেত হয় ইন্দ্রিয়জ সুখানুসন্ধানের আশায়। নাইটক্লাবেও খেলার ব্যবস্থা থাকে, নাচের ব্যবস্থা থাকে, খানা-পিনা এবং রোমান্সের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, সংহতির আয়োজন নেই, জ্ঞানের ব্যবস্থাপনা সেখানে অপাংক্তেয়। অপর পক্ষে ঘটুল নৈশ স্কুল নয়, এখানে খেলাধুলা এবং সামাজিক শিক্ষাব্যবস্থা পাশাপাশি আছে। ঘটুল অবিবাহিত ছেলেমেয়ে যুবক-যুবতীর যৌথ ডর্মিটারী। আসামের নাগাদেরও আছে এই ধরনের সর্বজনীন বাসগৃহ—মোরাঙ। সেখানে কিন্তু ছেলেদের মোরাঙ আর মেয়েদের মোরাঙ পৃথক গৃহ। ওরা মুরিয়াদের মতো একত্র রাত্রিবাস করে না।

তিন চার বছর বয়স পর্যন্ত মুরিয়া শিশু হচ্ছে মায়ের সম্পত্তি। তারপর সে সমাজের। ঐ বয়সেই তারা চলে যায় ঘটুলে। প্রতি গ্রামেই আছে ঘটুলগৃহ। বড় একটা হল্-কামরা, লতাপাতায় ঘেরা। ঘটুলের নিজস্ব জমি আছে, খামার আছে, ধানের গোলা আছে। ঘটুল কারও নিজস্ব সম্পত্তি নয়—গ্রামের অবিবাহিত যুবক যুবতীর একটা যৌথ খামার ও খামারবাড়ি। পাঁচ ছয় বছর বয়সে এখানে আসে ছেলেমেয়ের দল। বেরিয়ে আসে আঠারো-বিশ-বাইশে। আসে একা, ফেরে যুগলে। তা বলে আমরা যেমন ছেলেকে সৈনিক স্কুলে, মেয়েকে কনভেন্টে পাঠিয়ে তাদের খরচে খাতায় লিখে রাখি ওখানে তা হয় না। ঘটুল গ্রামেই অবস্থিত। ছেলে-মেয়েরা সন্ধ্যায় ওখানে যায়, সকালে ফিরে এসে বাড়ির কাজকর্ম করে। বাড়ির সঙ্গে তাদের নাড়ির যোগ থাকে ঠিকই। ঘটুলবাসী মুরিয়া ছেলে মেয়ের সঙ্গে আবাসিক হোস্টেলে থাকা আমাদের সন্তানের তফাতটা হচ্ছে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের ভরতপক্ষীর সঙ্গে যেন শেলীর ভরতপক্ষীর তফাত। আমাদের ছেলে সৈনিক স্কুলে গিয়ে উড়তে শেখে :

Singing still dost soar, and soaring ever singest!

ওরা ঘটুলে গেলেও বাড়ির কথা ভোলে না। বাপমায়ের সেবা করে, ঘরের কাজ করে—গৃহের দাবি আর ঘটুলের দাবি দুইদিকেই তাদের নজর থাকে :

True to the kindred points of Heaven and Home!

ঘটুলেই হয়ত ওরা জীবন-সাথী বেছে নেয়। ফিরে এসে বাপমায়ের আশীর্বাদ নেয়, গাঁও-বুড়ো প্যাটেল অথবা গাইতার অনুমতি নিয়ে ঘর বাঁধে। ঘটুলের সব সম্পত্তিই সর্বজনীন। সাম্যবাদীরা এখানে এসে শিক্ষা

নিয়ে যেতে পারেন। সমান অধিকার বিষয়ে এদের ধারণা সভ্য-মানুষের ধারণাকে অনেক পিছনে ফেলে এসেছে। এখানকার আদিবাসী পুরুষ-রমণীও সর্বজনীন সম্পত্তি। ঘটুলের মেয়েরা সবাই মোটিয়ারী—ছেলেরা সবাই 'চেলিক'। ঘটুলের নিজস্ব কর্মপরিষদ আছে। মেয়েদের প্রধান হচ্ছে 'বেলেসা',— ছেলেদের সর্বাধিনায়ক 'শিরদার'। বড় ছেলেরা ছোটদের শিখিয়ে তোলে কেমন করে চাষ করতে হয়, কেমন করে শিকার। বড় মেয়েরা ছোট মেয়েদের শিখিয়ে তোলে নানান গৃহস্থালীর কাজ। লেখা-পড়া বলতে যা বোঝায়—তা কেউ শেখে না ঘটুলে। লিখিত বর্ণমালাই নেই ওদের, কথ্যভাষা—গোন্ডি অথবা হালবি। মোটিয়ারীর কাছে চেলিক শুধু বয়-ফ্রেন্ডই নয়, আরও কিছু বেশি। সে তার দিনের কর্মসহচরই শুধু নয়—রাত্রের নর্মসহচরও। অথচ ওরা স্বামী-স্ত্রী নয়। একনিষ্ঠ নয় এ বন্ধন। কিন্তু প্রত্যেকটি মোটিয়ারী নিজ ঘটুলের কাছে একনিষ্ঠ সতীত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। সতীত্বের সংজ্ঞাটা ওদের কাছে অন্যরকম—তাই আমরা, সভ্য-জগতের মানুষ ওদের এ ব্যবস্থায় মুখ বাঁকাই। আমরা একবারও ভেবে দেখি না যে, সতীত্বের যে—সংজ্ঞাটা ওরা মেনে নিয়েছে তার মর্যাদা কি কঠিন শর্তে ওরা মেটায়। বিশেষ বিশেষ উৎসব রজনী ভিন্ন অন্য কোন ঘটুলের সব চেলিকের সঙ্গে ওরা একশয্যায় বসতে পারে না। কিন্তু নিজ ঘটুলের সব চেলিকের উপরেই তার সমান অধিকার—সব চেলিকেরই যেমন অধিকার আছে প্রতিটি মোটিয়ারীর উপর।

ঘটুল আবার দুজাতের। জোড়িদার ঘটুল আর নয়া ঘটুল। জোড়িদার ঘটুলে চেলিতে-মোটিয়ারীর দল জোড়ায় জোড়ায় থাকে। সেসব ঘটুলে প্রত্যেকটি চেলিক একজন বিশেষ মোটিয়ারীর সঙ্গে আবদ্ধ। খেলাঘরের বর-কনে ওরা। তা বলে চার-ছয় বছরের শিশু ওরা নয়। তাই খেলাঘরের বর-কনের খেলার যে অর্থ আমাদের কাছে স্বীকৃত ওদের কাছে তা নয়। অবশ্য ওদের কাছে বাকিটাও খেলা ছাড়া আর কিছু নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে মানিকলালের সঙ্গে একই ঘোড়ায় চড়তে হয়েছিল ইম্‌লি-বেগকে। ফলে মানিকলালকে তরবারি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল 'যদি আজিকার যুদ্ধে বাঁচি তবে তোমাকে বিবাহ করিব।' আজ বন্ধুর স্ত্রীকে স্কুটারের পিছনে বসিয়ে অনায়াসে আপনি টালা-টালিগঞ্জ বালি-বালিগঞ্জ করছেন। সমাজ তেড়ে আসছে না। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে সতীত্বের সংজ্ঞা বদলায়। মুরিয়া সমাজের এ ব্যবস্থাটাও মেনে নিতে যদি আপনার আমার নাকের পাশে কুঞ্চন জাগে তাহলে বুঝতে হবে দোষটা মুরিয়া সমাজের নয়, আমাদের নাকের। নয়া ঘটুলে প্রতি তিনদিন অন্তর জোড় ভাঙ্গে, জোড় বাঁধে। বেলোসা আর কোতোয়ার সেটা নিয়ন্ত্রণ করে। কড়া নজর রাখা হয় যাতে সকলের সমান অধিকারের মর্যাদা রক্ষিত হয়।

পরজা এবং ধুরওয়া—জগদলপুর আর কোন্ডাগাঁও তহশীলে প্রায় হাজার বিশেক পরজার বাস। এদের ভাষা পারজী, এদের বৈশিষ্ট্য পরজা নাচ। এ নাচ হালবারাও নাচে।

গাদাভা—গাদাভাদের চেনা যায় তাদের গানে আর কানে। এমন সুরেলা মিষ্টি গান আর কেউ গায় না। কানে পরে যে দুল তার ফাঁক দিয়ে প্রমাণ-সাইজ ডিনার প্লেড গলে যাবে অক্লেশে।

শবর—শবর শব্দটার একটা ঐতিহ্য আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলছেন শবররা বিশ্বামিত্রের পুত্র। অথচ বাল্মীকি বলেছেন, বিশ্বামিত্রকে প্রতিহত করতে বশিষ্ঠের কামধেনু সুরভির দেহ থেকে শবরজাতি মন্ত্র প্রভাবে সম্ভূত।

ঘটুলের প্রত্যেকটি পূর্ণ-সভ্যের একটা করে উপাধি থাকে। চার বছর বয়সে যখন প্রবেশার্থী হিসাবে আসে, তখন তাকে বাবা-মায়ের দেওয়া নামেই সবাই ডাকে। দু-দিন বছর তাদের ব্যাগার দিতে হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় অন্তত একখানা করে শুকনো গাছের ডাল তাকে নিয়ে আসতে হয়। কাজাঞ্জিকে দেখিয়ে সেটা জমা ঘটুলের কাঠের

ভাঁড়ারে। শীতকালে সেগুলি কাজে লাগে, প্রয়োজনে লাগে ভোজের সময়। তারপর যেদিন উপাধিদান উৎসবের আয়োজন হয়, আগেকার দিনে বহু রায়সাহেব, রায়বাহাদুরেরা যেমন কম্পিত হস্তে পয়লা জানুয়ারির খবরের কাগজ খুলতেন তেমনি কম্পিতবক্ষে হাজির হয় বালখিল্য বাহিনী। শিরদার কাউকে উপাধি দেয় 'বেলদার' কাউকে 'চৌকিদার'। ক্রমশ তাদের পদোন্নতি হয়। 'কাজাঞ্জি' তামাকের সরবরাহ করে। ঘটুলে কোন অতিথি এলে তাঁকে তামাক দিয়ে আপ্যায়ন করার দায়িত্বও কাজাঞ্জির। 'দাফেদার' আর 'বৈদার' ঘটুল-ঘর সংস্কার আর পরিচ্ছন্নতার জন্য দায়ী।

'কাণ্ডকী'র কাজ হচ্ছে অতিথি অভ্যাগতদের তদ্বির তদারক করা। 'মুন্সি' খরচপত্রের হিসাব রাখে। খোদায় মালুম, কিভাবে। যাদের লিখিত বর্ণমালা নেই, সংখ্যার লিখিত রূপ নেই, তাদের সমবায় সংস্থার ট্রেজারার থাকতে পারে এটা ধারণাই ছিল না। অথচ মুন্সিই হচ্ছে কোষাধ্যক্ষ। 'কোতোয়ারে'র কাজটা মধুর। মোটিয়ারীদের উপস্থিতি এবং তদারক করার কাজ তার। আমাদের মেয়ে হস্টেলের পুরুষ সুপারিন্টেন্ডের মতো সর্বদাই ব্যস্ত। আর সমস্ত ঘটুলের সব চেলিক-মেটিয়ারীর উপর প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন 'শিরদার' বা স্থানভেদে 'সায়দার'। প্রেসিডেন্ট নয়, ফুহ্‌রার। শিরদার সম্ভবত হিন্দি শব সর্দার-এর অপভ্রংশ। মেয়েদের ভাইস প্রেসিডেন্ট হচ্ছে 'দুলসা', আর মক্ষিরাণী 'বেলেসা'।

ক্ষেত্রবিশেষে শিরদারের চেয়ে কোতোয়ারের দাপট বেশি। এস-পি সাহেবের চেয়ে যেমন দারোগাবাবুর। ঘটুল, দু জাতের। জোড়িদার ঘটুল আর নয়া ঘটুল। জোড়িদার ঘটুলে চেলিক আর মোটিয়ারী মোটামুটি জোড় বেঁধে থাকে। যতদিন না একপক্ষের বিয়ে হয়ে যায়, অথবা কোন বিশেষ কারণে জোড় ভাঙ্গার প্রয়োজন হয়। শিরদারের সঙ্গে বেলোসা, কোতোয়ারের সঙ্গে দুলোসা ইত্যাদি। নয়া ঘটুলে তিনদিন অন্তর জোড় ভাঙ্গে, নতুন জোড় বাঁধে। সচরাচর বেলোসা কোতোয়ারের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করে কার সঙ্গে কে জোড় বাঁধবে। তবে চেলিক-মোটিয়ারীদের স্ব-ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দেবার চেষ্টা করা হয় সব ক্ষেত্রে। শুধু দেখতে হবে সকলের সমান অধিকার বজায় থাকল কিনা। যেখানে দুটি চেলিক একই মোটিয়ারীকে চাইছে সেখানে মোটিয়ারী নির্বাচনকেই গ্রহণ করা হয়। আবার যেখানে দুটি মোটিয়ারী একই চেলিকের প্রতি অনুরক্ত সেখানে চেলিকের নির্বাচনই চূড়ান্ত। শুধু এক বিষয়ে ওদের নজর খুব কড়া। লক্ষ্য রাখতে হবে, কোন চেলিক অথবা মোটিয়ারী যেন রূপহীনতার জন্য সম-অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়। ইটার্নাল ট্রায়েঙ্গেল বলে যে সমস্যার উপর গড়ে উঠেছে সভ্য দুনিয়ার সহস্রাব্দির সাহিত্য তাকে এভাবে অতি সহজেই নস্যাৎ করে ফেলেছে মুরিয়া ছেলেমেয়ের দল। কিন্তু প্রেমের গতি বড় বিচিত্র। ত্রিকোণ যদি 'হিডিয়াস হেক্সাগনের' রূপ নিতে চায় তখন সে প্রেমচক্রের চক্রান্ত ধূলিসাৎ করবার উদ্দেশ্যে বসে সুপ্রীম কাউন্সিলের সভা।

দেওয়ান, শিরদার, বেলোসা, কোতোয়ারের গোপন সভায় চূড়ান্ত বিচারে নির্ধারিত হয় সমাধান।

৯.৪ সারাংশ ১

মুরিয়ারা প্রধানত কোন্ডগাঁও জগদলপুরের বাসিন্দা। সাধারণত নদীর ধারে ধারে বাস করে বলে এরা অন্যান্য পাহাড়ি আদিবাসীদের মতো অপরিষ্কার নয়। এদের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হল 'ঘটুল'। 'ঘটুল' অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের যৌথ ডর্মিটারি। ঘটুলের মেয়েদের বলা হয় 'মোটিয়ারী' আর ছেলেদের বলা হয় 'চেলিক'। মেয়েদের আর ছেলেদের প্রধানদের যথাক্রমে 'বেলোসা' আর 'শিরদার' বলা হয়। প্রতি মুরিয়া গ্রামে ঘটুল-গৃহ থাকে যা পুরো গ্রামের সম্পত্তি। ছেলেমেয়ের দল পাঁচ-ছয় বছর বয়সে এখানে ঢোকে এবং বেরিয়ে আসে আঠারো

থেকে বাইশ বছরের মধ্যে। ঘটুলের ছোটো ছেলেমেয়েরা বড়ো সদস্যদের কাছ থেকে নানারকম কাজ শিখে নেয়, যেমন চাষ করা, শিকার করা অথবা সাধারণ গৃহস্থালির কাজ, এই ছেলেমেয়েরা অনেক ক্ষেত্রে ঘটুলেই নিজেদের জীবনসাথি বেছে নেয়। ঘটুল দুরকমের হয়। জোড়িদার ঘটুল আর নয়া ঘটুল। জোড়িদার ঘটুলে চেলিক-মোটিয়ারীর দল জোড়ায় থাকে। নয়া ঘটুলে দলের সর্দারদের নিয়ন্ত্রণে প্রতি তিনদিন অন্তর জোড় ভাঙে, জোড় বাঁধে।

৯.৫ অনুশীলনী ১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন।

১. নীচের দেওয়া বক্তব্যগুলি ঠিক না ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে (✓) চিহ্ন দিয়ে দেখান। (উত্তর সংকেত ৩৮ পৃষ্ঠায়)

	ঠিক	ভুল
(ক) মাড়িয়ারা নদীর ধারে বাস করে।	☐	☐
(খ) ঘটুলে শুধু বিবাহিত যুবক যুবতীরা থাকতে পারে।	☐	☐
(গ) আসামের নাগাদের সর্বজনীন বাসগৃহকে মোরাঙ বলা হয়।	☐	☐
(ঘ) ঘটুলের মতো মোরাঙেও ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে থাকে।	☐	☐
(ঙ) ঘটুল কারও নিজস্ব সম্পত্তি নয়।	☐	☐
(চ) সন্ধেবেলা ছেলেমেয়েরা ঘটুলে যায় এবং সকালে ফিরে এসে বাড়ির কাজকর্ম করে।	☐	☐
(ছ) ঘটুলের মেয়েরা সবাই চেলিক।	☐	☐
(জ) মেয়েদের প্রধানকে বলা হয় বেলোসা।	☐	☐
(ঝ) ঘটুলের মেয়েদের সতীত্বের সংজ্ঞা তথাকথিত সভ্য জগতের সতীত্বের সংজ্ঞার সঙ্গে মেলে।	☐	☐
(ঞ) নয়া ঘটুলে চেলিক-মোটিয়ারির দল জোড়ায় জোড়ায় থাকে।	☐	☐
(ট) কাজাঞ্জির কাজ হল তামাক সরবরাহ করা আর অতিথিকে তামাক দিয়ে আপ্যায়ন করা।	☐	☐
(ঠ) কান্ডকির দায়িত্ব হল খরচপত্রের হিসাব রাখা।	☐	☐
(ড) মুরিয়াদের প্রাচীন বর্ণমালা আছে।	☐	☐
(ঢ) কোতোয়ার মোটিয়ারিদের তদারক করে।	☐	☐
(ণ) নয়া ঘটুলে বেলোসা আর কোতোয়ার পরামর্শ করে স্থির করে কার সঙ্গে কে জোড় বাঁধবে।	☐	☐

৯.৬ মূলপাঠ ২

সাধারণভাবে বাল যায়, নারানপুর-কোন্ডাগাঁও সড়কের দক্ষিণ দিকের গ্রামগুলিতে আর কেশকল-কোন্ডাগাঁও রাস্তার, অর্থাৎ ন্যাশনাল হাইওয়ের পূর্বদিকের গ্রামগুলিতে পৌষকুলাঙ উৎসবটাই চলে বেশি। রোদ-পালানো

পৌষের প্রারম্ভেই ঘটুল দলপতিরা গাঁয়ের গাইতার সঙ্গে শলা আঁটতে বসে—কবে কোন দিকে এবার অভিযান চালানো হবে। গত বছর কোন্ কোন্ গাঁয়ে আপ্যায়নটা ভালো রকম জমেছিল সে কথা স্মরণ করবার চেষ্টা করে। সেইমতো দিন-সাতেকের একটা ভ্রমণের খসড়া তৈরি করা হয়। পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষ থেকেই নাচের মহড়া শুরু হয়ে যায়। পৌষকুলাঙ উৎসব খেয়ালখুশিতে নাচের হই-হল্লা নয়। এর সঙ্গে ধর্মের যোগাযোগ আছে। সুরে ভুল হলে, নাচের তালে ছন্দপতন হলে দেবতা রুষ্ট হন। পৌষকুলাঙ দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত উৎসব। ঘটুলের বাইরের প্রাঙ্গণে দিন সাত-দশ দিবারাত্র অভ্যাস করে নাচ আর গান, তালে তালে পা ফেলার কায়দা। বৈষ্ণবের কাছে কীর্তনের যা দাম, মুসলমানের কাছে আজান ধ্বনির যা মূল্য, রোমান-ক্যাথলিকের কাছে গির্জার সমবেত প্রার্থনা সঙ্গীতের যা অর্থ—মুরিয়ার কাছে নাচ আর গানের আবেদন তার চেয়ে এক তিল কম নয়, বোধ করি বেশি। আনন্দকে উপলব্ধি করতে পারলে জাগতিক ভয় থেকে যে মুক্তি পাওয়া যায়—এ কথা কেমন করে জানি জানতে পেরেছে মুরিয়া সমাজ। শুধু যে জানে তা নয়, মানে। দেবপূজায় ওরা কানন থেকে ফুল তোলে না, ফলের সন্ধানে ফেরে না, কলস ওদের শূন্য, ওদের শুধু তনু-তনুতে বাঁধনহারা, বন্দনা ওদের ভঙ্গিতে আর সঙ্গীতে। শুধু দেবপূজায় নয়, জীবনযাত্রার সব কাজেই ওরা নাচে আর গায়। শিকারে যাবার আগে নাচে, বিবাহ-বাসরে নাচে, আনন্দে নাচে—এমন কি, হ্যাঁ, দুঃখেও নাচে! ঘটুলের কোন সভ্য অথবা সভ্যাকে যদি শাস্তি দেওয়া হয়—এক পায়ে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, তা হলে দণ্ডভোগের মেয়াদটাকে ওরা দণ্ড-পল-ঘণ্টা-মিনিট দিয়ে প্রকাশ করে না! প্রকাশ করে নাচের ভাষায়! বলে: দুই রেলো দাঁড়িয়ে থাক একপায়ে! অপরাধী যখন একপায়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলে তখন তার বন্ধু-বান্ধবীর দল বিষাদখিন্ন বদনে নাচতে শুরু করে রেলো-রেলো নাচ। ওদের মুখ ম্লান, চোখে জল, সমবেদনায় ওদের বুকের ভিতরটা গুমরে মরে, তবু তালে তালে পা ফেলে ওরা নেচে চলে নিয়ম-মাফিক। দুই প্রস্থ রেলো-রেলো নাচ শেষ হলে অপরাধীর শাস্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে!

নাচতে ভালবাসে সবাই। সব জাতের মানুষেই। নাচতে যে জানে না সেও হঠাৎ টাকা পেলে হয়তো বেতালা নেচে নেয় কয়েক পাক। কিন্তু নাচ আর গানকে এমন ওতপ্রোতভাবে জাতীয় জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিতে আর কোন জাত পেরেছে বলে শুনিনি। নাচের তালে ভুল হওয়া, গানের সুরে বেসুরো তান—মুরিয়া সমাজে অমার্জনীয় অপরাধ।

যাত্রার পূর্বদিন সন্ধ্যায় ওরা ঘটুলের সামনে একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বালে। সেই ক্যাম্প-ফায়ারের আলোয় ঘুরে ঘুরে নাচে চেলিক মোটিয়ারীর দল। জোড়ায়-জোড়ায়, সারিতে-সারিতে, সামনে-পিছনে, ঘুরে ফিরে। অভিযানের পূর্বসন্ধ্যায় এ নাচকে বলা যেতে পারে ড্রেস-রিহার্সাল। পরদিন যাত্রা, তাই বেশি রাত পর্যন্ত পরিশ্রম করে না ওরা। এক প্রহর রাতেই নাচের আসর ভেঙ্গে যায়। শয্যাগ্রহণ করে সবাই। পরদিন অতি প্রত্যুষে ওদের কয়েকজন পাণ্ডা আসে অগ্নিকুণ্ড পরীক্ষা করতে। ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে নিবে-যাওয়া ছাইয়ের গাদায় কোন নিশাচর প্রাণীর পায়ের ছাপ পড়েছে কিনা। যদি কোন রাত্রিচর প্রাণী অথবা পথভুলো মানুষ ছাইগাদায় এসে থাকে, যদি পায়ের ছাপ দেখতে পাওয়া যায় তা হলেই সর্বনাশ!

তখন ছোটে গাইতার কাছে, গাইতা, শিহারা আর গুণিয়া পায়ের ছাপ পরীক্ষা করে বলে তার অর্থ কী। অর্থ আর কী? দেব লিঙ্গোপেন ওদের বারণ করেছেন অভিযানে বার হতে। সতর্ক করে দিচ্ছেন : যাত্রা অশুভ। ফলে অভিযান স্থগিত রাখতে হয় কিছু দিনের জন্য। ছাইগাদায় নিশাচর প্রাণীর পায়ের ছাপ হচ্ছে ওদের গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার গুপ্ত-সংকেত-ত্র্যহস্পর্শ। ফলং যাত্রানাস্তি।

আর যদি ছাইগাদা অবিকৃত থাকে? তা হলে মঙ্গলে ঊষা বুধে পা!

লিঙ্গোপেন হচ্ছেন মুরিয়া সমাজের আদি এবং আদর্শ পুরুষ। পুরুষ নয়, পুরুষোত্তম। শ্রীরামচন্দ্র, রামদাসজী অথবা শ্রীকৃষ্ণ যেমন মহাকাব্যের পৃষ্ঠা থেকে বেরিয়ে এসে মন্দিরে স্থায়ী আসন পেতেছেন, দেব লিঙ্গোপেনও তেমনি ওদের লোকগাথা ছেড়ে দেবতার আসনে উঠে বসেছেন প্রতিটি মুরিয়ার মনের মন্দিরে। তা সেই লিঙ্গোপেন এই পৌষকুলাঙ উৎসবের জনক। তিনিই প্রথম কুলাঙ অভিযানে বার হয়েছিলেন নিজ ঘটুলের চেলিকদের দলপতি হয়ে। চেলিক দলের আগে চলেছিলেন তিনি, সঙ্গে ইয়া এক কেঁদো বাঘ। পোষা বাঘ। তা সকলের তো আর পোষা বাঘ থাকে না, থাকা সম্ভবও নয়। কি করবে? এদিকে নিয়মও মেনে চলা চাই। তাই এখন দলপতি বাঘের বদলে সঙ্গে নিয়ে চলে একটা পোষা কুকুর। তার গলায় বেঁধে দেয় একটা ঘণ্টা। অভিযানের সময় প্রতিদিন ওরা পংক্তি ভোজনে বসলে সবার আগে দলপতি সেই কুকুরকে দেয় তিন মুঠি ভাত। কুকুর খাওয়া শুরু করলে তখন সবাই খেতে শুরু করে।

যাত্রার দিন সকালে চেলিক-দল গাঁয়ের গাইতার বাড়ির সামনে সমবেত হয়। এখানে সদলবলে ওরা 'কাঠিনাচ' নাচে। তারপর গাইতাকে সঙ্গে নিয়ে আসে ঘটুল-প্রাঙ্গণে। সেখানে দ্বিতীয় দফা নাচ। গ্রাম সীমান্তে এসে তৃতীয় দফা নাচ শেষ হলে গাইতা মাটির ওপর একটি গণ্ডী কেটে দেয়। তার উপর রাখে সাতটা কুশের আংটি, সাতটা তীর আর সাত মুঠি চাল। কেন? নিয়ম যে! ছেলেরা একে একে লাফ দিয়ে পার হয়ে যায় সেই গণ্ডী। এই গণ্ডী অতিক্রম করার অর্থ হল অভিযান এবার শুরু হল। উৎসবেরও শুরু হল এই সাথে। এই মুহূর্ত থেকে গ্রামে ফিরে-আসা-ইস্তক অভিযাত্রীদের সম্পূর্ণ সংযম মেনে চলতে হবে। এই সাতদিনে চেলিকরা কোন মোটিয়ারীর অঙ্গ স্পর্শ করতে পারে না। না নিজের গাঁয়ের, না ভিন গাঁয়ের।

পৌষকুলাঙ অভিযানের বিধিনিষেধ ভারি কড়া। একচুল নড়-চড় হবার উপায় নেই। এ তো আর খেয়ালখুশির আনন্দ-উৎসব নয়, এ যে দেবতার নাচ। পৌষকুলাঙ অভিযানে যায় শুধু ছেলেরাই, মেয়েরা পড়ে থাকে গ্রামে।

চৈত-দাণ্ডার উৎসবে কিন্তু ধর্মের আমেজটা কম। আনন্দই যেন তার মূল উৎস। চৈত-দাণ্ডার উৎসবে তাই বিধি-নিষেধের কড়াকড়িটাও কম। পৌষকুলাঙের সঙ্গে এর সাদৃশ্যটা খুব বেশি। এ ক্ষেত্রেও ওরা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে গ্রাম থেকে সাত-দশদিনের মতো। সেজে-গুজে নেচে বেড়ায় গ্রাম থেকে গ্রামে। আশ্রয় নেয় ভিন গাঁয়ের ঘটুলে। দাণ্ডার নাচ বা কাঠি-নাচটাই চলে বেশি। যাত্রার আগে ওরা দল বেঁধে আসে গ্রামদেবীর কাছে। তাঁকে কিছু মধুক উৎসর্গ করে বলে : হে মাটিলাল, হে তাল্লুর-মট্টাই, তোমার নাম নিয়ে আমরা যাত্রা করছি, আমরা অবোধ শিশু। তুমি আমাদের বিপদে আপদে রক্ষা কর।

তারপর আসে গাইতার বাড়ি। গাইতা তার বাড়ির সামনে একটা গর্ত খোঁড়ে— তার মধ্যে ফেলে দেয় একটা কুশের আংটি। পুঁতে দেয় শিমূলের একটা চারা—মাটি চাপা দেয়। দেব ভীমূল পেনের নামে কিছু মহুয়া উৎসর্গ করে। গাইতার অনুমতি নিয়ে তারপর ওরা বেড়িয়ে পড়ে।

পৌষকুলাঙ আর চৈত-দাণ্ডার উৎসবের মূল হচ্ছে পাশাপাশি গ্রামের মধ্যে সদ্ভাব রাখা, ভাবের আদান-প্রদান করা। মুরিয়া সমাজের বাইরে থেকে কোন আক্রমণ এলে যাতে ওরা সঙঘবদ্ধভাবে তা প্রতিহত করতে পারে তাই এভাবে ওরা পাশাপাশি গাঁয়ের তারুণ্যের একটা বোঝাপড়ার ব্যবস্থা করেছে। এছাড়া ওদের বিশ্বাস এভাবে ওদের ছেলেমেয়েরা আত্মনির্ভর হতে শেখে। পৌষকুলাঙ উৎসবের সঙ্গে চৈত-দাণ্ডারের সবচেয়ে বড় বৈসাদৃশ্য হচ্ছে, প্রথমটি সম্পূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান, তাতে শুধু ছেলেরাই অংশ নিতে পারে, মেয়েরা নয়। অপর পক্ষে চৈত-দাণ্ডার হচ্ছে অনেকটা আমাদের রং-দোলের মতো। মূল সুরটা ধর্মের হলেও আনন্দ উৎসবটা

গৌণ নয়। তাই চৈত-দাণ্ডারে শুধু ছেলেরা নয়, ছেলেমেয়ে একই দলে অভিযানে বের হয়। পৌষকুলাঙ উৎসবের সাতদিন কোন চেলিক কোন মোটিয়ারীর অঙ্গ স্পর্শ করতে পারে না। ধর্মের নিষেধ। চৈত-দাণ্ডারে, সে নিষেধ নেই। চৈত-দাণ্ডারে শুধু নিজে দলের নয়, ভিন গাঁয়ের কোন মোটিয়ারীর সঙ্গেও ওরা মিতালি করে, মন-দেওয়া-নেওয়া করে, সুযোগ হলে হয়তো আরও কিছু করে। বাধা নেই। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় আমরা যেমন স্বল্প পরিচিতা কিংবা সম্পূর্ণ অপরিচিতা মেয়ের মুখে রং লাগাতে পারি, তাতে অন্তত একবেলার মত সামাজিক অনুশাসন চোখ বুজে থাকে—ওদেরও তেমনি এ উৎসবটা বাঁধনছেঁড়া! তফাৎ শুধু এই যে, আমরা রং-দোলের পরদিন খবরের কাগজ খুলে দেখি, সভ্য শহরে মানুষ এই উৎসবের সুযোগে একাধিক ক্ষেত্রে শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। জোর করে রং দিতে গিয়ে মেয়েদের শ্লীলতাহানি করা হয়েছে, তাদের ব্লাউজ টেনে ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের কাঁদানো হয়েছে। অসভ্য মুরিয়াদের মধ্যে সেটা দেখা যায়না। মোটিয়ারীদের ওরা কাঁদায় না—বলপ্রয়োগ করার প্রয়োজনই হয় না। মেয়েরা স্বেচ্ছায় ধরা দেয়—যেখানে না দেয় ওরা সেখান থেকে সরে আসে অন্য কারও কাছে। শৃঙ্খল যদি না থাকে তা হলে উচ্ছৃঙ্খলতা শব্দটা অভিধানে ঠাঁই পায় না যে। ভদ্রতার মুখোশ যারা পরে সেই দিবারাত্র, মনের আদিম পশুটাকে যাদের আড়াল করে রাখতে হয় না দেঁতো হাসির পর্দার আড়ালে, তাদের আবার স্বরূপ বেরিয়ে পড়ার ভয় কিসের? প্রকৃতি নিত্য সাজে নানান সাজে—সে সাজে আর যাই থাক, ন্যাংটো হয়ে পড়ার ভয় অন্তত নেই!

পৌষকুলাঙ আর চৈত-দাণ্ডারের আর এক রূপান্তর হচ্ছে দেওয়ালি উৎসব। আশ্বিন-কার্তিক মাসে হলেও এর সঙ্গে হিন্দু-উৎসব দেওয়ালির কিন্তু কোন সম্পর্ক নেই। দেওয়ালি সচরাচর শুক্লপক্ষেই হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে শুধু মেয়েরাই দল বেঁধে বার হয় অভিযানে। ছেলেরা পড়ে থাকে গ্রামে। অর্থাৎ ব্যবস্থাটা পৌষকুলাঙের বিপরীত অবস্থা। যাত্রার পূর্বদিন গাঁয়ের চেলিকদল মেয়েদের একটা ভোজ দেয়। সান্ধ্য খানাপিনার পর পরদিন গাইতার অনুমতি নিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়ে পিকনিকে—কিংবা বলা যেতে পারে হাইকিঙে। বেলোসার নেতৃত্বে। বেলোসা হচ্ছে মোটিয়ারীদের নেত্রী। ঘটুলের মক্ষিরাণী। পৌষ-কুলাঙে ছেলেদের যত বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়, দেওয়ালি উৎসবে মেয়েদের অতটা মানতে হয় না। পৌষকুলাঙে মাদকদ্রব্যের ব্যবহারটা কম, ক্ষেত্রবিশেষে একবারে বারণ। চৈত-দাণ্ডার অথবা দেওয়ালিতে সান্ধ্য মজলিশে রঙের নেশায় ওরা রঙিন হয়। অজানা গাঁয়ে অচেনা মেয়ের সঙ্গে মিতালি করতে হলে মধুকের প্রয়োজনীয়তা কে অস্বীকার করবে? অপরিচয়ের রুদ্ধদুয়ার খুলবার ঐটিই তো চাবিকাঠি।

৯.৭ সারাংশ ২

পৌষকুলাঙ মুরিয়াদের একটি প্রধান ধর্মীয় উৎসব। এই সময় এরা দল বেঁধে অন্য গ্রামে গিয়ে নাচ গানের মাধ্যমে উৎসব পালন করে। এই সব নাচ গানের নিয়ম বেশ কড়া—একটু বেসুরো অথবা ছন্দপতন হলেই দেবতা রুষ্ট হন। তাই বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই এর মহড়া শুরু হয়ে যায়। মুরিয়ারা শুধু দেবপূজায় নয়, জীবনযাত্রার সব কাজেই নাচে আর গায়। নাচ-গান এদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পৌষকুলাঙ যাত্রার আগের সন্ধ্যায় এরা ঘটুলের সামনে অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে তার আলোয় ঘুরে ঘুরে নাচে। পরদিন সকালে যদি অগ্নিকুণ্ডের ছাইগাদায় কোনো রাত্রিচর প্রাণী অথবা মানুষের পায়ের ছাপ পাওয়া যায় তাহলে সেটা অশুভ বলে মনে করা হয়। পৌষকুলাঙ অভিযানে শুধু চেলিকরাই যায়। মোটিয়ারীরা গ্রামে থাকে।

চৈত-দাণ্ডার উৎসবে ধর্মের আমেজটা কম, আনন্দই তার মূল উৎস। এ ক্ষেত্রেও ওরা দল বেঁধে কিছু দিনের জন্য নেচে বেড়ায় গ্রাম থেকে গ্রামে। এই উৎসবে শুধু চেলিকরাই নয়, মোটিয়ারীরাও অংশ গ্রহণ করে। পৌষকুলাঙ উৎসবে সাতদিন কোন চেলিক কোনও মোটিয়ারীর অঙ্গস্পর্শ করতে পারে না—কারণ ধর্মের নিষেধ। চৈত-দাণ্ডারে সে নিষেধ নেই। চৈত-দাণ্ডারে শুধু নিজের দলের নয়, অন্য গ্রামের মোটিয়ারীর সঙ্গে মিতালি করার বাধা নেই। পৌষকুলাঙ আর চৈত-দাণ্ডার উৎসবের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পাশাপাশি গ্রামের মধ্যে সদ্ভাব রাখা, ভাবের আদান-প্রাদন করা।

দেওয়ালি উৎসব হিন্দুদের দেওয়ালি থেকে মেজাজে আলাদা। আদিবাসীরা সাধারণত শুক্লপক্ষেই দেওয়ালি পালন করে। এ ক্ষেত্রে মেয়েরা অভিযানে বের হয়। ছেলেরা গ্রামে পড়ে থাকে।

৯.৮ অনুশীলনী ২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন।

১. নীচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। সঠিক উত্তরটি ডানদিকে দেওয়া চারটি সম্ভাব্য উত্তর থেকে বেছে টিক চিহ্ন (✓) দিন। (উত্তর-সংকেত ৩৮ পৃষ্ঠায়)

(ক) পৌষকুলাঙ উৎসব	(১) দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত উৎসব।
	(২) মূলত আনন্দের উৎসব।
	(৩) ফসল কাটার উৎসব।
	(৪) উপরের তিনটির কোনোটিই নয়।
(খ) মুরিয়ারা	(১) শুধু শিকারে যাবার আগে নাচে।
	(২) শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নাচে।
	(৩) শুধু আনন্দে নাচে।
	(৪) সব অনুষ্ঠানে, এমনকী দুঃখেও নাচে।
(গ) নাচের তালে ভুল হওয়া মুরিয়া সমাজে	(১) অপরাধ নয়।
	(২) অমার্জনীয় অপরাধ।
	(৩) হামেশাই ঘটে।
	(৪) উপরের তিনটির কোনোটিই নয়।
(ঘ) অগ্নিকুণ্ড জ্বালা হয় পৌষকুলাঙ যাত্রার	(১) আগের দিন সকালে।
	(২) দিন সকালে।
	(৩) দুদিন আগে বিকেলে।
	(৪) উপরের তিনটির কোনোটিই নয়।
(ঙ) ছাইগাদায় পায়ের ছাপ পাওয়া গেলে তা	(১) শুভ লক্ষণ
	(২) অভিযানে যাওয়ার নির্দেশ।
	(৩) অভিযান স্থগিত রাখার নির্দেশ।
	(৪) কোনো কিছুর সংকেত নয়।

১. নীচের দেওয়া বক্তব্যগুলি ঠিক না ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে দেখান।

	ঠিক	ভুল
(ক) লিঙ্গোপেন মুরিয়া সমাজের আদি এবং আদর্শ পুরুষ	☐	☐
(খ) লিঙ্গোপেন অভিযানে বেরোবার সময় একটি পোষা বাঘ সঙ্গে নিয়ে চলতেন।	☐	☐
(গ) আজকালকার মুরিয়ারাও অভিযানে বেরোবার সময় সবসময়ই একটি পোষা বাঘ নিয়ে চলেন।	☐	☐
(ঘ) পৌষকুলাঙ অভিযানের নিয়মকানুন বেশ কড়া।	☐	☐
(ঙ) চৈত-দাণ্ডার উৎসবেও অভিযানের বিধিনিষেধ বেশ কড়া।	☐	☐
(চ) দাণ্ডার-নাচ আসলে কাঠিনাচেরই আরেকটা নাম।	☐	☐
(ছ) পৌষকুলাঙ উৎসবে শুধু মোটিয়ারীরাই যেতে পারে।	☐	☐
(জ) পৌষকুলাঙ আর চৈত-দাণ্ডার উৎসবের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পাশাপাশি গ্রামের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করা।	☐	☐
(ঝ) চৈত-দাণ্ডার উৎসবের সাত দিন কোনো চেলিক কোনো মোটিয়ারির অঙ্গ স্পর্শ করতে পারে না।	☐	☐
(ঞ) দেওয়ালি উৎসবে শুধু চেলিকরাই দল বেঁধে অভিযানে বার হয়।	☐	☐

৯.৯ অনুশীলনী ৩ (ভাষাদক্ষতা বিষয়ক)

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন।

১. মূলপাঠ থেকে দশটি এমন শব্দ খুঁজে বার করুন যা আরবি-ফারসি থেকে নেয়া।
(উত্তর সংকেত ৩৮ পৃষ্ঠায়)

(ক) .... (চ) ....

(খ) .... (ছ) ....

(গ) .... (জ) ....

(ঘ) .... (ঝ) ....

(ঙ) .... (ঞ) ....

২. আমরা জানি যে কিছু শব্দের আগে 'অ' জুড়ে সেই শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ পাওয়া যায়। যেমন, অ + বিচলিত = অবিচলিত। মূল পাঠ থেকে আটটি এরকম শব্দ বার করে তাই দিয়ে বাক্য রচনা করুন।

(ক)

বাক্য :

(খ)

বাক্য :

(গ)

বাক্য :

(ঘ)

বাক্য :

(ঙ)

বাক্য :

(চ)

বাক্য :

(ছ)

বাক্য :

(জ)

বাক্য :

৩. শব্দের আগে ফারসি থেকে 'বে' যোগ করেও বিপরীতার্থক শব্দ পাওয়া যায়। যেমন, বে + হিসাবি = বেহিসাবি। মূল পাঠে এরকম দুটি শব্দ আছে। সেগুলি খুঁজে বার করুন। 'র' যোগ করে আরো ছয়টি শব্দ লিখুন।

মূলপাঠ :	**আরো ছয়টি বে-যুক্ত শব্দ**	
(ক)	(ক)	(খ)
(খ)	(গ)	(ঘ)
	(ঙ)	(চ)

৯.১০ উত্তর সংকেত

অনুশীলী ১

১. (ক) ভুল, (খ) ভুল, (গ) ঠিক, (ঘ) ভুল, (ঙ) ঠিক, (চ) ঠিক, (ছ) ভুল, (জ) ঠিক, (ঝ) ভুল, (ঞ) ভুল, (ট) ঠিক, (ঠ) ভুল, (ড) ভুল, (ঢ) ঠিক, (ণ) ঠিক।

অনুশীলনী ২

১. (ক) ১, (খ) ৪, (গ) ২, (ঘ) ৪, (ঙ) ৩।

২. (ক) ঠিক, (খ) ঠিক, (গ) ভুল, (ঘ) ঠিক, (ঙ) ভুল, (চ) ঠিক, (ছ) ভুল, (জ) ঠিক, (ঝ) ভুল, (ঞ) ভুল।

অনুশীলনী ৩

১. (ক) মফিক(চ) মালুম

(খ) মেয়াদ	(ছ) খরচ
(গ) দফা	(জ) কায়দা
(ঘ) খেয়ালখুশি	(ঝ) শুরু
(ঙ) মজলিশ	(ঞ) কাগজ

২. (ক) অবিবাহিত

(খ) অপরিষ্কার

(গ) অমার্জনীয়

(ঘ) অবিকৃত

(ঙ) অপরাজিতা

(চ) অজানা

(ছ) অচেনা

(জ) অপাংক্তেয়

৩. মূলপাঠ

(ক) বেতালা

(খ) বেসুরো

অন্য ছয়টি বে-যুক্ত শব্দ :

(ক) বেহায়া

(খ) বেনামি

(গ) বেকসুর

(ঘ) বেআক্কেল

(ঙ) বেইজ্জত

(চ) বেতার

৯.১১ গ্রন্থপঞ্জি

নারায়ণ সান্যাল : *দণ্ডক শবরী*।

একক ১০ ❑ উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু—জগদীশচন্দ্র বসু

গঠন

১০.১ উদ্দেশ্য

১০.২ প্রস্তাবনা

১০.৩ মূলপাঠ

১০.৪ সারাংশ

১০.৫ অনুশীলনী ১

১০.৬ অনুশীলনী ২ (ভাষাদক্ষতা বিষয়ক)

১০.৭ উত্তর সংকেত

১০.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১০.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- বৈজ্ঞানিক বিষয়টিকে সাহিত্যের মাধ্যমে উপভোগ করতে পারবেন।

১০.২ প্রস্তাবনা

বাঙালিদের মধ্যে জগদীশচন্দ্র বসু সমগ্র জগতে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের নাম প্রথম গৌরবের আসনে বসান। জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। অন্যান্য নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে তিনি উদ্ভিদের প্রাণের অস্তিত্ব প্রমাণ করনে। জগদীশচন্দ্রের ভাষায় বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার সঙ্গে সাহিত্যের এক সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে। তিনি জন্মেছিলেন ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। এই রচনা পড়ে আমরা প্রকৃতি সম্পর্কে আরো সচেতন হতে পারি।

১০.৩ মূলপাঠ

মৃত্তিকার নীচে অনেক বীজ লুকাইয়া থাকে। মাসের পর মাস এইরূপে কাটিয়া গেল। শীতের পর বসন্ত আসিল। তারপর বর্ষার আরম্ভে দুই-এক দিন বৃষ্টি হইল। এখন আর লুকাইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। বাহির হইতে কে যেন শিশুকে ডাকিয়া বলিতেছে, "আর ঘুমাইও না, উপরে উঠিয়া আইস, সূর্য্যের আলো দেখিবে।" আস্তে আস্তে বীজের ঢাকনাটি খসিয়া পড়িল, দুইটি কোমল পাতার মধ্য হইতে অঙ্কুর বাহির হইল। অঙ্কুরের এক অংশ নীচের দিকে গিয়া দৃঢ় রূপে মাটি ধরিয়া রহিল, আর এক অংশ মাটি ভেদ করিয়া উপরে উঠিল।

তোমরা কি অঙ্কুর উঠিতে দেখিয়াছ? মনে হয় শিশুটি যেন ছোট মাথা তুলিয়া আশ্চর্য্যের সহিত নূতন দেশ দেখিতেছে।

গাছের অঙ্কুর বাহির হইলে যে অংশ মাটির ভিতর প্রবেশ করে, তাহার নাম মূল। আর যে অংশ উপরের দিকে বাড়িতে থাকে, তাহাকে বলে—কাণ্ড। সকল গাছেই "মূল" আর "কাণ্ড" এই দুই ভাগ দেখিবে। এই এক আশ্চর্য্যের কথা; গাছকে যেরূপেই রাখ, মূল নীচের দিকে ও কাণ্ড উপরের দিকে যাইবে। একটি টবে গাছ ছিল। পরীক্ষা করিবার জন্য কয়েক দিন ধরিয়া টবটিকে উল্টা করিয়া ঝুলাইয়া রাখিলাম। গাছের মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়া রহিল, আর শিকড় উপরের দিকে রহিল। দুই-এক দিন পর দেখিতে পাইলাম যে, গাছ যেন টের পাইয়াছে। তাহার সব ডালগুলি বাঁকা হইয়া উপরের দিকে উঠল ও মূলটি ঘুরিয়া নীচের দিকে নামিয়া গেল। তোমরা অনেকে শীতকালে অনেক বার মূল কাটিয়া শয়তা করিয়া থাকিবে। দেখিয়াছ, প্রথমে শয়তার পাতাগুলি ও ফুল নীচের দিকে থাকে। কিছুদিন পরে দেখিতে পাওয়া যায়, পাতা ও ফুলগুলি উপর দিকে উঠিয়াছে।

আমার যেরূপ আহার করি, গাছও সেইরূপ আহার করে। আমাদের দাঁত আছে, আমরা কঠিন জিনিষ খাইতে পারি। ছোট ছোট শিশুদের দাঁত নাই; তাহারা কেবল দুধ খায়। গাছেরও দাঁত নাই, সুতরাং তাহারা কেবল জলীয় দ্রব্য কিংবা বাতাস হইতে আহার গ্রহণ করিতে পারে। মূল দ্বারা মাটি হইতে গাছ রস শোষণ করে। চিনিতে জল ঢালিলে চিনি গলিয়া যায়। মাটিতে জল ঢালিলে মাটির ভিতরের অনেক জিনিষ গলিয়া যায়। গাছ সেই সব জিনিষ আহার করে। গাছের গোড়ায় জল না দিলে গাছের আহার বন্ধ হইয়া যায় ও গাছ মরিয়া যায়।

অণুবীক্ষণ দিয়া অতি ক্ষুদ্র পদার্থও দেখিতে পাওয়া যায়। গাছের ডাল কিংবা মূল এই যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, গাছের মধ্যে হাজার হাজার নল আছে। এইসব নল দ্বারা মাটি হইতে গাছের শরীরে রস প্রবেশ করে।

এ ছাড়া গাছের পাতা বাতাস হইতে আবার সংগ্রহ করে। পাতার মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট মুখ আছে। অণুবীক্ষণ দিয়া এই সব মুখে ছোট ছোট ঠোঁট দেখা যায়। যখন আহার করিবার আবশ্যক হয় না তখন ঠোঁট দুইটি বুজিয়া যায়। আমরা যখন শ্বাস-প্রশ্বাস করি তখন প্রশ্বাসের সঙ্গে একপ্রকার বিষাক্ত বায়ু বাহির হইয়া যায়; তাহাকে অঙ্গারক বায়ু বলে। ইহা যদি পৃথিবীতে জমিতে থাকে তবে সকল জীবজন্তু অল্পদিনের মধ্যে এই বিষাক্ত বায়ু গ্রহণ করিয়া মরিয়া যাইতে পারে। বিধাতার করুণার কথা ভাবিয়া দেখ। যাহা জীবজন্তুর পক্ষে বিষ, গাছ তাহাই আহার করিয়া বাতাস পরিষ্কার করিয়া দেয়। গাছের পাতার উপর যখন সূর্যের আলোক পড়ে তখন পাতাগুলি সূর্যের তেজের সাহায্যে অঙ্গারক বায়ু হইতে অঙ্গার বাহির করিয়া লয়। এই অঙ্গার গাছের শরীরে প্রবেশ করিয়া গাছকে বাড়াইতে থাকে। গাছেরা আলো চায়, আলো না হইলে ইহারা বাঁচিতে পারে না। গাছের সর্বপ্রধান চেষ্টা, কি করিয়া একটু আলো পাইবে। যদি জানালার কাছে টবে গাছ রাখ তবে দেখিবে, সমস্ত ডালগুলি অন্ধকার দিক ছাড়িয়া আলোর দিকে যাইতেছে। বনে যাইয়া দেখিবে, গাছগুলি তাড়াতাড়ি মাথা তুলিয়া, কে আগে আলোক পাইতে পারে তাহার চেষ্টা করিতেছে। লতাগুলি ছায়াতে পড়িয়া থাকিলে আলোর অভাবে মরিয়া যাইবে; এইজন্য তাহারা গাছ জড়াইয়া ধরিয়া উপরের দিকে উঠিতে থাকে।

এখন বুঝিতে পারিতেছ, আলোই জীবনের মূল। সূর্যের কিরণ শরীরে ধারণ করিয়াই গাছ বাড়িতে থাকে। গাছের শরীরে সূর্যের কিরণ আবদ্ধ হইয়া আছে। কাঠে আগুন ধরাইয়া দিলে যে আলো ও তাপ বাহির হয়, তাহা সূর্যেরই তেজ। গাছ ও তাহার শস্য আলো ধরিবার ফাঁদ। জন্তুরা গাছ খাইয়া পরাণ ধারণ করে; গাছে

যে সূর্যের তেজ আছে তাহা এই প্রকারে আবার জন্তুর শরীরে প্রবেশ করে। শস্য আহার না করিলে আমরাও বাঁচিতে পারিতাম না। ভাবিয়া দেখিতে গেলে, আমরাও আলো আহার করিয়া বাঁচিয়া আছি।

কোনও কোনও গাছ এক বৎসরের পরেই মরিয়া যায়। সব গাছই মরিবার পূর্বে সন্তান রাখিয়া যাইতে ব্যগ্র হয়। বীজগুলিই গাছের সন্তান। বীজ রক্ষা করিবার জন্য ফুলের পাপড়ি দিয়া গাছ একটি ক্ষুদ্র ঘর প্রস্তুত করে। গাছ যখন ফুলে ঢাকিয়া থাকে তখন কেমন সুন্দর দেখায়! মনে হয়, গাছ যেন হাসিতেছে। ফুলের ন্যায় সুন্দর জিনিস আর কি আছে? গাছ তো মাটি হইতে আবার লয়, আর বাতাস হইতে অঙ্গার আহরণ করে; এই সামান্য জিনিস দিয়া কি করিয়া এরূপ সুন্দর ফুল হইল? গল্পে শুনিয়াছি, স্পর্শমণি নামে একপ্রকার মণি আছে; তাহা ছোঁয়াইলে লোহা সোনা হইয়া যায়। আমার মনে হয়, মাতার স্নেহই সেই মণি। সন্তানের উপর ভালোবাসাটাই যেন ফুল ফুটিয়া উঠে। ভালবাসার স্পর্শেই যেন মাটি এবং অঙ্গার ফুল হইয়া যায়।

গাছে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে দেখিলে আমাদের মনে কত আনন্দ হয়! বোধ হয়, গাছেরও যেন কত আনন্দ! আনন্দের দিনে আমরা দশজনকে নিমন্ত্রণ করি। ফুল ফুটিলে গাছও তাহার বন্ধু-বান্ধবদিগকে ডাকিয়া আনে। গাছ যেন ডাকিয়া বলে, "কোথায় আমার বন্ধু-বান্ধব, আজ আমার বাড়িতে এস। যদি পথ ভুলিয়া যাও, বাড়ি যদি চিনিতে না পার, সেজন্য নানা রঙের ফুলের নিশান তুলিয়া দিয়াছে। এই রঙিন পাপড়িগুলি দূর হইতে দেখিতে পাইবে।" মৌমাছি ও প্রজাপতির সহিত গাছের চিরকাল বন্ধুতা। তাহারা দলে দলে ফুল দেখিতে আসে। কোন কোন পতঙ্গ দিনের বেলায় পাখির ভয়ে বাহির হইতে পারে না। পাখি তাহাদিগকে দেখিলেই খাইয়া ফেলে, কাজেই রাত্রি না হইলে তাহারা বাহির হইতে পারে না। সন্ধ্যা হইলেই তাহাদিগকে আনিবার জন্য ফুল চারিদিকে সুগন্ধ বিস্তার করে।

গাছের ফুলের মধ্যে মধু সঞ্চয় করিয়া রাখে। মৌমাছি ও প্রজাপতি সেই মধু পান করিয়া যায়। মৌমাছি আসে বলিয়া গাছেরও উপকার হয়। ফুলে তোমরা রেণু দেখিয়া থাকিবে। মৌমাছিরা এক ফুলের রেণু অন্য ফুলে লইয়া যায়। রেণু-ভিন্ন বীজ পাকিতে পারে না।

এইরূপে ফুলের মধ্যে বীজ পাকিয়া থাকে। শরীরে রস দিয়া গাছ বীজগুলির লালনপালন করিতে থাকে। নিজের জীবনের জন্য এখন আর মায়া করে না। তিল তিল করিয়া সন্তানের জন্য সমস্ত বিলাইয়া দেয়। যে শরীর কিছু দিন পূর্বে সতেজ ছিল এখন তাহা একেবারে শুকাইয়া যাইতে থাকে। শরীরের ভার বহন করিবারও আর শক্তি থাকে না। আগে বাতাস হু-হু করিয়া পাতা নড়াইয়া চলিয়া যাইত। পাতাগুলি বাতাসের সঙ্গে খেলা করিত, ছোট ডালগুলি তালে তালে নাচিত। এখন শুষ্ক গাছটি বাতাসের ভর সহিতে পারে না। বাতাসের এক-একটি ঝাপটা লাগিলে গাছটি থর-থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। একটি একটি করিয়া ডালগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে। শেষে একদিন হঠাৎ গোড়া ভাঙ্গিয়া গাছ মাটিতে পড়িয়া যায়।

এইরূপে সন্তানের জন্য নিজের জীবন দিয়া গাছ মরিয়া যায়।

১০.৪ সারাংশ

মাটির নীচে যে বীজ থাকে বর্ষার আরম্ভে তার আবরণ খুলে অঙ্কুর বের হয়। অঙ্কুরের এক অংশ নীচের দিকে, আর এক অংশ মাটির উপরে ওঠে। নীচের অংশ মূল, উপরের অংশ কাণ্ড। কাণ্ড সব সময় উপর দিকে ওঠে। মাটির ভিতর থেকে গাছ রস শোষণ করে। গাছের গোড়ায় জল না দিলে গাছের আহার বন্ধ

হয়ে গাছ মরে যায়। অণুবীক্ষণে দেখা যায় গাছের মধ্যে হাজার হাজার নল আছে, তার দ্বারা মাটি থেকে গাছের শরীরে রস প্রবেশ করে। গাছের পাতা বাতাস থেকে আবার সংগ্রহ করে। প্রাণীর প্রশ্বাসে বিষাক্ত অঙ্গারক বের হয়। সূর্যের তেজের সাহায্যে গাছ অঙ্গারক থেকে অঙ্গার সংগ্রহ করে খাদ্য নেয়। আলো না হলেও গাছ বাঁচতে পারে না। আলো পাবার জন্য গাছের সঙ্গে গাছের প্রতিযোগিতা চলে। আলোই জীবনের মূল। আমাদের আহার্য শস্যও রূপান্তরিত আলো। কোনো কোনো গাছ একবছর বাঁচে, কোনো গাছ বেশি দিন। গাছের ফুল থেকে আবার বীজ হয়। বীজগুলি গাছের শরীর থেকে পেকে গেলে গাছ মরে যায়। বীজ গাছের সন্তানের মতো। সন্তানের জন্ম দিয়ে গাছ যেন সন্তানের নিজের জীবন দিয়ে মরে যায়। অঙ্গারকের ইংরেজি নাম কার্বন-ডাই-অক্সাইড।

১০.৫ অনুশীলনী ১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর হয়ে গেলে ৪৪ পাতার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. নিম্নলিখিত মতগুলি ঠিক না ভুল, নির্ধারিত ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে দেখান।

	ঠিক	ভুল
(ক) সাহিত্য ও বিজ্ঞান পরস্পর বিরোধী নয়।	☐	☐
(খ) বর্ষার আরম্ভে বীজ অঙ্কুরিত হয়।	☐	☐
(গ) কাণ্ড মাটির নীচে থাকে।	☐	☐
(ঘ) মূল দ্বারা গাছ মাটি থেকে রস শোষণ করে।	☐	☐
(ঙ) গাছের গোড়ায় জল দিলে গাছের আহার বন্ধ হয়ে যায়।	☐	☐

২. ডানদিকে দেওয়া শব্দদুটি থেকে উপযুক্ত শব্দ বেছে বাঁ-দিকের শূন্যস্থান পূর্ণ করুন :

(ক) আস্তে আস্তে বীজের .... খসিয়া পড়িল। [(১) ডালা, (২) ঢাকনাটি]

(খ) আর যে অংশ উপরের দিকে থাকে, তাহাকে বলে ....। [(১) মূল, (২) কাণ্ড]

(গ) মূল দ্বারা মাটি হইতে গাছ .... শোষণ করে। [(১) রস, (২) আলো]

(ঘ) গাছের সর্বপ্রধান চেষ্টা, কী করিয়া একটু .... পাইবে। [(১) বাতাস, (২) আলো]

(ঙ) এখন .... গাছটি বাতাসের ভর সহিতে পারে না। [(১) সতেজ, (২) শুষ্ক]

১০.৬ অনুশীলনী ২ (ভাষাদক্ষতা বিষয়ক)

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর হয়ে গেলে ৪৪ পাতার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. নীচে দেওয়া শব্দগুলির কথ্যরূপ লিখুন ঃ

(ক) নূতন..

(খ) বাহির..

(গ) ঝুলাইয়া..

(ঘ) ঢালিলে..

(ঙ) রহিল..

(চ) রাখিলাম..

(ছ) পড়িয়া..

(জ) মরিয়া..

(ঝ) খাইতে..

(ঞ) গলিয়া..

২. **নীচে এক-একটি শব্দ দিয়ে একটি করে বাক্য গঠন করুন ঃ**

(ক) বীজ..

(খ) মূল..

(গ) কাণ্ড..

(ঘ) আলো..

(ঙ) রেণু..

১০.৭ উত্তর সংকেত

অনুশীলনী ১

(১) (ক)—ঠিক, (খ)—ঠিক, (গ)—ভুল, (ঘ)—ঠিক, (ঙ)—ভুল।

(২) (ক) ঢাকনাটি, (খ) কাণ্ড, (গ) রস, (ঘ) আলো, (ঙ) শুষ্ক।

অনুশীলনী ২

১. (ক) নতুন; (খ) বের; (গ) ঝুলিয়ে; (ঘ) ঢাললে; (ঙ) রইল; (চ) রাখলাম; (ছ) পড়ে; (জ) মরে; (ঝ) খেতে; (ঞ) গলে।

২. বাক্যগুলি নিজেই তৈরি করুন।

১০.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১. জগদীশচন্দ্র বসু : *অব্যক্ত*।

একক ১১ ❑ পিঁপড়ের লড়াই — গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

গঠন

১১.১ উদ্দেশ্য
১১.২ প্রস্তাবনা
১১.৩ মূলপাঠ ১
১১.৪ সারাংশ ১
১১.৫ অনুশীলনী ১
১১.৬ মূলপাঠ ২
১১.৭ সারাংশ ২
১১.৮ অনুশীলনী ২
১১.৯ মূলপাঠ ৩
১১.১০ সারাংশ ৩
১১.১১ অনুশীলনী ৩
১১.১২ অনুশীলনী ৪ (ভাষাদক্ষতা বিষয়ক)
১১.১৩ উত্তর সংকেত
১১.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

১১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের মৌলিক রচনার বিষয়টি আলোচনা করতে পারবেন।
- সাহিত্যের মাধ্যমে বিজ্ঞানের বিষয় আস্বাদন করতে পারবেন।

১১.২ প্রস্তাবনা

এই পাঠে পিঁপড়েদের বুদ্ধি এবং রণকৌশল নিয়ে রেখা একটি রচনা দেওয়া হল। লেখার ভঙ্গি যেমন ঝরঝরে, তেমন চিত্তাকর্ষক। দুই দল পিঁপড়ের আত্মরক্ষার লড়াইয়ের বর্ণনা রামায়ণ অথবা মহাভারতের মতো মহাকাব্যে বর্ণিত ভীষণ যুদ্ধের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। শুধু পিঁপড়েই নয়, বাংলার শহরে গ্রামে পাওয়া যায় এমন কীট-পতঙ্গ নিয়ে লেখক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য আজীবন গবেষণা করেছেন। মাকড়সা, বোলতা, মৌমাছি, গুবরে-পোকা, প্রজাপতি ইত্যাদি নিয়ে লেখা তাঁর অন্যান্য রচনাও 'পিঁপড়ের লড়াই'-এর মতো সরল এবং সাবলীল শৈলীতে লেখা।

এই এককের মূলপাঠ-কে তিনটি অংশে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি অংশের পরে কিছু অনুশীলনী রয়েছে। পাঠক প্রথমে অনুশীলনী করে পরে উত্তর-সংকেতের সঙ্গে নিজেদের উত্তর মিলিয়ে নেবেন। যদি ভুল উত্তরের সংখ্যা একটির বেশি হয় তা হলে পরের অংশ পড়ার আগে প্রথম অংশটি আর-একবার পড়ে নেবেন।

১১.৩ মূলপাঠ ১

কীট-পতঙ্গের মধ্যে পিঁপড়েদের জীবনকাহিনী খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। এরা সামাজিক প্রাণী এবং দলবদ্ধভাবে বাস করে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এ পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর বহু পিঁপড়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। বিভিন্ন জাতের অধিকাংশ দলেই সাধারণত স্ত্রী, পুরুষ ও কর্মী—এই তিন শ্রেণীর পিঁপড়ে দেখতে পাওয়া যায়। কোনও কোনও জাতের কর্মীদের মধ্যে আবার ছোট কর্মী, বড় কর্মী ও যোদ্ধা এই তিন রকমের বিভিন্ন আকৃতি-বিশিষ্ট পিঁপড়ে দেখা যায়। বাসগৃহ নির্মাণ, খাদ্যসংগ্রহ, সন্তানপালন—এমন কি, যুদ্ধবিগ্রহ পর্যন্ত যাবতীয় কাজ ক্রীতদাসের মতো এই কর্মীদেরই করতে হয়। স্ত্রী ও পুরুষ পিঁপড়ের একমাত্র কাজ বসে বসে খাওয়া এবং বংশ বৃদ্ধি করা। আমাদের দেশেও বিভিন্ন জাতীয় বহুবিধ পিঁপড়ে দেখতে পাওয়া যায়। কোনও কোনও জাতের পিঁপড়ের দলে হাজার হাজার কর্মী থাকে; আবার কোনও কোনও জাতের পিঁপড়ের দলে কর্মীর সংখ্যা ত্রিশ-চল্লিশটি মাত্র। অধিকাংশ পিঁপড়েই গর্তের মধ্যে অথবা বৃক্ষকোটরে বাস করে থাকে। আবার কেউ কেউ বড় গাছের ওপরে সবুজ পত্রপল্লবের সাহায্যে বাসগৃহ নির্মাণ করে বসবাস করে। উগ্র প্রকৃতি ও বিষাক্ত দংশনের জন্যে নালসো নামে এক জাতীয় লাল রঙের পিঁপড়ে আমাদের দেশে সর্বজন পরিচিত। হাজার হাজার নালসো এক বাসার মধ্যে একসঙ্গে বাস করে। বাসস্থান নির্মাণ, খাদ্যসংগ্রহ ও যুদ্ধবিগ্রহের সময় এরা যেরূপ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দেয়, তা কতকটা সংস্কারমূলক হলেও এতে সহজেই তাদের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

নালসো পিঁপড়েরা গাছের উঁচু ডালে অনেকগুলি সবুজ পাতা একসঙ্গে জুড়ে বড় বড় গোলাকার বাসা নির্মাণ করে এবং তার মধ্যে শত শত পিঁপড়ে একসঙ্গে বসবাস করে থাকে। এদের বাসানির্মাণ-প্রণালী অতি অদ্ভুত। কতকগুলি নালসো কর্মী একসঙ্গে পাশাপাশি ভাবে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পরস্পর সন্নিহিত দুটি পাতাকে একত্রিত করে টেনে ধরে রাখে। তখন অপর কর্মীরা তাদের কীড়া মুখে করে উপস্থিত হয়। শুঁড়ের সাহায্যে কীড়াগুলির মুখের কাছে সুড়সুড়ি দিলেই তারা একপ্রকার আঠালো সুতো বের করতে থাকে। কাপড় বোনার সময় তাঁতিরা যেমন একবার এদিকে আবার ওদিকে মাকু চালায়, কতকটা সেই কায়দায় কর্মীরা কীড়াগুলির মুখ একবার এ পাতায় আবার ও পাতায় ঠেকিয়ে সূক্ষ্ম সুতার সাহায্যে পাতার ধারা গুলি জুড়ে দেয়। এইরূপে বুনন শেষ হলে বড় বড় ফাঁকগুলিকে বারবার সুতা বুনে সাদা কাগজের মতো পাতলা পর্দায় ঢেকে দেয়। বাইরে বেরোবার জন্যে একটি কী দুটি মাত্র পথ রাখে। পাতার পর পাতা জুড়ে ক্রমশ বাসা বড় করে তোলে। বাসা বড় করবার জন্য যদি কোনও সময়ে একটু দূরবর্তী নিচের ডাল থেকে পাতা নেবার প্রয়োজন হয়, তখন এরা দলে দলে বাসার নিচের দিকে জড়ো হতে হতে পরস্পর একে অন্যকে আঁকড়ে ধরে শিকলের মতো নিচের দিকে ঝুলে পড়ে। ক্রমে ক্রমে অপরাপর কর্মীরা এসে সেই শিকল বাড়ালে বাড়াতে সর্বশেষ পাতার নাগাল পেলেই কয়েকজন সেটাকে কামড়ে ধরে রাখে। অপর কর্মীরা তাদের পা কামড়ে ধরে। তখন উপর দিক থেকে শিকল ক্রমশ খাটো করতে করতে নীচের পাতাকে টেনে কাছে এনে কীড়ার সাহায্যে মূল বাসার সঙ্গে শক্ত করে গেঁথে দেয়।

১১.৪ সারাংশ ১

পিঁপড়েরা সামাজিক প্রাণী। এরা দলবদ্ধভাবে বসবাস করে এবং কাজ করে। নানা দেশে নানারকম পিঁপড়ে দেখা যায়। এদের দলে সাধারণত স্ত্রী পুরুষ এবং কর্মী এই তিন রকমের পিঁপড়ে দেখা যায়। স্ত্রী ও পুরুষের কাজ কেবল বংশ বৃদ্ধি করা, অপরদিকে কর্মী পিঁপড়ে সব রকমের কাজ—যেমন, খাবারের জোগাড়, বাস তৈরি এই সব করে। কোনো কোনো দলে হাজার হাজার কর্মী আবার কোনো দলে মাত্র তিরিশ-চল্লিশ। অধিকাংশ পিঁপড়েই গর্তে বা গাছের কোটরে বাস করে আবার কোনো কোনো জাতের পিঁপড়ে গাছের পাতা জুড়ে বাসা করে। আমাদের দেশে নালসো নামে একরকমের কাঠপিঁপড়ে দেখা যায়। তারা একধরনের গাছের পাতা দিয়ে বাসা তৈরি করে। গাছের পাতা দিয়ে বাসা তৈরি করার সময় এদের খুব দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

১১.৫ অনুশীলনী ১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর হয়ে গেল ৫৫ পাতার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। উপরের অংশটি ভাল করে পড়ে সঠিক উত্তরটি ডান দিকে দেওয়া সম্ভাব্য উত্তর বেছে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) পিঁপড়েরা
- (১) অসামাজিক প্রাণী
- (২) ছোটো ছোটো দলে বাস করে
- (৩) বিরাট দলে বাস করে

(খ) বাসা বানানো, খাবার জোগাড় করা সন্তানপালন এবং যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি সব কাজই
- (১) পুরুষ পিঁপড়েরা করে
- (২) কর্মী পিঁপড়েরা করে
- (৩) স্ত্রী পিঁপড়েরা করে

(গ) পিঁপড়েদের বংশবৃদ্ধির কাজ
- (১) স্ত্রী ও কর্মী পিঁপড়েরা মিলে করে
- (২) পুরুষ ও স্ত্রী পিঁপড়ে মিলে করে
- (৩) স্ত্রী পিঁপড়েরা নিজেরাই করে।

(ঘ) পিঁপড়েদের বাসা
- (১) গর্তের ভিতর, গাছের কোটরে অথবা বড়ো গাছের পাতা দিয়ে তৈরি হয়।
- (২) শুধু গর্তে তৈরি হয়
- (৩) শুধু গাছের কোটরে অথবা সবুজ পাতা দিয়ে তৈরি হয়।

(ঙ) নালসো পিঁপড়েদের বাসা দেখতে
- (১) চৌকো
- (২) এলোমেলো
- (৩) গোল

১১.৬ মূলপাঠ ২

এরা মাংসাশী প্রাণী। মৃত কীট-পতঙ্গ, মাছের কাঁটা, পাখির পালক প্রভৃতি সংগ্রহ করে বাসায় নিয়ে যায় এবং অবসর মতো সকলে মিলে সেগুলো চেটে খায়। অন্যান্য পিঁপড়ের ডিম ও উই এদের উপাদেয় খাদ্য। নালসোরা সুকৌশলে উই ধরে থাকে। উইয়েরা কখনও অনাবৃত স্থানে যাতায়াত করে না, সর্বদাই অন্ধকারে থাকতে ভালবাসে। এই জন্যই মাটির সুড়ঙ্গ গাঁথতে গাঁথতে অগ্রসর হয়ে থাকে।

জীবন্ত ফড়িং বা ও জাতীয় কোনও পতঙ্গকে একবার ধরতে পারলে আর রক্ষা নেই। একটা পিঁপড়ে কোনও রকমে একবার শিকার কামড়ে ধরলেই হল—দেখতে দেখতে দলের অন্যান্য পিঁপড়েরা এসে চতুর্দিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করতে থাকে। দংশন যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে শিকার উড়ে পালাবার জন্যে প্রাণপণে ধ্বস্তাধস্তি করে; কিন্তু পিঁপড়েরাও তাকে কাবু করবার জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে বলপ্রয়োগ করতে থাকে। ডানা চেপে ধরতে না পারলে শিকার সহজেই উড়ে যেতে চায়; সে অবস্থায় কিন্তু পিঁপড়েরাও কামড় ছাড়ে না। অন্যান্য পিঁপড়ে এসে তখন সে পিঁপড়েটার পা অথবা কোমর কামড়ে ধরে টেনে রাখতে চেষ্টা করে। এই অবস্থায় ক্রমশ পিঁপড়ের একটা শিকল গেঁথে ওঠে। অনেক সময় দেখা যায়, ফড়িং উড়ে যাচ্ছে আর তার লেজ অথবা পা কামড়ে ধরে দু-তিনটা নালসো শিকলের মতো ঝুলছে।

নালসো পিঁপড়েদের প্রকৃতি এতই উগ্র যে, শত্রু হোক কী মিত্রই হোক বাসার কাছে এলে কারও নিস্তার নেই। প্রবল-দুর্বল নির্বিশেষে দলে দলে ছুটে এসে আক্রমণ করবে। প্রাণের ভয় যেন এদের মোটেই নেই। একবার আক্রমণ করলে কিছুতেই পিছু হটবে না শত্রুর আক্রমণে সঙ্গীরা দলে দলে প্রাণ হারাচ্ছে দেখেও এরা যেন মোটেই বিচলিত হয় না এবং চতুর্গুণ উত্তেজনার সঙ্গে মরণপণ লড়াই শুরু করে দেয়। একবার শত্রুকে কামড়ে ধরতে পারলেই হয়—কিছুতেই আর কামড় ছাড়বে না। মস্তক থেকে দেহ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও মস্তকটি সেইভাবে মরণ কামড় দিয়ে শত্রুর দেহসংলগ্ন হয়ে থাকে। শত্রুর আগমনের আশঙ্কা হলেই দেহের প্রান্তদেশ থেকে একপ্রকার বিষাক্ত রস পিচকিরির মতো ছুঁড়ে মারতে থাকে। এই রসের বিষাক্ত উগ্র গন্ধে এরা অনেক দূর থেকেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। লড়াই শুরু হবার মুখে এরা শরীরের পশ্চাদ্দেশ ঊর্ধ্বে তুলে সম্মুখের পা উঁচু করে এমন উত্তেজিত অবস্থায় মুখ হাঁ করে ছুটে এসে দলে দলে বাসার ওপর সার বেঁধে দাঁড়ায় যে, অতি বড় শত্রুও অগ্রসর হতে ইতস্তত করতে বাধ্য হয়। উত্তেজিত জনতা যেমন জিগির তুলে সকলের প্রাণে উৎসাহের সঞ্চার করে, প্রবল উত্তেজনার সময় এরাও তেমনই শরীরের পশ্চাদ্দেশ পাতার ওপরে ঠুকে ঠুকে একপ্রকার অদ্ভুত শব্দ উৎপাদন করে। বাসার সম্মুখে কান পেতে রাখলে একপ্রকার অস্ফুট খস্ খস্ শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।

এদের দুর্ধর্ষ কোপন স্বভাবের ফলে, অন্যান্য পিঁপড়েদের সঙ্গে হামেশাই ঝগড়াঝাঁটি লেগে থাকে—এমন কি বিভিন্ন দলের স্বজাতীয়দের মধ্যে সময় সময় ভীষণ লড়াই বেঁধে যায়। এইজন্যই বোধহয় অন্যান্য জাতের পিঁপড়েরা এদের নিকট থেকে যথাসম্ভব দূরে দূরেই অবস্থান করে। তবে দলে ভারি বলেই হোক বা উগ্র বিষের ভয়েই হোক ক্ষুদে পিঁপড়েদের সঙ্গে এরা কিছুতেই এঁটে উঠতে পারে না। ক্ষুদেরা কোনও রকমে সন্ধান পেলে নালসোদের সমূলে ধ্বংস না করে ছাড়ে না। এইজন্যই যেসব স্থানে ক্ষুদে পিঁপড়ের আস্তানা আছে, সেখানে কখনও নালসো পিঁপড়ে দেখতে পাওয়া যায় না। ক্ষুদে, ডেঁয়ো ও ছোট ছোট কালো বিষ পিঁপড়ের সঙ্গে এদের লড়াই অনেকবার প্রত্যক্ষ করেছি; কিন্তু এদের স্বজাতীয়ের পরস্পরের মধ্যে দল ভাঙার যে ভীষণ লড়াই প্রত্যক্ষ করেছিলাম, সেটা সত্যই ভয়াবহ।

১১.৭ সারাংশ ২

নালসো পিঁপড়েরা মাংসাশী প্রাণী, মৃত কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি খায়, এমনকী জীবন্ত পোকাও মেরে খায়। জীবন্ত ফড়িং বা কোনো পতঙ্গকে একবার ধরতে পারলে সবাই মিলে ছেঁকে ধরে, যাতে উড়ে না যেতে পারে। পিঁপড়েরা পরস্পরকে কামড়ে ধরে শিকলের মতো করে সেই শিকল দিয়ে ওই ধরনের পতঙ্গ আটকে রাখে।

নালসো পিঁপড়েরা বাসার কাছে ঘেঁসতে দেয় না। একবার আক্রমণ করলে তারা কিছুতেই পিছু হটে না, এমনকী মাথা থেকে দেহ আলাদা হয়ে গেলেও কামড়ে ধরে থাকে। শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা দেখলেই এরা দেহের প্রান্ত থেকে একরকম বিষাক্ত রস পিচকিরির মতো ছুঁড়ে মারতে থাকে। আবার শরীরের পিছন অংশ পাতায় ঠুকে ঠুকে একরকম খস্ খস্ আওয়াজও করে।

অন্যান্য পিঁপড়েদের সঙ্গে এরা মারামারি তো করেই, এমনকী নিজেদের জাতের অন্য দলের সঙ্গেও মারামারি করে।

১১.৮ অনুশীলনী ২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর হয়ে গেলে ৫৫ পাতার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. নিম্নলিখিত মতগুলি ঠিক না ভুল, নির্ধারিত ঘরে ক্রশ (×) চিহ্ন দিন :

	ঠিক	ভুল
(ক) পিঁপড়েরা শুধু ফুলের মধুর মতো মিষ্টি জিনিস খেয়ে জীবনধারণ করে।	☐	☐
(খ) উইয়েরা অন্ধকার জায়গায় থাকে।	☐	☐
(গ) পিঁপড়েরা কখনো কোনো জীবন্ত প্রাণীকে আক্রমণ করে না।	☐	☐
(ঘ) নালসো পিঁপড়েরা স্বভাবে খুব শান্ত।	☐	☐
(ঙ) নালসোরা কখনো স্বজাতীয় পিঁপড়েদের সঙ্গে ঝগড়া করে না।	☐	☐
(চ) নালসো একবার শিকার ধরলে পরে নিজের জীবন-মরণের পরোয়া করে না।	☐	☐
(ছ) শত্রু আসছে জানতে পারলে নালসোরা দেহের পিছনের অংশ থেকে একরকম তীব্র গন্ধযুক্ত রস ছুঁড়ে মারে।	☐	☐
(জ) লড়াই শুরু হবার সময় নালসোরা দেহের মধ্যভাগ উঁচু করে ধনুকের মতো বেঁকে যায়।	☐	☐
(ঝ) খুব বেশি উত্তেজিত হলে পরে নালসোরা শরীরের পিছনের অংশ পাতার উপর ঠুকে ঠুকে শব্দ করে।	☐	☐
(ঞ) নালসোরা অন্য জাতের পিঁপড়েদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকে।	☐	☐
(ট) উগ্র স্বভাব হওয়া সত্ত্বেও নালসোরা ক্ষুদে পিঁপড়েদের সঙ্গে লড়াইয়ে পেরে ওঠে না।	☐	☐
(ঠ) শেষ লাইনে লেখক পিঁপড়েদের স্বজাতীয়দের মধ্যে লড়াইয়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন।	☐	☐

১১.৯ মূলপাঠ ৩

একবার বিকেলের দিকে কলকাতার সন্নিহিত সোনারপুর অঞ্চলের একটা বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। বাগানের চারদিকে পালিতা মাদারের মোটা মোটা ডাল পুঁতে তার গায়ে খুব ফাঁক করে বাঁশের বাখারি এঁটে এমনভাবে বেড় দিয়ে রেখেছে যেন গরু-বাছুর ভিতরে না ঢুকতে পারে। বাগানের গাছপালার অবস্থা দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারা গেল যে, আগের দিন সেখানে বেশ ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেছে। আর একটু অগ্রসর হতেই নজরে পড়ল—খুব বড় একটা পিঁপড়ের বাসা-সমেত ছোট একটা আমের ডাল একটা খুঁটির খুব কাছেই বাখারির সঙ্গে ঝুলে রয়েছে। মনে হল ঝড়ের বেগে ডালটা ভেঙে বেড়ার গায়ে পড়ে আটকে গিয়েছিল। খুব কাছে গিয়ে দেখলাম ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বাসাটার ভিতরে সহস্র সহস্র পিঁপড়ে অবস্থান করছে। কতকগুলি পিঁপড়ে বাসার উপরে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছে আর কতকগুলি একবার ডালটার গা বেয়ে উপরের দিকে উঠছে আবার নেমে আসছে। তাদের গতিবিধি দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল যে, তারা ওই ঝুলন্ত বাসা থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও যাবার রাস্তা খুঁজছে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করেই বুঝতে পারলাম, তাদের বাইরে যাবার রাস্তা বন্ধ। কারণ যে বাখারিটার সঙ্গে বাসাটা ঝুলছিল, সেই বাখারিটার উপর দিয়ে বরাবর এক সার নাল পিঁপড়ে যাতায়াত করছে। বাগানের কোণে একটা ঝোপের ভিতর পূর্ব থেকে আর একদল লাল পিঁপড়ে বাসা তৈরি করে বসবাস করছিল। তারাই বাখারির উপর দিয়ে প্রায় ২৫/৩০ ফুট লম্বা লাইন করে সদ্যকর্তিত কচ্ছপের খোলা থেকে মাংসের কণা সংগ্রহ করে বাসায় তুলছিল। ঝুলন্ত বাসার পিঁপড়েরা ডাল বেয়ে বাখারি কাছে এসে উক্ত পিঁপড়ের দল দেখেই আর অগ্রসর হতে সাহসী হয়নি। বাখারির উপরের পিঁপড়েদের অতিক্রম না করে তাদের অন্যত্র যাবার কোনই উপায় নেই। ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ভগ্ন বাসাতেও বেশিদিন বাস করা অসম্ভব। একে তো শত্রু নিকটে, তার উপর পাতা শুকিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বাসা কুঁচকে যাবে, নয়তো শুকনো পাতার জোড়া মুখ খুলে গিয়ে বাসাটার স্থানে স্থানে ফাটল দেখা দেবে। কাজেই এই বাসা পরিত্যাগ করে অন্যত্র নতুন আশ্রয়ের সন্ধান করতেই হবে। বিশেষত বাসার ভিতরে অসংখ্য ডিম ও বাচ্চা রয়েছে, তাদের নিরাপদ স্থানে রক্ষা করা দরকার। এইসব নানা ব্যাপারে বিব্রত হয়ে ঝুলন্ত বাসার অধিবাসীরা বিষম উত্তেজিতভাবে ইতস্তত ছুটোছুটি করছিল। বাখারির উপরে যারা যাতায়াত করছিল, তারাও এই আগন্তুক দলের সন্ধান পেয়েছিল বোধহয়, কারণ তাদের ভিতরেও উত্তেজনার ভাব লক্ষিত হচ্ছিল। তারাও ক্রমে ক্রমে ঝুলন্ত ডালটার কাছাকাছি এসে ভিড় জমাচ্ছিল। প্রায় আধঘণ্টার উপর দাঁড়িয়ে উভয় দলের এই তোড়জোড় লক্ষ করছিলাম। একমাত্র উত্তেজিত ভাব বা একস্থানে দলে দলে জমায়েত হওয়া ব্যতিরেকে লড়াইয়ের আর কোনো লক্ষণই দেখতে পাইনি। ঝুলন্ত বাসার পিঁপড়েরা কীরূপ কৌশল অবলম্বন করে বাখারির উপরে পিঁপড়েদের লাইন অতিক্রম করে যায়—কেবল সেটাই দেখবার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আরও দশ-পনেরো মিনিট এ-ভাবেই কাটল।

অবশেষে দেখলাম, ঝুলন্ত বাসার প্রায় পাঁচ-সাতটা পিঁপড়ে ডাল বেয়ে বাখারিটার কাছে এসেই ইতস্তত করতে লাগল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর সেই দলের গোটা তিনেক পিঁপড়ে বাসায় ফিরে গেল। বাকি যারা রইল তারা শুঁড় উঁচু করে যেন বাখারির উপরের দলটাকে মনোযোগ সহকারে দেখতে লাগল। ইতিমধ্যে অগ্রবর্তী পিঁপড়েটা অসীম সাহসে ভর করেই যেন অকস্মাৎ বাখারির পিঁপড়েদের লাইনের মধ্যে দিয়ে ছুটে পার হতে হতে গিয়েই তুমুল কাণ্ড ঘটিয়ে তুলল। বাখারির দলও যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। তৎক্ষণাৎ দশ-বারোটা পিঁপড়ে মিলে একযোগে তাকে কামড়ে ধরে বন্দি করে ফেলল। বন্দি করবার কায়দাও অদ্ভুত। ছয়জনে দুটো শুঁড় টেনে

ধরে পিঁপড়েটাকে এমন অবস্থায় রাখল যে, বেচারার আর নড়াচড়ার সাধ্য ছিল না। এবার দু-দলে সত্যিকারের লড়াই শুরু হয়ে গেল। উভয় দলের সৈন্য সামন্তরাই শুঁড় উঁচিয়ে পুচ্ছদেশ ঊর্ধ্বে তুলে প্রবল উত্তেজনায় যেন তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দিল। মাঝে মাঝে এক-একটা পিঁপড়ে অন্য একটার শুঁড়ে শুঁড় ঠেকিয়ে কী যেন বলে দেয়। তৎক্ষণাৎ সে ছুটে বাসার ভিতর চলে যায় এবং পরক্ষণেই কতকগুলি নতুন সৈন্য দল বেঁধে বাইরে এসে পড়ে। এরূপে ঘটনাস্থলে উভয়পক্ষেরই ভিড় জমে গেল। ইতিমধ্যে বাখারির উপরকার দল শত্রুপক্ষের একটাকে বন্দি করে উৎসাহের আতিশয্যেই বোধ হয় আস্ফালন করতে করতে ভাঙা ডালটার খুব নিকটে এগিয়ে গেল। ভাব দেখে মনে হল যেন তারা বাসাটাকে দখল করতে যাচ্ছে; কিন্তু তার ফল হল বিপরীত। মুহূর্তের মধ্যেই ছিন্ন বাসার পিঁপড়েরা শত্রুপক্ষের পাঁচ-সাতটি অগ্রবর্তী সৈন্যকে শুঁড়ে কামড়ে ধরে একেবারে তাদের দলের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু সৈন্যসামন্ত তাদের ঘিরে ফেলল। তাদের কয়েকটা এসে তাদের কেটে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিল আর বাকি ক'টাকে ভিন্ন-ভিন্নভাবে সকলে মিলে পূর্বোক্ত উপায়ে টানা দিয়ে রেখে দিল। এইসব ঘটনা ঘটতে দু-তিন মিনিটের বেশি সময় লাগেনি। এদিকে বাখারি ও ঝুলন্ত ডালের সংযোগস্থলে দ্বৈরথ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। দু-দলের দু'জন করে টানাটানি কামড়াকামড়ি চলছে। দেখলাম বেড়ার উপরের দলের কয়েকটি সৈন্য ঝুলন্ত বাসার কয়েকটি সৈন্যকে শুঁড়ে কামড়ে ধরে তাদের দিকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, আবার ঝুলন্ত বাসার সৈন্যরাও এক-একজনে এক একটি করে শত্রু-সৈন্যকে শুঁড়ে কামড়ে ধরে তাদের দিকে টানছে। যাকে টানছে সে প্রাণপণে পিছু হটবার চেষ্টা করছে। আবার কেউ কেউ ছ'টি পা দিয়ে অবলম্বনস্থল আঁকড়ে রয়েছে। অনেকক্ষণ টানাটানির পর কেউ কেউ শুঁড়ের অর্ধাংশ শত্রুর মুখে রেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করছে। ক্রমশ লড়াই এমন ভীষণাকার ধারণ করল যে, দু-তিন হাত প্রশস্ত স্থানের মধ্যে প্রায় সর্বত্র এরূপ টানাটানি কামড়াকামড়িই চলতে লাগল। এখন শুধু টানাটানি নয়, কামড়াকামড়ি যেন বেশি দেখা যেতে লাগল। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই বিষবাষ্পের অবাধ প্রয়োগ এতগুলি পিঁপড়ের দেহনিঃসৃত বিষাক্ত রসের উগ্র গন্ধে যেন নাক জ্বলে যাচ্ছিল। কামড়াকামড়ি করতে করতে জড়াজড়ি করে শত শত পিঁপড়ে ঝুপ ঝুপ করে নীচে পড়ছিল। নীচে মাটির উপর চেয়ে দেখলাম প্রায় পনেরো-বিশ মিনিটের মধ্যে উভয়পক্ষের এত পিঁপড়ে মারা গেছে, ঘাস-পাতাগুলি তাদের মৃতদেহের নীচে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। মনে হল উভয়পক্ষের সৈন্যসংখ্যা প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। যারা তখনও ছুটোছুটি করছিল, তাদের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে দেখলাম—প্রায় প্রত্যেকেরই শুঁড় অথবা পায়ের সঙ্গে মরণ-কামড় দিয়ে ঝুলে রয়েছে শত্রুদের ছিন্ন মস্তক অথবা দেহের সম্মুখাংশ। বেড়ার উপরের পিঁপড়েরা সর্বদাই চেষ্টা করছিল, যাতে বাসাটাকে গিয়ে দখল করতে পারে। এত লড়াইয়ের পরেও দেখলাম তাদের উৎসাহ কিছুমাত্র কমেনি। তাদের বাসা থেকে নতুন নতুন সৈন্য এসে পূর্ণোদ্যমে আবার আক্রমণ শুরু করল। এবার যেন তারাই জয়ী হয়েছে বলে বোধ হল। ঝুলন্ত বাসার সৈন্যদের সংখ্যা আর বেশি দেখা যাচ্ছিল না। বিশেষত উভয়পক্ষের সৈন্যদের আকৃতি একই প্রকার বলে বিশেষ কিছু বুঝতে পারছিলাম না যে, কে শত্রু কে মিত্র। কিন্তু এরা পরস্পর শুঁড়ে শুঁড় ঠেকিয়ে বা অন্য কোনও উপায়ে শত্রু মিত্র চিনে নিচ্ছিল। এদিকে বাখারির উপরে দল দুই চারটি করে ক্রমে ক্রমে বাসার উপরে এসে জড়ো হতে লাগল, কিন্তু তারাও যে বেশ ভয়ে ভয়ে ইতস্তত করে অগ্রসর হচ্ছিল, তাও বেশ বোঝা গেল। কিছুক্ষণ বেশ চুপচাপ। বাসার সৈন্যসামন্ত যেন ক্রমশ বিরল হতে লাগল। ঝুলন্ত বাসার পিঁপড়েরা যে যুদ্ধে হেরে গেছে, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বাসাটার খুব কাছে কান পেতে শুনলাম—ভিতরে যেন অজস্র পিঁপড়ের একটা খস্ খস্ আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

প্রায় পাঁচ-সাত মিনিট এভাবে কেটে গেল, তার পরেই দেখি—গুটিকয়েক পিঁপড়ে বাসার ভিতর থেকে

অপরিণতবয়স্ক বাচ্চাগুলিকে মুখে নিয়ে বেরিয়ে গেল। পিছনে তাদের একদল সৈন্য যেন পাহারা দিতে দিতে চলেছে। বাচ্চা বহনকারীরা কোনও দিকেই ভ্রূক্ষেপ না করে গাছের ডাল ও বাখারিটার উপর দিয়ে অতি দ্রুতগতিতে পালিতা মাদারের খুঁটিটার উপর যেতে লাগল। সৈন্যরাও তাদের অনুসরণ করছিল। এই ব্যবধানটুকুর মধ্যে শত্রুরা বিশেষ কিছু বাধা দেবার চেষ্টা করল না, কেবল দু-একটা সৈন্যকে ধরে টানা দিয়ে রাখল মাত্র। বিশেষত তখন সে স্থানে শত্রুর সংখ্যাও খুব কমই ছিল। যারা ছিল তাদের অধিকাংশই যেন মারামারি করা অপেক্ষা বাসাটা লুট করবার উৎসাহে সেই দিকেই ছুটছিল। খানিক পরে দেখা গেল, আরও অনেক ডিম ও বাচ্চাগুলিকে মুখে নিয়ে দলে দলে বাসা থেকে ছুটে বের হয়ে সেই গাছটার দিকেই প্রাণপণে ছুটছে। তন্মহূর্তেই আবার ভীষণ লড়াই শুরু হয়ে গেল। বাসার ভিতরে এতক্ষণ অসংখ্য সৈন্য যেন দম নেবার জন্য চুপ করে বসেছিল।—এবার তারা দলে দলে বেরিয়ে এসে শত্রুদের খণ্ড খণ্ড করে ফেলতে লাগল। এদিকে ফাঁকে ফাঁকে তারা বাসার ডিম ও বাচ্চাগুলিকে সরিয়ে নিচ্ছিল। সেই গাছটির উপর শত্রুরা এবার সত্যসত্যই পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। খুঁটিটার মাথার উপর কতকগুলি নতুন ডাল গজিয়েছিল। সেই ডালের পাতা মুড়ে সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি কর্মী পিঁপড়ে নতুন বাসা নির্মাণে লেগে গেল। এভাবে একটা ডালের মধ্যেই তিন-চারটা ছোট ছোট বাসা তৈরি হয়ে গেল। বাসা নির্মাণ শেষ হতে না হতেই তারা ডিম ও বাচ্চাগুলিকে তার মধ্যে স্তূপাকারে রাখতে লাগল। এদিকে ঝুলন্ত বাসাটার নীচের দিকে নজর পড়তেই দেখি—এক আশ্চর্য ব্যাপার। যখন শত্রুসৈন্যরা ভিতরে ঢুকে পড়েছিল, সেই সময়ে ভয় পেয়ে কতকগুলি কর্মী পিঁপড়ে বাচ্চা মুখে করে বাসাটার নিচের দিকে জড়ো হয়েছে। ক্রমশ স্থানাভাব হওয়ায় কর্মীরা বাচ্চা মুখে করে স্তূপাকারে নিচের দিকে ঝুলে রয়েছে। যাহোক, এদিকে শত্রুপক্ষ পরাভূত হওয়ায় তাদের রাস্তা খোলা হয়ে গিয়েছিল। এখন বাখারি ও গাছটার দুদিকে ইতস্তত অনেক সৈন্য পাহারায় নিযুক্ত করে তারা ডিম ও বাচ্চাগুলিকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ডিম ও বাচ্চাগুলিকে সরাবার পর তারা পুরুষ পিঁপড়েগুলিকে ঠিক নিশান বহন করবার মতো উঁচু করে নিয়ে আসতে লাগল, পুরুষের সংখ্যাও কম ছিল না। দেড়শো কি দু'শোর উপর হবে। তারপর রানীদের পালা। রানীরা আকারে ওদের তুলনায় খুবই বড়। সেগুলিকে বহন করে আনা অসুবিধাজনক। রাখালেরা যেমন গরুর পাল তাড়িয়ে নেয়, কর্মীরাও রানীগুলিকে তেমনি পিছনে পিছনে তাড়িয়ে আনছিল। শত্রুপক্ষের লাইন তখন ভেঙ্গে গেছে। কেবলমাত্র দু-চারটা কর্মী বিচ্ছিন্নভাবে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছিল। এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল। এ পর্যন্ত দেখেই সেদিন সেখান থেকে ফিরে এসেছিলাম। তার পরের দিন সকালে গিয়ে দেখি—বাসাটি শূন্য অবস্থায় ঝুলছে। বাসিন্দাদের কতকগুলি অবশ্য তখনও সেখানে এদিকে-সেদিক ঘোরাফেরা করছিল। পালিতা মাদারের খুঁটির গা বেয়ে বাখারির উপর দিয়ে তারা পরিষ্কার রাস্তা করে দলে দলে উপরে নীচে আনাগোনা করছে। আর শত্রুপক্ষ বাখারির বিপরীত দিক দিয়ে পূর্বের ন্যায় লাইন করে চলেছে। এখন আর শত্রুতার ভাব দেখা গেল না।

১১.১০ সারাংশ ৩

এই অংশে লেখক একই জাতের অর্থাৎ নালসো পিঁপড়ের দুই দলের লড়াই-এর বর্ণনা দিয়েছেন। লেখক নিজে দাঁড়িয়ে যে লড়াই দেখেছিলেন এই অংশে রয়েছে তারই বর্ণনা।

১১.১১ সারাংশ ৩

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে ৫৬ পাতার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. **নীচের দেওয়া বক্তব্যগুলি ঠিক না ভুল, 'তা নির্দিষ্ট ঘরে ক্রশ (×) চিহ্ন দিয়ে দেখান।**

	ঠিক	ভুল
(ক) ঝুলন্ত বাসার পিঁপড়েরা বাখারির উপরের পিঁপড়েদের বাসা দখল করবার জন্য আক্রমণ করে।	☐	☐
(খ) ঝুলন্ত বাসার পিঁপড়েদের নতুন বাসা তৈরি করার তাড়ার কারণ, নতুন বাসা না হলে স্ত্রী পিঁপড়েরা ডিম পাড়তে পারে না।	☐	☐
(গ) যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ঝুলন্ত বাসার পিঁপড়েদের জয় হল।	☐	☐
(ঘ) পিঁপড়ে সৈন্যরা শত্রুপক্ষের কোনও পিঁপড়েকে একবার ধরতে পারলে তার গলা কামড়ে ধরে বন্দী করে রাখে।	☐	☐
(ঙ) স্ত্রী পিঁপড়েরা পুরুষ পিঁপড়েদের চেয়ে আকারে অনেক বড়।	☐	☐

১১.১২ অনুশীলনী ৪ (ভাষাদক্ষতা বিষয়ক)

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে ৫৬ পাতার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. উচ্চারণের সুবিধার জন্য অনেক সময় পাশাপাশি দুটি শব্দের উচ্চারণ একটু অদল-বদল করে তাদের জুড়ে একটি শব্দ তৈরি হয়ে যায়। ব্যাকরণের ভাষায় একে সন্ধি বলে। এখানে সন্ধির শুধু তিনটি নিয়ম অনুযায়ী অনুশীলনী দেওয়া হল।

(ক) **প্রথম শব্দ যদি অ বা আ দিয়ে শেষ হয় এবং দ্বিতীয় শব্দটি যদি অ বা আ দিয়ে আরম্ভ হয় তাহলে দুইয়ে মিলে 'আ' উচ্চারণ করা হয়।**

অ, আ, + অ, আ = আ,

যেমন : নব + অন্ন = নবান্ন

বিবেক + আনন্দ = বিবেকানন্দ

মহা + আকাশ = মহাকাশ

এবার উপরের পাঠ থেকে এই নিয়ম অনুসারে সন্ধি করা হয়েছে এমন দশটি শব্দ খুঁজে বার করুন এবং তাদের বিচ্ছেদ করে দেখান :

(১) .... = ... + ...

(২) .... = ... + ...

(৩) .... = ... + ...

(৪) .... = ... + ...

(৫) .... = ... + ...

(৬) .... = ... + ...

(৭) .... = ... + ...

(৮) .... = ... + ...

(৯) .... = ... + ...

(১০) .... = ... + ...

(খ) **প্রথম শব্দ অ দিয়ে শেষ হলে আর দ্বিতীয় শব্দ উ দিয়ে আরম্ভ হলে দুইয়ে মিলে 'ও' হয়।**

অ, আ, + উ, = ও, যেমন :

সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়

পর + উপকার = পরোপকার

এবার মূলপাঠ থেকে এই নিয়ম অনুসারে সন্ধি করা হয়েছে এমন দুটি শব্দ বেছে তাদের আলাদা করে দেখান :

(১) .... = ... + ...

(২) .... = ... + ...

(গ) **নীচে দেওয়া শব্দগুলির সন্ধি করুন :**

(১) মহা + উৎসব = ...

(২) যথা + উচিত = ...

(৩) হিত + উপদেশ = ...

(৪) কথা + উপকথন = ...

(৫) সময় + উপযোগী = ...

(ঘ) **প্রথম শব্দে যদি অ ছাড়া অন্য কোনো স্বরের পরে বিসর্গ থাকে, আর দ্বিতীয় শব্দ যদি স্বর, বর্গের তৃতীয় বা চতুর্থ ব্যঞ্জন অথবা অন্তঃস্থ দিয়ে আরম্ভ হয়, তা হলে বিসর্গের জায়গায় 'র' উচ্চারণ করা হয়।**

যেমন :

নিঃ + ধন = নির্ধন

দুঃ + গতি = দুর্গতি

চতুঃ + ভুজ = চতুর্ভুজ

এবার মূলপাঠ থেকে এই নিয়ম অনুসারে সন্ধি করা হয়েছে এমন তিনটি শব্দ খুঁজে বার করুন এবং তাদের বিচ্ছেদ করে দেখান :

(১) .... = ... + ...

(২) .... = ... + ...

(৩) .... = ... + ...

(ঙ) **নীচে দেওয়া শব্দগুলির সন্ধি বিচ্ছেদ করুন :**

(১) নির্জন = ... + ...

(২) আশীর্বাদ = ... + ...

(৩) জ্যোতির্ময় = ... + ...

(৪) বহির্গত = ... + ...

(৫) আবির্ভাব = ... + ...

২. সাধারণত লিখিত ভাষা কথ্যভাষা থেকে একটু আলাদা হয়ে থাকে। লিখিত ভাষার শব্দগুলি প্রায়ই কথ্য ভাষার প্রচলিত শব্দের চেয়ে কঠিন হয়। যেমন, লিখিত ভাষার ‘সর্বপ্রকার’ কথাটা খুব স্বাভাবিক লাগলেও, কথ্যভাষায় সেটা একটু অদ্ভুত লাগবে। কথা বলার সময় আমরা বলব ‘সব রকম’। ‘পিঁপড়ের লড়াই’ রচনাটিতে আমরা এই দুইরকমের শব্দের ব্যবহারই দেখতে পাই, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু কঠিন শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে।

এবারে মূলপাঠের প্রথম দুটি অনুচ্ছেদ আবার খুব মন দিয়ে পড়ে সেগুলিকে কথ্যভাষায় লেখার চেষ্টা করুন। উদাহরণের জন্য প্রথম কয়েকটি লাইন নীচে কথ্যভাষায় দেখানো হল :

“পোকামাকড়ের মধ্যে পিঁপড়েদের জীবনের কথা খুবই মজাদার। এরা সামাজিক প্রাণী, আর একসঙ্গে দল বেঁধে থাকে। পৃথিবীর নানা জায়গায় এ পর্যন্ত নানারকমের অনেক পিঁপড়ের খোঁজ পাওয়া গেছে........।”

১১.১৩ উত্তর সংকেত

অনুশীলনী ১

(ক)—(৩); (খ)—(২); (গ)—(২); (ঘ)—(১); (ঙ)—(৩)।

অনুশীলনী ২

(ক)—(ভুল); (খ)—(ঠিক); (গ)—(ভুল); (ঘ)—ভুল; (ঙ)—(ভুল);

(চ)—(ঠিক); (ছ)—(ঠিক); (জ)—(ভুল); (ঝ)—(ঠিক); (ঞ)—(ভুল);

(ট)—(ভুল); (ঠ)—(ঠিক)।

অনুশীলনী ৩

(ক)—(ভুল); (খ)—(ভুল); (গ)—(ঠিক); (ঘ)—ভুল; (ঙ)—(ঠিক)।

অনুশীলনী ৪

১. (ক) (১) অধিকাংশ = অধিক+অংশ

(২) গোলাকার = গোল+আকার

(৩) অপরাপর = অপর+অপর

(৪) অন্যান্য = অন্য+অন্য

(৫) ভয়াবহ = ভয়+আবহ

(৬) অর্ধাংশ = অর্ধ+অংশ

(৭) ভীষণাকার = ভীষণ+আকার

(৮) সম্মুখাংশ = সম্মুখ+অংশ

(৯) স্তূপাকারে = স্তূপ+আকারে

(১০) স্থানাভাব = স্থান+অভাব

(খ) (১) কৌতূহলোদ্দীপক = কৌতূহল+উদ্দীপক

(২) পূর্ণোদ্যম = পূর্ণ+উদ্যম

২. নিজেই চেষ্টা করুন।

১১.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

(১) গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য : বাংলার কীটপতঙ্গ।

(২) বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ : জ্ঞান ও বিজ্ঞান (মাসিক পত্রিকা)।

একক ১২ ❑ রক্ত — বকুলচন্দ্র চৌধুরী

গঠন

১২.১ উদ্দেশ্য

১২.২ প্রস্তাবনা

১২.৩ মূলপাঠ

১২.৪ সারাংশ

১২.৫ অনুশীলনী ১

১২.৬ অনুশীলনী ২ (ভাষাদক্ষতা বিষয়ক)

১২.৭ উত্তর সংকেত

১২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- বিজ্ঞানের বিষয়ে বাংলা লেখা রীতি এবং বৈজ্ঞানিক পরিভাষার পরিচয় পাবেন।
- রক্ত সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা করতে পারবেন।

১২.২ প্রস্তাবনা

রক্ত জীবনীশক্তির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, অথচ আমরা সাধারণ মানুষেরা রক্ত সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন নই। এই পাঠের মাধ্যমে রক্ত সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। রক্ত প্রাণশক্তিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আছে; সুতরাং এই উপাদানটির আলোচনাও ব্যাপক। তবে স্বল্প পরিসরে এখানে রক্ত সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মতভাবে একটা সাধারণ আলোচনা করা হয়েছে।

১২.৩ মূলপাঠ

আমাদের শরীরের ভিতরে যে লাল তরল পদার্থ আছে তাকেই রক্ত বলা হয়। এই রক্ত হল এক রকমের বিশেষ ধরনের জীবকোষের সমন্বয়। রক্ত আমাদের শরীরের ভিতরে বিভিন্ন কোষে ফুসফুস থেকে অক্সিজেন ও পাকস্থলী থেকে খাদ্য বহন করে নিয়ে যায় এবং বহিরাগত যে কোনও ধরনের রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে শরীরকে রক্ষা করবার চেষ্টা করে। তা ছাড়া শরীরের অপ্রয়োজনীয় পদার্থগুলোকেও কিডনি, অন্ত্র, ফুসফুস ও চামড়ার মাধ্যমে শরীর থেকে নির্গত করতে সাহায্য করে। উপযুক্ত পরিমাণে তরল পদার্থ, লবণ, অম্ল ক্ষারের সমতা এবং শরীরের উপযুক্ত তাপ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বও রক্তই পালন করে। শরীরের আকৃতি অনুসারে রক্ত শরীরের ওজনের পাঁচ থেকে দশ শতাংশ হয়ে থাকে। রক্তকে আমরা প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি একটি হল রক্তকণিকা, অপরটি

প্লাজমা। রক্তকণিকাকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি—যথা : (১) লোহিত কণিকা বা ইরাইথ্রোসাইটস্, (২) শ্বেতকণিকা বা ল্যুউকোসাইটস্, অপরটি হল, (৩) বর্ণহীন কণিকা থ্রোম্বোসাইটস্ বা প্লেটলেট। লোহিত কণিকার লাল অংশটুকুকে বলা হয় হিমোগ্লোবিন। হিমোগ্লোবিনের সাহায্যে ফুসফুসে আগত বায়ু থেকে অক্সিজেনকে শোষণ করে শরীরের অপরিশোধিত রক্তকে শোধন করা হয়, তাছাড়া খাদ্য পরিবহনের কাজও লোহিত কণিকার সাহায্যে সম্পাদিত হয়। শ্বেতকণিকা বা ল্যুউকোসাইটস্ শরীরে বহিরাগত রোগজীবাণুকে ধ্বংস করে শরীরকে রোগমুক্ত রাখতে চেষ্টা করে এবং খাদ্যের অপ্রয়োজনীয় অবশিষ্টাংশ শরীর থেকে নির্গত করে দিতে সাহায্য করে। যদি শরীরের কাটা বা ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বেরিয়ে যেতে থাকে তা হলে থ্রম্বোসাইটস্-এর সাহায্যে রক্ত জমাট বেঁধে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়। রক্তের মধ্যে লোহিত কণিকা অন্যান্য কণিকার তুলনায় অনেক অনেক বেশি থাকে বলে আমরা খালি চোখে রক্তকে শুধু লালই দেখতে পাই।

শরীরের ভেতর থেকে বহির্জগতের সংস্পর্শে এসে জমাট বেঁধে যাওয়া রক্তের একটি বিশেষ ধর্ম। কিন্তু রক্তের সঙ্গে হ্যাপারিন, সোডিয়াম সাইট্রেট অথবা পটাসিয়াম অক্সেলেট একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে মিশিয়ে রক্তকে জমাট বাঁধা থেকে মুক্ত রাখা যায়। যদি একটি টেস্টটিউবের মধ্যে কিছুটা পরিমাণ রক্ত উপরিউক্ত যে কোনও একটি রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে মিশিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দেওয়া হয় তা হলে আমরা তার মধ্যে তিনটি স্তর দেখতে পাই। লোহিত কণিকাগুলো নিচের স্তরে, মাঝের স্তরে রয়েছে শ্বেতকণিকা ও বর্ণহীন কণিকা এবং উপরের স্বচ্ছ হলুদ অংশটুকুকে বলা হয় প্লাজমা বা সিরাম। যদি স্বচ্ছ হলুদ অংশ থেকে রক্তকণিকাকে আলাদা করে নেওয়া হয় এবং তাতে জমাট বাঁধার উপকরণ না থাকে তা হলে তাকে সিরাম বলা হয়। কিন্তু জমাট বাঁধার উপকরণের উপস্থিতিকে বলা হয় প্লাজমা। প্লাজমার মধ্যে যে বিশেষ ধরনের রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে সেগুলো হল : লবণ, চর্বি, ফাইব্রোজেন, এলবিউমিন, গ্লোবিউমিনস্ এবং এমিনো এসিড। সিরাম হল একধরনের অ্যান্টিবডি। যখনই কোনও রোগজীবাণু মানুষের শরীরে প্রবেশ করে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য শরীরকে তৈরি করে রাখাই এদের কাজ। ফলে যে কোনও জীবাণু শরীরে প্রবেশ করা মাত্রই অ্যান্টিবডিরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সেই যুদ্ধে যদি অ্যান্টিবডি জয়লাভ করে তা হলে আমাদের শরীর রোগের কবল থেকে রক্ষা পায় আর যদি এরা হেরে যায় তা হলেই রোগের কবলে পড়তে হয়। আমাদের বেঁচে থাকবার জন্য রক্ত একটি অপরিহার্য জিনিস। শরীরের রক্ত কমে গেলে বা কোনও কারণে দূষিত হলে নানাপ্রকার রোগের কবলে পড়তে হয়।

অ্যান্টিজেন ‘এ’ এবং অ্যান্টিজেন ‘বি’-এর উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে রক্তকে প্রধানত চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : যেমন, ‘এ’, ‘বি’, ‘এ-বি’ এবং ‘ও’। যদি কারও রক্ত অ্যান্টি-এ সিরামের সংমিশ্রণে জমাট বেঁধে যায় তা হলে এই রক্তকে ‘এ’ শ্রেণীভুক্ত রক্ত বলে ধরা হবে। সেই কারণে যদি কারও রক্ত অ্যান্টি-বি সিরামের সংমিশ্রণের ফলে জমাট বেঁধে যায় তা হলে এই রক্তকে ‘বি’ শ্রেণীভুক্ত রক্ত বলে ধরা হবে। আবার যদি কারও রক্ত অ্যান্টি-‘এ’ সিরাম ও অ্যান্টি-‘বি’ সিরাম উভয়ের সংমিশ্রণে জমাট বেঁধে যায় তা হলে সেই রক্তকে ‘এ-বি শ্রেণীভুক্ত বলে ধরা হবে। কিন্তু যদি কারও রক্ত উপরিউক্ত কোন অ্যান্টিবডির সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে জমাট বেঁধে না যায় তা হলে সেই রক্তকে ‘ও’ শ্রেণীভুক্ত বলে ধরা হবে।

যদি কারও শরীরের রক্ত কোনও কারণে শরীরের প্রয়োজনের তুলনায় কমে যায় তাহলে আমরা একের রক্ত অন্যের শরীরে ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে সুস্থ করে তুলতে পারি বা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তার জীবন

রক্ষা করতে পারি। কিন্তু রক্তদান বা গ্রহণ করার আগে গবেষণাগারে গিয়ে পরীক্ষা করে জানতে হবে যে দাতা ও গ্রহীতার শরীরের রক্ত একই শ্রেণীভুক্ত কিনা। একই শ্রেণীভুক্ত রক্ত হলে একের রক্ত অন্যকে দান করা যায়। কিন্তু দাতা এবং গ্রহীতার রক্ত যদি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয় তা হলে গ্রহীতার শরীরের সমস্ত রক্ত জমাট বেঁধে যায় ও তাকে বাঁচাবার আর কোনও উপায় থাকে না। তাই যদি কারও রক্ত 'বি' শ্রেণীভুক্ত হয় তা হলে অপর একজন 'বি' শ্রেণীভুক্ত লোককেই সেই রক্ত দান করা যায় অথবা সেই লোকের রক্ত গ্রহণ করা সম্ভব। তেমনি 'এ' শ্রেণীভুক্ত লোকের সঙ্গেই 'এ' শ্রেণীভুক্ত লোকের রক্ত দেওয়া-নেওয়া করা যায়। কিন্তু 'এ-বি' বা 'ও' শ্রেণীভুক্ত রক্ত থাকা লোকের কথাটা একটু আলাদা। যাঁর শরীরে 'ও' শ্রেণীভুক্ত রক্ত আছে তিনি সবাইকে তাঁর রক্ত দান করতে সক্ষম কিন্তু গ্রহণ করবার সময় শুধু একজন 'ও' শ্রেণীভুক্ত লোকের রক্তই গ্রহণ করতে পারেন। অন্য কোনও শ্রেণীভুক্ত রক্ত তিনি গ্রহণ করতে পারবেন না। তাই 'ও' শ্রেণীভুক্ত লোককে বলা হয় সর্বজনীন দাতা (Universal Donor)। অপরপক্ষে 'এ-বি' শ্রেণীভুক্ত রক্ত যাঁর শরীরে আছে তিনি সবার রক্তই গ্রহণ করতে সমর্থ কিন্তু দান করতে পারবেন শুধু একজন 'এ-বি' শ্রেণীভুক্ত লোককেই। তাই এই শ্রেণীভুক্ত লোককে বলা হয় সর্বজনীন গ্রহীতা (Universal Recipient)।

মাতৃগর্ভে জীবনের সূচনাকালে যে অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি নির্ধারিত হয় পরবর্তী জীবনে এর কোনও পরিবর্তন হয় না। অ্যান্টিবডি রক্তের প্লাজমা বা সিরামের মধ্যেই নিহিত থাকে। দাতার অ্যান্টিজেনের সাথে গ্রহীতার অ্যান্টিবডির সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন, কেননা গ্রহীতার অ্যান্টিবডির সঙ্গে দাতার অ্যান্টিজেনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এই একই শ্রেণীভুক্ত রক্ত না হলে একের রক্ত অপরের শরীরে দেওয়া যায় না। কারণ যদি কারও শরীরের রক্ত 'এ' শ্রেণীভুক্ত হয় তা হলে সেখানে 'অ্যান্টি-বি' অ্যান্টিবডি থাকে। আবার 'বি' শ্রেণীভুক্ত রক্তের মধ্যে রয়েছে 'অ্যান্টি-এ' অ্যান্টিবডি। 'এ-বি' শ্রেণীভুক্ত রক্তের মধ্যে দুরকমের অ্যান্টিজেন থাকে, কিন্তু কোনও অ্যান্টিবডি থাকে না। 'ও' শ্রেণীভুক্ত রক্তের মধ্যে উভয় প্রকারের অ্যান্টিবডি থাকে, কিন্তু কোন অ্যান্টিজেন থাকে না।

যদি পিতামাতার মধ্যে একজনের 'এ' শ্রেণীভুক্ত রক্ত ও অপরজনের 'বি' শ্রেণীভুক্ত রক্ত থাকে তা হলে তাদের সন্তানদের যে কোনও শ্রেণীভুক্ত রক্ত থাকাই সম্ভব। কিন্তু যদি মাতাপিতার মধ্যে কোনও একজনের রক্ত 'এ-বি' শ্রেণীভুক্ত হয় তা হলে সন্তানদের মধ্যে কারও 'ও' শ্রেণীভুক্ত রক্ত থাকা সম্ভব নয়। অপরপক্ষে যদি পিতা ও মাতা উভয়ের 'ও' শ্রেণীভুক্ত রক্ত থাকে তা হলে তাদের ছেলেমেয়েদের কারওই 'ও' শ্রেণীভুক্ত ছাড়া অন্য কোনও শ্রেণীভুক্ত রক্ত হওয়া সম্ভব নয়। পিতামাতার মধ্যে একজনের যদি 'এ-বি' শ্রেণীভুক্ত রক্ত এবং অপরজনের 'ও' শ্রেণীভুক্ত রক্ত থাকে তা হলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে কারওই 'এ-বি' বা 'ও' শ্রেণীর রক্ত হয় না।

১২.৪ সারাংশ

আমাদের শরীরের ভিতর যে লাল তরল পদার্থ আছে তাহাকে বলা হয় রক্ত। রক্তই আমাদের জীবনীশক্তির মূল আধার। রক্তকে প্রধানত দুভাগে বিভক্ত করা যায়—রক্তকোষ, প্লাজমা। রক্তকোষকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি—লোহিত কণিকা, শ্বেতকণিকা, বর্ণহীন কণিকা। এই তিন প্রকারের রক্তকণিকা আমাদের শরীরের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। দ্বিতীয়ত, প্লাজমার ভিতরে এমন কতকগুলি উপাদান রয়েছে যা আমাদের শরীরকে

সুস্থ রাখার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। রক্তের লাল পদার্থটিকে হিমোগ্লোবিন বলা হয়। হিমোগ্লোবিনের সাহায্যে ফুসফুসের ভিতরের বায়ু থেকে অক্সিজেন শোষণ করে শরীরের অপরিশোধিত রক্তকে শোধন করা হয়। রক্তের মধ্যে লোহিত কণিকা সবচেয়ে বেশি থাকে বলে আমরা খালি চোখে রক্তকে লাল দেখি। রক্তকে সাধারণত চার শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়—'এ', 'বি', 'এ-বি' এবং 'ও'। একজনের রক্ত অপরের শরীরের মধ্যে দেওয়ার আগে এই শ্রেণিবিচার খুব গুরুত্বপূর্ণ। সমশ্রেণিভুক্ত রক্ত না হলে একের রক্ত অপরকে দান করা যায় না। যেহেতু 'এ-বি' শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তি যে কোনো শ্রেণিভুক্ত রক্ত গ্রহণ করতে পারে কিন্তু দিতে পারে শুধু 'এ-বি' শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিকেই, তাই এদের বলা হয় 'চিরন্তন গ্রহীতা'। আবার 'ও' শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তি সবাইকেই রক্তদান করতে পারে কিন্তু গ্রহণ করতে পারে শুধু 'ও' শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকেই, তাই ওদের বলা হয় 'চিরন্তন দাতা'। জীবনের সূচনার মুহূর্তে রক্তের যে শ্রেণি নির্ধারিত হয় পরবর্তী জীবনকালে তার কোনও পরিবর্তন হয় না। পিতামাতার রক্তের শ্রেণির উপর সন্তানের রক্তের শ্রেণি নির্ভর করে।

১২.৫ অনুশীলনী ১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর হয়ে গেলে ৬২ পাতার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

১. **সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।**

(ক) লোহিত কণিকার লালপদার্থকে বলা হয়—
(১) হাইসোজেন,
(২) গ্লোবিউমিনস্
(৩) এমিনো এ্যাসিড,
(৪) হিমোগ্লোবিন।

(খ) শ্বেতকণিকার কাজ—
(১) কোষে খাদ্য সরবরাহ করা,
(২) রোগজীবাণু ধ্বংস করা,
(৩) অক্সিজেন শোষণ করা,
(৪) রক্তকে জমাট বাঁধানো।

(গ) 'এ-বি' শ্রেণিভুক্ত রক্তে অ্যান্টিবডি থাকে—
(১) অ্যান্টি 'এ',
(২) অ্যান্টি 'বি'
(৩) উভয় অ্যান্টিবডি,
(৪) কোনওটিই নয়।

(ঘ) 'এ-বি' রক্ত দান করা যায়—
(১) 'এ' শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিকে,
(২) 'বি' শ্রেণিভুক্তকে,
(৩) 'ও' শ্রেণিভুক্তকে
(৪) 'এ-বি' শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিকে।

২. **নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :**

(ক) হিমোগ্লোবিনের কাজ কী?

(খ) রক্তকণিকাগুলির নাম কী?

(গ) থ্রোম্‌বোসাইটস্‌কে খালি চোখে দেখা যায় না কেন?

(ঘ) রক্তকে খালি চোখে শুধু লালই দেখায় কেন?

(ঙ) অ্যান্টিজেন 'এ' এবং অ্যান্টিজেন 'বি'-র উপর ভিত্তি করে রক্তকে কত শ্রেণিতে ভাগ করা যায়?

৩. **নীচের বক্তব্যগুলি ঠিক না ভুল, নির্দিষ্ট ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে দেখান।**

	ঠিক	ভুল
(ক) শ্বেতকণিকা শরীরকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।	☐	☐
(খ) 'ও' শ্রেণিভুক্ত রক্তে কোন অ্যান্টিবডি থাকে না।	☐	☐
(গ) হিমোগ্লোবিন একপ্রকার বর্ণহীন কণিকার নাম।	☐	☐
(ঘ) থ্রোম্বাসাইটস্‌ শরীর থেকে রক্ত বেরিয়ে যাওয়াকে বন্ধ করে।	☐	☐
(ঙ) বাবা ও মায়ের একজনের 'এ' এবং অপরজনের 'বি' শ্রেণিভুক্ত রক্ত হলে সন্তানের যে কোনো শ্রেণির রক্ত হতে পারে।	☐	☐
(চ) রক্তকে আমরা লাল দেখি, কারণ রক্তের সব কিছুই লাল।	☐	☐
(ছ) প্লাজমা ও সিরামের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।	☐	☐
(জ) 'এ-বি' রক্ত সবাইকে দান করা যায় কারণ 'এ-বি'তে কোনো অ্যান্টিবডি নেই।	☐	☐
(ঝ) লোহিত কণিকা দ্বারা অপরিশোধিত রক্তকে শোধন করা যায়।	☐	☐

৪. **শূন্যস্থান পূরণ করুন :**

(ক) রক্ত এক বিশেষ ধরনের .... সমন্বয়।

(খ) শরীরের আকৃতি অনুসারে রক্ত শরীরের ওজনের .... থেকে .... শতাংশ হয়ে থাকে।

(গ) বহির্জগতের সংস্পর্শে এসে .... রক্তের একটি বিশেষ ....।

(ঘ) নির্দিষ্ট পরিমাণে .... মিশিয়ে রক্তকে জমাট বেঁধে যাওয়া থেকে মুক্ত রাখা যায়।

(ঙ) রক্তের হলুদ স্বচ্ছ অংশটুকুর মধ্যে যদি জমাট বাঁধার উপকরণ না থাকে তা হলে তাকে .... বলা হয়।

(চ) যদি কারও রক্ত অ্যান্টি-এ অথবা অ্যান্টি-বি সিরামের সংমিশ্রণে কোনও প্রতিক্রিয়া না হয় তা হলে তাকে .... শ্রেণিভুক্ত বলা হয়।

(ছ) 'ও' শ্রেণির রক্ত সবাইকে দেওয়া যায় বলে তাকে .... বলা হয়।

(জ) পিতামাতার মধ্যে কোনও একজনের 'এ-বি' শ্রেণিভুক্ত রক্ত থাকলে সন্তানের .... শ্রেণির রক্ত হয় না।

(ঝ) গ্রহীতার .... সঙ্গে দাতার .... প্রতিক্রিয়া ঘটে।

১২.৬ অনুশীলনী ২ (ভাষাদক্ষতা বিষয়ক)

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর হয়ে গেলে ৬৩ পাতার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

১. 'দান' এই শব্দটি বিপরীত শব্দ 'গ্রহণ'—এইভাবে নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লিখুন :

(ক) দুর্বলতা (...)

(খ) সুস্থ (...)

(গ) গ্রহীতা (..)

(ঘ) অন্তর্ভুক্ত (.......................................)

(ঙ) জীবন (..)

(চ) আদিম (..)

(ছ) সামঞ্জস্য (...)

২. 'শ্বেত' এই শব্দটির সমার্থক শব্দ 'সাদা'—এইভাবে নিম্নলিখিত শব্দগুলির সমার্থক শব্দ লিখুন :

(ক) জীব ....

(খ) লোহিত ....

(গ) বর্ণ ....

(ঘ) স্বচ্ছ ....

(ঙ) আলাদা ....

(চ) উপকরণ ....

(ছ) গবেষণা ....

১২.৭ উত্তর সংকেত

অনুশীলনী ১

১. (ক) হিমোগ্লোবিন, (খ) রোগজীবাণু ধ্বংস করা, (গ) কোনোটিই নয়, (ঘ) 'এ-বি' শ্রেণিভুক্তকে।

২. (ক) অক্সিজেন শোষণ করা, (খ) লোহিত কণিকা, শ্বেতকণিকা, বর্ণহীন কণিকা, (গ) বর্ণহীন বলে, (ঘ) লোহিত কণিকার পরিমাণ অনেক বেশি বলে, (ঙ) চারশ্রেণি।

৩. (ক) ঠিক, (খ) ভুল, (গ) ভুল, (ঘ) ঠিক, (ঙ) ঠিক, (চ) ভুল, (ছ) ভুল, (জ) ঠিক, (ঝ) ঠিক।

৪. (ক) কোষের, (খ) ৫% থেকে ১০%, (গ) জমাট বাঁধা, ধর্ম, (ঘ) সোডিয়াম সাইট্রেট/পটাশিয়াম অক্সিলেট, (ঙ) সিরাম, (চ) 'ও' (ছ) চিরন্তনদাতা, (জ) 'ও', (ঝ) অ্যান্টিবডির, অ্যান্টিজেনের।

অনুশীলনী ২ (ভাষাদক্ষতা বিষয়ক)

১. (ক) সবলতা, (খ) অসুস্থ, (গ) দাতা, (ঘ) বহির্ভূত, (ঙ) মরণ/মৃত্যু, (চ) নব্য, (ছ) অসামঞ্জস্য।

২. (ক) প্রাণী, (খ) লাল, (গ) রং, (ঘ) পরিষ্কার, (ঙ) পৃথক, (চ) উপাদান, (ছ) পরীক্ষা/সমীক্ষা।

১২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

(১) বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ : জ্ঞান বিজ্ঞান (মাসিক পত্রিকা)।

(২) দেশ (সাপ্তাহিক পত্রিকা) : বিজ্ঞান বিষয়ের রচনা।